করবী দেববর্মণ

প্রবন্ধসংগ্রহ

প্রবন্ধসংগ্রহ

(১ম খন্ড)

করবী দেববর্ম্মণ

ভাষা
আগরতলা, ত্রিপুরা
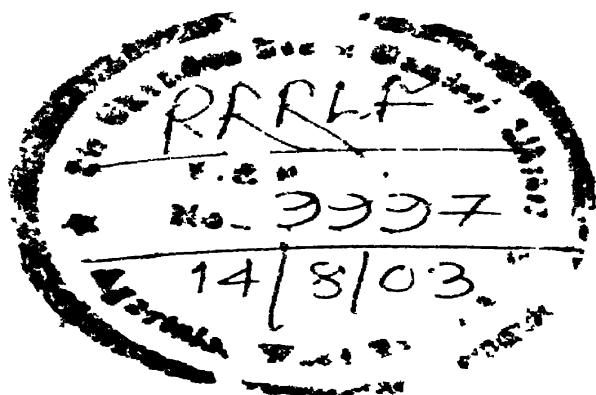
প্রবন্ধসংগ্রহ
Prabandhasangraha
a collection of Bengali essays
by
Karabi DevBarman
প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৩

ভাষা প্রকাশনের পক্ষে প্রকাশ করেছেন কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, প্রযত্নে
'শান্তি কুটির', নতুন পল্লী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা-১ থেকে।
ছেপেছেন ইনফোপ্রিন্ট, কৃষ্ণনগর, নতুন পল্লী, আগরতলা-১।
মূল্য ৭৫ টাকা

কল্যাণীয়া সুদেষ্ণাকে

— মা

সূচী

ত্রি পু রা

বি বি ধ

প্রসঙ্গত

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন — 'শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না। প্রতিভার সঙ্গে গৃহিনীপনাও থাকা চাই।' বাস্তবিক পক্ষে সঠিকভাবে সংরক্ষিত না হলে সাহিত্যকর্মের ধারাবাহিকতা, কালানুক্রম ঠিক থাকে না। তাছাড়া এগুলো হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে। প্রতিভা আমার নেই তবু যা কিছুই লিখি তার সংরক্ষনের ব্যাপারে আমার কোন গৃহিনীপনা নেই। কত লেখা যে কতদিকে হারিয়ে গেছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। অধিকাংশ সময়েই লেখা ছাপা হলে তার কপি তুলে রাখলেও সময়মতো সেগুলি কাগজের স্তূপের মধ্য থেকে খুঁজে বার করতে পারি না। বাইরের এবং ঘরের কাজের নানা চাপ, মিটিং, সেমিনার ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আষ্ঠেপৃষ্ঠে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে সারাদিন যে একটা কাজ শেষ না হতেই আরেকটা কাজ, আরেকটা লেখা ঢেউয়ের মত এসে পড়ে বলে আগেরটা যে কোথায় ঢুকে যায় পরে তা আবিষ্কার করাও অসম্ভব হয় কখনো।

তবু প্রাণপনে পত্রিকার ছাপা কপিটাকেই সংরক্ষণের চেষ্টা করি। আর যেটা গেল সেটা একেবারেই গেল। এভাবেই হারিয়ে গেছে আমার 'যুগে যুগে গোমতী' প্রবন্ধটি যা আমি তীর্থমুখে ড্যাম হওয়ায় বহু বছর আগে সেখানে গিয়ে হেঁটে হেঁটে সমস্ত বিবরণ তুলে নিয়ে এসেছি। প্রাবন্ধিক রমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় বলেছিলেন আপনার এ লেখাটিই এ বিষয়ে প্রথম লেখা। আমাব সংবক্ষিত কপি থেকে আপনার এ লেখার সাহায্য অনেকেই নিয়েছেন। এমনিভাবেই 'শহরের ত্রিপুরী সমাজের জীবন ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধটি প্রশংসা করেছিলেন স্বর্গীয় অধ্যাপক, কবি বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়। বলেছিলেন, এটি যত্ন করে লিখলে পরে একটা পূর্ণাঙ্গ বই হতে পারে। লেখাটি স্থানীয় 'দৈনিক সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। কপিও সংরক্ষণ করা ছিল কিন্তু ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় ঘরবাড়ি ছাড়তে হলো। ঘরে যে কাগজ ও বইপত্র ছিল, ঘর ছেড়ে যাবার পর সেসব উধাও হয়ে গেল।

এভাবেই হারিয়ে যেত 'ত্রিপুরীদের খাদ্যাভাস ও খাদ্যমূল্য' লেখাটি, (যেটিকে প্রয়াত ডঃ হীরালাল চ্যাটার্জী খুব প্রশংসা করে বলেছিলেন এটাকে তুমি আরো বিস্তৃত করে একটি বই করো) যদি না মৃণাল দেববর্মণ তার লিটিল ম্যাগাজিন 'আগরতলা' না ছাপাতেন।

যাই হোক, আমার এই প্রকাশনার নেপথ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে হাতের সামনে এক্ষুনি যেগুলো পেলাম সেসব লেখাকে ধরে রাখা। এই সংকলনে ২৫/৩০ বছর আগের লেখাও রয়েছে। যেমন ''অতীত ও বর্তমানের আলোকে ত্রিপুরায় আদিবাসী নারীর গতি ও প্রকৃতি'' লেখার সময়কাল ১৩০৮ বঙ্গাব্দ। অন্যান্য লেখাগুলিও অনেকই পুরনো। বেশ কিছু পুরনো লেখা রয়েছে যেগুলি এক্ষুনি খুঁজে বার করতে পারি নি কারণ বেশ কিছুদিন বাইরে থাকার পর আগরতলায় এসে শুনি 'ভাষা' প্রকাশন (ত্রিপুরায় লেখকদের সমবেত উদ্যোগে গঠিত প্রথম এবং একমাত্র প্রকাশন সংস্থা) কিছু বাংলা প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করছেন। ওদের সহায়তা ও উৎসাহে প্রাথমিকভাবে অনেক দোষ-ত্রুটি সহ বইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছি। অনেক লেখাতেই তথ্যাদি, সংখ্যাতত্ত্ব লেখার সময়কার।

তবু সবকিছু মিলেই বইটি প্রাথমিকভাবে আমার কাছে একটি সংরক্ষণের থলি মাত্র। পাঠকসমাজ সেভাবেই বইটিকে বিবেচনা করবেন, আশা করি।

করবী দেববর্মণ

ত্রিপুরার সংস্কৃতিতে রাজ অন্তঃপুর

একটি দেশের সংস্কৃতি সাধারণ লোকজীবনের কৃতি বা action-কে ঘিরে গড়ে ওঠে এবং সে কৃতিকে সংস্কৃতি হয়ে ওঠার জন্য তার পিছনে প্রয়োজন হয় বিশেষ কোন গুণী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতা, কোন রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা। কারণ কৃতির সূক্ষ্মচর্চার মাধ্যমে সম্ উপসর্গ যোজিত হয়ে সংস্কৃতি হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন এই বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতার। এতে যুক্ত হওয়া দরকার বিশেষ ভাবনা, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, অলংকরণ এবং নিয়মিত পরিমার্জনা।

ত্রিপুরার সংস্কৃতির রূপান্তরের দিকে লক্ষ্য করলেই এই বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মূলত আদিবাসী জীবনধারা বা কিরাত জনকৃতিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ত্রিপুরার নিজস্ব সংস্কৃতি। এরপর কালপ্রবাহে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপরাপর সংস্কৃতির ধারা।

এই সংস্কৃতির রূপান্তরের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে এটা ঘটেছে মূলত রাজ অন্তঃপুরকে ঘিরে।

ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরে এপর্যন্ত মোটামুটি বড় রকমের তিনটি সাংস্কৃতিক ধারার পরিচয় রয়েছে। এরা হচ্ছে — ১. মূল ত্রিপুরী বা আদিবাসী জীবনধারা ২. মণিপুরী জীবনধারা ৩. নেপালী জীবনধারা।

এর সঙ্গে কিছু পরিমাণে যুক্ত হয়েছে হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতি ও মুসলমানী সংস্কৃতি।

ত্রিপুরার রাজবংশ আর্য কি অনার্য এ নিয়ে আলোচনা ও সংশয় রয়েছে। এই রাজবংশ যে অনার্যসম্ভূত এ বিষয়ে অনেক গুণী পণ্ডিতই মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে মূলে আর্য রক্ত থাকলেও অনার্য জীবনধারা এবং অনার্য সংমিশ্রণে চেহারা, ছবি, খাওয়াদাওয়া সবই ক্রমশ বদলাতে পারে। বিশুদ্ধ আর্যবংশীয় মানুষও অনার্যকন্যা গ্রহণ করে অনার্য চেহারার সন্তান সন্ততি লাভ করেন।

কাজেই শুধু চেহারা দেখেও পরবর্তীকালে বংশের উদ্ভব বোঝা সম্ভব নয়। ক্রমাগত মিশ্রণ থেকে চেহারায় ত্রিপুরী মণিপুরী এবং অন্যান্য ছাপ আসতে পারে।

সুতরাং মূল উদ্ভব যাই হোক বৈবাহিক সূত্রে মণিপুরীদের সঙ্গে মিশ্রণের পূর্ব পর্যন্ত ত্রিপুরার মূল সংস্কৃতি ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়াদাওয়া, পূজাপার্বণ, রীতিনীতি সবই ককবরক ভাষাভাষী কিরাত জনগোষ্ঠীর মতোই ছিল।

মেয়েদের কাপড় পরা, চুল আঁচড়ান, ফুল পরা, গয়নাগাঁটি সবই ত্রিপুরী আদিবাসী বা উপজাতি সংস্কৃতি অনুযায়ী ছিল।

পার্বত্য প্রদেশে মেয়েরা 'রিগনাই' নামে হাতে বোনা বস্ত্র পরতেন, সেটা মোটা ধরণের এবং এক বেড় দিয়েই পরা হত। এটাকে 'পাছড়া'ও বলা হত। রাজ অন্তঃপুরে দু'বেড় দিয়ে যে কাপড় পরা হত তাকে 'দুবড়া' বলা হত। বাইরেও সাধারণ মেয়েরা এভাবেই কাপড় পরতেন।

এ বিষয়ে *রবি* পত্রিকায় পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যক প্রবন্ধে লেখা আছে 'রমণী সমাজে 'দুবড়া' নামে একপ্রকার মোটা কাপড় ব্যবহৃত হইত। দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গলে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'শুনিলে শ্রাদ্ধের নাম/ বান্ধা দিয়া খ্যায়া যায় স্ত্রীর দুবড়া'। দুই বেড় দিয়া পরিধান করা হইত বলিয়া সম্ভবত এর নাম দুবড়া হইয়াছে। ত্রিপুরায়ও এ নাম প্রচলিত ছিল।'

মানিকচন্দ্রের গানে পাওয়া যায় 'ঘিনে বান্দী নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া'। এই পাছড়া নামের মোটা কাপড়ই বাইরের সাধারণ ত্রিপুরী মহিলাদের পরিচ্ছদ ছিল।

প্রথমে হয়ত ত্রিপুরার নিয়ম অনুযায়ী এক বেড় দিয়ে পরলেও মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রভাবেই কাপড় দুই বেড় দিয়ে পরার চল হয়। সেজন্য এটাকে দুবড়া বলা হত। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও আছে 'দোদুটি করিয়া পরে বার হাত শাড়ী।' মেয়েরা বক্ষবন্ধনী বা 'রিয়া' ব্যবহার করতেন। এ বিষয়ে কর্ণেল মহিম ঠাকুর তাঁর 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে ত্রিপুরার শিল্প অধ্যায়ে লিখেছেন — 'ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প যাহা এখনও আছে তাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ শিল্প বলা যায়। মৎ প্রণীত 'রিয়া' নামক পুস্তিকায় আদিবাসী ত্রিপুরী মহিলাগণের বক্ষবন্ধনী সম্বন্ধে বলিয়াছি — এই রিয়া যাহাতে ত্রিপুরায় জীবিত থাকে তাহার উপায় করা রাজ সরকারের একান্ত কর্তব্য। আমাদের মহিলাগণের মধ্যে রিয়া এখন আর ব্যবহৃত হয় না বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিছুদিন পরে ইহা ব্যবহার হইবে না নিশ্চয়। ত্রিপুরার মহিলাগণ যখন আপনা/ আপনির মধ্যে ছিলেন তখন তাহাদের বেশভূষাও আপনার ধরণের ছিলো। এখানে বর্তমান যুগের বেশভূষা ক্রমে আসিতেছে ও আসিবে। সেইসঙ্গে রিয়া আর ব্যবহৃত হইবে না। অর্থাৎ বক্ষবন্ধনীরূপে ত্রিপুরার মহিলাকুলে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে কিনা আমি সন্দেহ করি।'

তখনকার মেয়েরা চুল বাঁধতেন উপজাতিদের লেজ বার করা খোঁপার ধরণে। এ ধরণের চুল বাঁধা আদিবাসী সমাজে এখনও রয়েছে। ফুল পরার চল রাজ অন্তঃপুরে আবহমান কালের। পার্বত্য জনসমাজেও এ রীতি খুবই প্রিয় ছিল এবং আছে।

গয়নাগাঁটিও উপজাতিদের বিশেষত ত্রিপুরী উপজাতিদের মতই ব্যবহৃত হত। তবে সে সব গয়নাগাঁটি পার্বত্য প্রদেশে রূপার এবং সূক্ষ্ম অলংকরণবিহীন হত, সেগুলিই রাজ অন্তঃপুরে সোনার এবং সূক্ষ্ম কারুকাজ সম্পন্ন হত। পাহাড়ি মেয়েরা পরতেন রূপোর গয়না, টাকার গয়না, মালা পুঁতি বা রামকলার বীচির গয়না। কানে ওয়াখম, তইয়া, ঢেড়ি-

রাংটার, গলার হাসলি, কান্‌থি, হাতে চুড়ি, খিলি দেয়া প্রশস্ত বাউটি, পায়ে খাড়ু ইত্যাদি।

এগুলোই রাজ অন্তঃপুরের মেয়েরা পরেছেন একটু পরিবর্তিত রূপে — সোনার এবং তুলনামূলকভাবে সরু। ধরে নেয়া যায় যে তাদের দেখাদেখি এসব অলংকার সাধারণ সমাজে বিস্তৃত হয়েছে অথবা যেগুলো প্রচলিত ছিল সেগুলোই রাজ অন্তঃপুরে এসে সূক্ষ্ম, সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমটিই হওয়া সম্ভব।

সে সময়ে রাজ অন্তঃপুরে লাম্প্রা, গরিয়া, কের সব পুজোই হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এই কের পুজো বহু আগে থেকেই পার্বত্য সমাজেও 'গ্রামমুদ্রা' হিসাবে প্রচলিত ছিল। মদ এবং মাংসাদিরও প্রচলন ছিল বাইরের মত রাজ অন্তঃপুরে।

এ বিষয়ে মহারাজা ত্রিপুর সম্পর্কে রাজমালায় পাই — 'কিরাত প্রকৃতি হইল কিরাত আচার'। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও দেখা যায় তখনকার দিনে মাইদুল (ভাত পোড়া), মাইপক্ (মাংস ও ভাত একত্রে রান্না), চাটাং (চালের গুঁড়ো দিয়ে মুরগী বা শুয়োরের মাংস কুচি দিয়ে রান্না), চাখুতুকুতুং (খার), গুদক, চোঙার তরকারি ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

মণিপুরীদের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার পর থেকে ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরে খাওয়াদাওয়া শিল্প সংস্কৃতির মধ্যে অন্য ধরণের মিশ্রণ এলো। মণিপুরের সঙ্গে প্রথম বৈবাহিক সম্পর্ক হয় তৈদাক্ষিণ রাজার কালে। তাঁর সম্বন্ধে লেখা আছে 'বহুকালে সেইস্থানে পলিলেক প্রজা/ মেখলী রাজার কন্যা বিভা কৈল রাজা।' মণিপুরীদের সঙ্গে কিছুটা খাওয়াদাওয়ার সাদৃশ্য থাকলেও তফাৎ ছিল বেশ কিছু। মনিপুরীদের মধ্যে লালিত্য, নম্রতা এবং অলংকরণের ভাব ত্রিপুরী উপজাতিদের চাইতে অনেক বেশী। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে তাদের প্রথাগত নাচগান ইত্যাদির মধ্যে হিন্দুধর্ম এবং চিন্তা চেতনার ছাপ পড়েছিল। পরিমার্জনার ফলে এসব নাচগান ক্রমশ সূক্ষ্ম শিল্প-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

তাদের বিশেষ ধরণের খাদ্য ইরোম্বা, সিঞ্জু ইত্যাদি ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরে এবং তারপরে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করল। কাঁচা শাকসব্জী খাওয়া, চুলের যত্ন, ত্বকের যত্ন এগুলো মণিপুরী সংস্কৃতির দান।

চুল বাঁধার মধ্যে এলো লাইছাবি ছাঁট অর্থাৎ কপালের উপর নামিয়ে আধখানা কপাল ঢেকে চুল ছেঁটে রাখা, পিছনের চুল থাকবে ছাড়া। এটা অবশ্য কুমাবী মেয়েদের ফ্যাশান ছিল। বিবাহিতা মেয়েরা খোঁপা বাঁধতেন।

ফুলের প্রচলন আগেই ছিল, এখন তার মধ্যে নানা অলঙ্করণ এবং সূক্ষ্ম বৈচিত্র এল। ফুলের গয়না, মালা, কানের গয়না পাখা ইত্যাদিতে নিত্য নতুন সৌন্দর্য দেখা দিতে লাগল। এর সঙ্গে চন্দনের ব্যবহার চালু হল। আপ্যায়নের জন্য তখন ছিল আতর ও পান গুয়া। রাজ অন্তঃপুরে এই পান তৈরী প্রায় শিল্পচর্চার স্তরে উন্নীত হয়েছিল। রেকাবীতে জালিকাজ কাটা কলাপাতার ওপর কার্টিজ পান (বন্দুকের কার্টিজের মতো আকৃতি করে জুড়ে এই পানের খিলি লবঙ্গ দিয়ে আটকে দেয়া হত)। তাতে থাকতো সূক্ষ্মভাবে কুচোনো সুপারী, রোদে বা আগুনের তাতে মুচমুচে করে শুকিয়ে নেয়া কেয়া ফুলের খয়ের। মোট

কথা এই পানের সঙ্গে মণিপুর থেকে আনা সুগন্ধী পচাপাতার তৈরী নির্যাস থাকত। আকার এবং প্রকার সবই বৈশিষ্টে ভরপুর এবং প্রসিদ্ধ ছিল।

রাজ অন্তঃপুরে বিভিন্ন ধরণের মণিপুরী নৃত্যচর্চা হতে লাগল। গয়নাগাঁটিতেও মণিপুরী গয়নার প্রচলন হল। কাপড় পরায় এলো দুই বেড়ের পরিবর্তে তিন বেড় দিয়ে পরা সঙ্গে সাদা ফিনফিনে পাতলা চাদর। গায়ে কোমর পর্যন্ত পেনী বা ব্লাউজ। এর আগে রানী, কুমারীর বক্ষ বন্ধনী ছিল রিয়া (রিছ্হা) চাদর ব্যবহারের প্রচলন ছিল না।

মৃদঙ্গ বা খোলের সঙ্গে রাসনৃত্য, হাততালি দিয়ে নাচ খোবাইছি নৃত্য, হোলি উপলক্ষে গান এবং ঝুলন উপলক্ষে নাচগান রাজ অন্তঃপুরে চর্চা হত।

এসব চর্চার সঙ্গে ত্রিপুরার নিজস্ব শিল্প বয়নশিল্পের চর্চাও চলে এসেছে। মহারানী, কুমারীরা কোমর তাঁতে রিয়া রিগনাই ইত্যাদি বুনতেন। এ বিষয়ে রাজমালায় 'শিল্পচর্চা' নামক পরিচ্ছেদ (প্রথম লহর মধ্যমণি)-তে লেখা রয়েছে —'ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানকালে যে শিল্পকলায় উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাহার বীজ আধুনিক নয়। সর্বাপেক্ষা বস্ত্রশিল্পের নিমিত্তই ত্রিপুরা বিশেষ প্রসিদ্ধ ও গৌরবান্বিত। আমরা দেখিতেছি প্রথমতঃ রাজপ্রাসাদে এই শিল্পের সূত্রপাত হইয়াছিল পরে রাজ্যময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।'

সুবড়াই রাজার অনেক প্রাচীন গল্প ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত আছে। সুবড়াই-মহারাজ ত্রিলোচনেরই আরেক নাম। তিনি নাকি সূক্ষ্ম হস্তশিল্পের সঙ্কলন ও প্রসারের জন্য শিল্পনিপুণা ২৪০ জন মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে রাজমালায় আছে যে মাছির পাখায় সূর্যরশ্মি পড়লে যে বিচিত্র বর্ণ সৌন্দর্যের উদ্ভব হয়, সেরকম সূক্ষ্ম কারুকাজযুক্ত রিয়া বুনছিলেন এক ত্রিপুরী যুবতী। তা দেখে মহারাজ ত্রিলোচন মুগ্ধ হয়ে সে যুবতীকে বিয়ে করেন।

মহিমচন্দ্র কর্ণেল তাঁর 'রিয়া' পুস্তকে এ বিষয়ে লিখেছেন যে, 'সুবড়াই নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি ত্রিপুরার শিল্পের বিস্তর উন্নতিসাধন করেছিলেন এবং কার্পাস বপনের প্রথা তিনিই সর্বপ্রথম ত্রিপুরায় প্রবর্তন করেছিলেন — এখনও সাধারণের মধ্যে এটাই বদ্ধমূল ধারণা। ত্রিপুরাবাসীগণ অদ্যাপি গর্বের সহিত বলিয়া থাকে নতুন শিল্প শিক্ষায় কোন প্রয়োজন নাই কারণ যে শিল্প সুবড়াই রাজা শিক্ষা দেন নাই সেই শিল্প শিল্প মধ্যে পরিগণিত নহে।

এই একটি কথায় স্পষ্টতর রূপে বোঝা যাইতেছে সুবড়াই রাজা সকল প্রকারের শিল্পই রাজ্যমধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাহার শাসনকালে প্রবর্তিত হয় নাই এমন উল্লেখযোগ্য নূতন কোন শিক্ষনীয় শিল্পকার্য ছিল না।'

রাজমালায় মধ্যমণিতে লেখা রয়েছে — 'রাজ অন্তঃপুরেই শিল্পের প্রথম উন্নতির বীজ উপ্ত হইয়াছিল। এস্থলে ত্রিপুর সিংহাসনের ১৪১ সংখ্যক ভূপতি রাজসূর্যের (নামান্তর আমাঙ্গাফা বা কুন্ধুহেলেফা) মহিষীর নাম উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে রয়েছে আচঙ্গফা, ওরফে কুক্রহোসফা নাম/ বলবীর্য পরাক্রমে পিতৃগুণ ধাম। বিবাহ করিয়াছিল জয়ন্ত রাজকুমারী/ বিদ্যাবুদ্ধিবতী ছিল যেমত শাশুড়ী/ স্ত্রী আচার শিল্পকার্য যাবতীয় ছিল/ ত্রিপুর রাজ পরিবারে

সব শিক্ষা ছিল (ত্রিপুর বংশাবলী)।'

আচঙ্গফার পুত্র খিগেঙ্গা ফার মহিষী ধারা শিল্পকলা অধিকতর পুষ্টিলাভ করেছিল। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে —'তার পুত্র খিচোঙ্গা রাজা হইল আপন/ খিচোঙ্গা মা ছিল তাহার রমনী/ বিচিত্র বসন শিক্ষা নির্মায়ে আপনি।'

অর্থাৎ তিনি নতুন নতুন ডিজাইন বা বস্ত্র বয়নের নমুনা বার করে অন্যান্যদের শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে রাজা ও রাজ পরিবারের প্রযত্নে প্রাচীনকাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে বয়নশিল্পের প্রচলন ও উত্তরোত্তর উন্নতি হয়েছিল।

রাজমালাতে লেখা আছে, '১৯২০ খ্রী অব্দের আদম সুমারীতে ত্রিপুরা রাজ্য পার্বত্য পল্লীস্থিত গৃহস্থ বা খানার সংখ্যা ৩৪৮৫৬ নির্ণীত হইয়াছে। এসকল গৃহে তাঁতের সংখ্যা ৩১,৪৮৫। সমগ্র ভারতের সভ্য সমাজে চরকা ও তাঁত প্রচলন নিমিত্ত অনেকে প্রাণপাত করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ত্রিপুরার নিভৃত গিরিকুঞ্জস্থ নগ্ন সমাজে স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার প্রচলন চলিয়া আসিতেছে। ইহা ত্রিপুরায় সামান্য গৌরবের কথা নহে। রাজ পরিবার ও ঠাকুর পরিবারের মধ্যে এই শিল্প চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছে।'

মহিম কর্ণেল তাঁর 'রিয়া' গ্রন্থে বলেছেন যে প্রত্যেক পরিবারে একটি নিজস্ব রিয়ার আদর্শ ছিল। বিয়ের সময় শাশুড়ি সে আদর্শের রিয়া পুত্রবধূকে উপহার দিতেন। কোন মহিলার মৃত্যু হলেও তার ব্যবহৃত রিয়া আসনে রেখে শ্রাদ্ধান্ন উৎসর্গ করা হত। গড়িয়া পূজাতেও রিয়া পূজিত হত। শুভকাজ বা মহারাজার যাত্রাকালে যে লাম্প্রা পূজা হয়ে থাকে সেটা বিনাইগর বা বিনায়ক গণেশের পূজা। সেখানেও মহারানীর রিয়া দেওয়া হয়। মহারানীগণ অথবা বিশিষ্ট পরিবারের মহিলাগণ অনেকসময় স্নেহভাজন ব্যক্তিদের রিয়া উপহার দিতেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব সহকারী মন্ত্রী ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মিত্র একটি পাগড়ি হিসাবে ব্যবহার করতেন। সেটি দেখে লেডি ডাফরিন খুব প্রশংসা করেন এবং এটি কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞেস করেন।

এর কিছুদিন পর মহারাজার ম্যানেজার M.C.W Memin I.C.S বিলাত থেকে একটি পুরোনো কাগজ নিয়ে আসেন, সেটা ব্রিটিশ রেসিডেন্ট Mr Ralpleak সাহেবের ১৭৮৩ খ্রী ১১ই মার্চের লিখিত রিপোর্ট। এতে The then reigining Queen মহারানী জাহ্নবীদেবীর বিবরণ ও তাঁর অভিষেকের সময় উপহার দেয়ার বিষয়ে লেখা আছে। সেখানে রিয়ার উল্লেখ আছে। Leave সাহেব তাঁর সেই উপহার ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দিয়েছিলেন। মহিম কর্ণেল যখন রাধাকিশোর মাণিক্যের পার্শ্বচর ছিলেন, তখন তাঁর ব্যবহৃত রিয়া দেখেও Lord Curgon খুব প্রশংসা করেছিলেন। বেনারসীর উৎকৃষ্ট কিংখাব থেকেও ত্রিপুরার রিয়া শিল্প উন্নত ছিল। সত্যি মহারাজকুমারী, মহারানীদের হাতে বস্ত্রবয়নের শিল্প নৈপুণ্য এত উচ্চকোটিতে পৌঁছেছিল যে সূক্ষ্ম জরির কাজে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী জীবজন্তু, ধাবমান

অশ্ব বা হরিণের দ্রুতগতি, বিচিত্র রঙিন প্রজাপতি বা বাহারি ফুলের বৈচিত্র বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এখনো এইসব শিল্পকর্মের নমুনা ব্যক্তিগত মালিকানায় কর্তা বা ঠাকুর পরিবারের লোকজনের কাছে রয়েছে।

কোমর তাঁতে রিয়া জাতীয় বস্ত্রশিল্প বা বাঁশ, বেত ইত্যাদির শিল্পকলার সঙ্গে বাঙালীর শিল্পচর্চাও রাজ অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছিল। মহারাজ প্রতীত প্রথম বাঙালী মেয়ে বিয়ে করেন। রাজমালায় লেখা আছে — 'সেদিন থেকে বাংলাদেশের শিল্পকলাও ত্রিপুর অঙ্কশায়িনী হইলেন। রাজধর মাণিক্যের পুত্র রামগঙ্গা মাণিক্য শ্রীহট্ট প্রদেশের বঙ্গকন্যা চন্দ্রতারা দেবীকে বিয়ে করেন। তাঁর সঙ্গে যে দুজন সঙ্গিনী আসেন তাঁদেরই একজন হলেন সরস্বতী দেবী। তিনি মহিম কর্ণেলের ঠাকুরমা। এঁদের সঙ্গে শ্রীহট্টের সূচিকাশিল্প এরাজ্যে আসে।

শ্রীহট্ট প্রদেশের সূচিকা শিল্প একটি সুকুমার শিল্প বিশেষ। মহিম কর্ণেল লিখেছেন 'মহারানী চন্দ্রতারা দেবী গরীব ঘরের মেয়ে ছিলেন। ছিন্নবস্ত্র দ্বারা তিনি কাঁথা সেলাই করিতেন — একার্যে তাঁর খুব সুখ্যাতি ছিল। তাঁর সঙ্গের সহচরী দুজন রান্নায়ও খুব নিপুণা ছিলেন। তারা রাজবাড়ীতে রাঁধুনীর পদ পান।' এদের একজন বলরাম দেওয়ানের মা এবং সরস্বতী দেবী মহিম কর্ণেলের ঠাকুরমা।

সরস্বতী দেবী সূচীকার্যে এবং ব্রতের আলপনা আঁকায় খুব পটু ছিলেন। লক্ষ্মীপূজা ও মনসা পূজা করার জন্য তিনি মহারানী চন্দ্রতারা দেবীর কাছ থেকে অভয়নগর জমিদাবী পেয়েছিলেন।

মহিম কর্ণেল তার 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে ত্রিপুরার শিল্প পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে — 'তার ন্যায় সূচিকার্যে নিপুণা এরাজ্যে কম ছিল। দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত সূচিকার্যের দ্রব্য আমরা দেখিতে পাই নাই। আমার জন্মিবার বহু বৎসর পূর্বে আমাদের গৃহদাহ হয় .... সেই সঙ্গে শিল্পাদর্শ অগ্নিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। তাহার কন্যা সন্ধ্যামালা দেবীর নিকট তাহার একখানা সূজনী মাত্র আমরা পাইয়াছিলাম। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাতৃদেবী যখন তীর্থদর্শনে বদরিকা গ্রামে গিয়াছিলেন তখন সেই সময় এই শিল্পাদর্শ সূজনীখানা তিনি নারায়ণকে দান করিয়া আসেন।'

মহিম কর্ণেলের উল্লিখিত এই সূজনীশিল্প রাজ অন্দরমহলে চর্চার মাধ্যমে সৌন্দর্যের চরমে পৌঁছেছিল। এই প্রসঙ্গে পদ্মকাটা মশারি বা পদ্মের পাপড়ির অনুসরণে মশারির চার মাথায় ঝালর দেয়া বিশেষ ধরণের মশারির উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজ অন্তঃপুরে এধরণের অত্যন্ত শিল্পশ্রী সমন্বিত মশারি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। বলাই বাহুল্য ক্রমে এ শিল্প অন্তঃপুরের বাইরে সম্পন্ন ঠাকুর সমাজ ইত্যাদিতেও প্রচলিত হয়।প্ল

শিল্প দ্রব্যাদির শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে মহিম কর্ণেল লিখেছেন, 'ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত শিল্প দ্রব্যাদি শ্রেণী বিভাগ হইয়া নানা শ্রেণীতে ব্যবহৃত হইত। এখনও অনেক জিনিষ সেভাবে ব্যবহার হইতেছে। রাজার রানী যাহা ব্যবহার করিতেন রাজপুত্র বধূগণ তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। ভিন্ন আদর্শে তাঁহাদের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইত অর্থাৎ শ্রেণী

বিভাগানুসারে শিল্পাদর্শও বিভিন্ন ছিল। কোন পর্ব উপলক্ষ্যে রাজ অন্তঃপুরে দেখা যাইত শিল্পাদর্শ অনুসারে রাজারানী হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকুর শ্রেণীর মহিলাগণের ব্যবহারিক জিনিষ দ্বারাই তাহাদিগকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যাইতে পারিত। রাজারানীর ব্যবহার্য সূজনী আসনখানা দেখিলে অনায়াসেই বোঝা যাইত ইহা রাজ মহিষীর আসন। সূজনী ইতি পূর্বে যাহা ছিল তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল মহারানী চন্দ্রতারা দেবীর আদর্শ অনুসারে। পূর্বে ছিল পানকাটা অর্থাৎ পানপাতার আদর্শে প্রস্তুত হইত। ত্রিপুরা রাজ্যের State colours ছিল ধবল। এই ধবল রঙের জিনিষ ব্যবহার করা অন্য কাহারও অধিকার ছিল না। ছত্র, আবানী, পতাকা প্রভৃতি ধবল রঙ-এর। অদ্য পর্যন্ত তাহা বর্তমান আছে — এই পানকাটা আদর্শই রাজার ব্যবহারের জিনিষের আদর্শ।'

এই পরিচ্ছেদেরই অন্যখানে তিনি লিখেছেন — 'বর্তমান সময়ে আমি ত্রিপুরার সূচিকা কার্যের শিল্প 'সুজনী' অর্থাৎ বসিবার আসন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। একবার ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় পুত্র ও পুত্রবধূ সহ এই রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন আমাদের মহারানীগণ কতকগুলি শিল্প সামগ্রী বউমা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে উপহার দেন। তন্মধ্যে রিয়া এবং সুজনী ছিল। এই সুজনীখানা দেখিয়া রবীন্দ্রবাবু বড় প্রীত হইয়াছিলেন। বোলপুর শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্চাশ্রম দেখার জন্য দেশ দেশান্তরের লোক উপস্থিত হন। একবার আমি দেখিয়াছি সেই বিদ্যালয়ে জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি ত্রিপুরায় শিল্প দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন এই মূল্যবান শিল্প আপনারা কখনো মরিতে দিবেন না। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম Mother Art does not die but slumbers.

প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্য ছিল এক সাম্রাজ্য। আরাকান থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত তার বিস্তৃতি ছিল। ত্রিপুরার আর্ট এই সুবিস্তীর্ণ দেশ প্রদেশের আচার ব্যবহার বক্ষে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বর্মার আর্ট বঙ্গদেশের আর্টের সহিত মিলিত হইয়া গেল। বর্মাদেশ চীন লুসাই প্রভৃতি দেশ এবং পূর্ববঙ্গ দেশ স্বীয় স্বীয় কলাবিদ্যা দ্বারা সজ্জিত হইয়া ত্রিপুরা পতিকুলের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল।

রাজ অন্তঃপুরের রানীগণের জন্য সূক্ষ্ম মসলিনের উপর সোনালী বাদলা কারুকার্য দ্বারা তাহাদের শাড়ী প্রস্তুত করা হইত এবং ইহাই তাহাদের ব্যবহার্য ছিল।

রাজ অন্তঃপুরে ইহা প্রস্তুত হইত এবং কারুকার্য দ্বারা চিহ্নিত হইত। এখনও অতি প্রাচীন শাড়ী ইত্যাদি দেখিলে মনে হয় রাজবাড়ীর পোশাক বটে। প্রত্যেকটি জিনিষের এক একটি ডিজাইন হইত, সিংহ ব্যাঘ্র হাতী এবং ঘোড়া কারুকার্যময় চিত্রে। সেইরকম রাজপুত্র এবং রাজকন্যার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ছিল।

সংস্কৃতির আরেক হাতিয়ার শিক্ষা। সেকালে পুঁথিগত শিক্ষা মেয়েদের মধ্যে খুব কমই ছিল তবু আমরা দেখি ত্রিপুরার মহিলারা ধর্ম পরায়ণ বুদ্ধিমতী দানশীলা ছিলেন। নানা তাম্রপাত্র ও দলিল দস্তাবেজে এসব প্রমাণ মিলে।'

রাজমালায় পাই সেনাপতি গোপীপ্রসাদ যিনি পরে উদয়মাণিক্য নাম নেন তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী পাঁচালী পাঠ করতেন।

মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের স্ত্রী জাহ্নবী দেবী স্বামীর মৃত্যুর পর ১৭৮৩ থেকে ১৭৮৫ — এই দুই বছর রাজ্য শাসন করেন। শোনা যায় তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্না ছিলেন।

ভাষা ও সংস্কৃতির আরেক বিশেষ দিক এ ব্যাপারে দেখতে গেলে দেখা যায় রাজ অন্তঃপুরে ককবরক ভাষাই প্রথমে চালু ছিল। পরে মণিপুরী ভাষা এবং আরো পরে নেপালী ভাষা অন্তঃপুরে চালু হল। পরবর্তীকালে ককবরক ভাষা রীতি লুপ্ত হয়ে গেল শুধু রয়ে গেল শব্দসম্ভার। আনন্দ উচ্ছ্বাস গালাগালি সব ভাবের বাহন হয়ে বেশ কিছু ককবরক শব্দ চালু রয়ে গেল। এরপর আমরা দেখি ত্রিপুরার সংস্কৃতিতে মুসলমানী প্রভাব। আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। রাজ অন্তঃপুরে ভাষারীতি এবং ব্যবহারে অনেক মুসলমানী ধারা অনুসৃত হয়েছে। সংস্কৃত শব্দ মহাদেবী বা মহরানী থেকে যেমন অপভ্রংশে মাই দেব্‌তা শব্দে সম্বোধন করা হত, তেমনি নানা, নানু, পিপি (ফুফু), পিয়া, সাহেব, হালাম (সেলাম বা প্রণাম বোঝাতে) ইত্যাদি শব্দ রাজ অন্তঃপুরে ব্যবহৃত হত। এই শব্দগুলিই পরে অন্তঃপুরের বাইরে আগরতলায়, ত্রিপুরায় ব্যবহৃত হয়েছে, এখনো হচ্ছে।

রাজবাড়িতে কখনো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা হয় না। কুর্ণিশের ভঙ্গীতে ঝুঁকে 'হালাম করছি —' তারপর পিপি বা নানু বা অন্য কোন সম্বোধন করা হয়।

আবার আচরণ শিক্ষা বা সহবত শিক্ষা অত্যন্ত দামী জিনিষ বলে মনে করা হত। এসব বিষয়ে আলাদা যত্ন নেয়া হত। বড়দের ফুল পান বা অন্য কোন জিনিষ দিলে মাথা অর্ধনমিত করে সেলামের মতো করতে হত। বড়দের দেখলে উঠে দাঁড়ানো বা অন্যভাবে সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। মহিলার প্রতি সম্মান এবং আদর যত্ন করা ত্রিপুরী সংস্কৃতির একটি প্রধান বিষয়। রাজ অন্তঃপুরে বহুবিবাহ চালু থাকলেও রানী মহিষীদের প্রতি দুর্ব্যবহার, অসম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত ছিল না।

তাঁদের প্রতিটি সুখ-সুবিধা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি মহারাজাদের অকুণ্ঠ মনোযোগ প্রদর্শনের ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কোন উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ বিজয়ে বা কোন বিশেষ আনন্দ উৎসব বা স্মরণীয় ঘটনা প্রসঙ্গে যখনই ত্রিপুরার মহারাজারা স্মারক স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করেছেন তখন বিজয়ী মহারাজার নামের সঙ্গে মহারানীর নামও অবশ্যই মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে তাঁরা স্ত্রীর নামের পূর্বে শ্রীশ্রী ব্যবহার করেছেন। এটি ছিল ত্রিপুরার মুদ্রার ইতিহাসে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং প্রচলিত রেওয়াজ। এ ভাবে স্ত্রীকে সহধর্মিনী হিসেবে গৌরবের ভাগীদার করে তাকে সম্মানিত করার মধ্যে তাঁদের উন্নত শিক্ষা সংস্কৃতির প্রমাণ মেলে।

এই সংস্কৃতির প্রভাব খুব লক্ষ্যণীয়ভাবেই সাধারণ, ঠাকুর লোক এবং পার্বত্য প্রজা সকলের মধ্যেও পড়ে। বিবাহিতা স্ত্রী কন্যা এবং পরিবারস্থ অন্যান্য মহিলাদের প্রতি আদর

এবং সম্মান প্রতি ঘরে ঘরে ছিল। বিচ্ছেদ বা ছাড়াছাড়ি বিরল হলেও চালু ছিল। কিন্তু বাড়িতে বৌয়ের নির্যাতন অত্যাচার বা অসম্মানের দৃষ্টান্ত সহজে দেখা যেত না। প্রতি পরিবারে বৌয়ের স্বাধীনতা এবং প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও তীক্ষ্ণ মানবিক নজর থাকত।

সমাজে সন্তান জন্মের মধ্যে পুত্রকন্যার ব্যাপারে কোন লক্ষ্যণীয় পার্থক্য করা হত না। ছেলের জন্মে যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হত, কন্যার জন্মেও ঠিক সেই সেই অনুষ্ঠানাদি সমান আদরে এবং গুরুত্বে পালন করা হত এবং এখনো হয়।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলেই ত্রিপুরা রাজ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। রাজ্যে তিনি সঙ্গীত নৃত্য অঙ্কনবিদ্যা ফটোগ্রাফি ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের প্রচলন সহ আইন আদালত, নিয়মকানুন সবই বিধিবদ্ধভাবে চালু করলেন। তাঁর প্রভাবে এবং আদর্শে এ সময়ে তাঁর পুত্রকন্যা, পরিবার পরিজন সহ সমস্ত রাজ্যে শিল্প সঙ্গীত বিদ্যাচর্চার জোয়ার এসেছিল। মহিম কর্ণেল এজন্য তাঁকে 'বাংলাদেশের বিক্রমাদিত্য' বলে বর্ণনা করেছেন।

উপজাতিদের মধ্যে সঙ্গীতের যে নিজস্ব ধারাটি ছিল তার সঙ্গে নানা বিচিত্র ধারার এ সময় সংমিশ্রণ ঘটে। বীরচন্দ্র কার কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা নিয়েছিলেন সেটা জানা না গেলেও তাঁর সমসাময়িক গুণী শিল্পীরা তাঁর সঙ্গীত প্রতিভাকে স্বীকার করে গেছেন। তাঁর তৈরী গানের সুর তাল লয়ের মধ্যেই তাঁর সাঙ্গীতিক পাণ্ডিত্যের প্রমাণ মেলে। তাঁর সভায় যারা ছিলেন তারা সবাই গুণী শিল্পী। যেমন, গায়ক যদুভট্ট, তবলাবাদক কাশেম আলী, গায়ক গামা, সেতারবাদক এনায়েৎ খাঁ, সরোদবাদক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান, সারেঙবাদক ওস্তাদ ছুটে খাঁ, আজিম খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, নিসার হুসেন খাঁ, কাশ্মীরের কত্থক নৃত্যশিল্পী ফুলন্দর বক্স, বেহালাবাদক হরিদাস, সেতারী নবীনচন্দ্র গোস্বামী, গায়ক ভোলানাথ চক্রবর্তী ইত্যাদি আরো অনেক গুণী ব্যক্তিরা। সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শী পঞ্চানন মিত্র ত্রিপুরার রাজ দরবারে বাইশ বছর ছিলেন।

বীরচন্দ্র নিজেও ভাল তবলা এবং পাখোয়াজ বাজাতেন। কীর্তন গানেও তাঁব দক্ষতা ছিল অসামান্য। খেমটা, গৌড় খেমটা, একতালী এবং বিশুদ্ধ রাগরাগিনী তালের উপর গাওয়া হত। এগুলিকে ত্রিপুরী সঙ্গীত বলে দাবী করা যায় কাবণ এগুলি ত্রিপুরার সন্তানদের দ্বারা ত্রিপুরায় তৈরী এবং ত্রিপুরাতেই গাওয়া হত। যদুভট্ট বীরচন্দ্রের গানগুলি বাইরে গেয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। 'মন্দ মন্দ বহত পবন/ বিরহী জন হৃদয় দহন' গানটি বীরচন্দ্রের রচনা। সুর এবং গায়কীতে এই গানটি আজো গুণীজনের মন হরণ করে।

তিনি পাহাড়ী রাগের ওপর ভিত্তি করে দুটি রাগ সৃষ্টি করেন। একটি 'ত্রিপুরাবতী' দ্বিতীয়টি 'ত্রিপুরী সারং'। এইসব অমৃত সুরধারা ত্রিপুরাবাসীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রচার এবং সঙ্গীত প্রসারের মূলে ছিলেন ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণ। বীরচন্দ্র বাঁশিতে এবং সেতারেও নিপুণ ছিলেন। বিখ্যাত সেতারী এমদাদ খানের কাছে তিনি সেতারে তালিম পান। রাসলীলার সময়ে মৃদঙ্গ কাঁধে নিয়ে তিনি আসরে নেমে পড়তেন। তাঁর সময় থেকেই

রাজ অন্তঃপুরের বা বাইরের ব্যক্তিদের তৈরী হোলির গানগুলিতে উচ্চাঙ্গ সুর সংযোজিত হয়।

ফটোগ্রাফি শিল্পে বীরচন্দ্রের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। আজো তাঁর হাতের তোলা ফটোগুলো নিখুঁত ও উজ্জ্বল রয়েছে। সার্ভে জেনারেল অফিসের কর্ণেল ওয়াটার হাউজ এবং মীর ক্যাম্প প্রভৃতি ইংরেজ ফটোগ্রাফার বিশারদদের লেখা থেকে তাঁর এই নিপুণতার বিষয়ে জানা যায়।

তাঁর পুত্র সমরেন্দ্রনাথ (বড় ঠাকুর) ফটোগ্রাফিতে উৎসাহী ছিলেন বলে তাঁকে এ বিদ্যা আয়ত্ত করতে আমেরিকা পাঠান। শিক্ষা শেষে সমরেন্দ্রনাথ সেখানে ফটোগ্রাফির প্রদর্শনও করেন। বীরচন্দ্র ফটোগ্রাফি প্লেট ও কাগজ নিজেই তৈরী করতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতেন ম্যানেজার ম্যাকলীন, দীনবন্ধু নাজীর, রুহিচন্দ্র দে প্রমুখ। বীরচন্দ্র নিজে একটি চিত্রগ্রাহক যন্ত্র তৈরী করেছিলেন।

এই বিদ্যাকে ত্রিপুরায় প্রচারিত করতে তিনি ফরাসী শিক্ষক অ্যাপোলোনিয়াসকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সহায়তাতেই বীরচন্দ্র কলোডিয়ান পদ্ধতিতে ফটো তুলতে সক্ষম হন।

এইসব বিদ্যা রাজ পরিবারের লোকজন ছাড়াও বাইরের অন্যান্যদের মধ্যেও চর্চিত হয়েছে। বীরচন্দ্র ভালো আঁকতেও পারতেন। প্রতি বছর রাজ প্রাসাদে চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হত। বীরচন্দ্র জল রঙ, তেল রঙে ছবি আঁকতেন।

রাজপ্রাসাদের দেহরক্ষী কুস্তিগীরদের কাছ থেকে কুস্তি এবং ব্যায়াম শিখতেন। তরবারি, বর্শা খেলা ইত্যাদিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

বলাই বাহুল্য তাঁর উৎসাহে আদর্শে এসব শিল্প সংস্কৃতির চর্চা ঠাকুর, কর্তা সমাজ থেকে শিক্ষিত আদিবাসী সমাজে প্রচলিত হয়। আগরতলায় তখন ঘরে ঘরে গানবাজনা ছবি তোলা, ছবি আঁকার চর্চা অনুসৃত হতে থাকে।

ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা রাজভাষা হিসেবে প্রচলনের জন্য তিনি ১৮৭৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করেন। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা ত্রিপুরায় ব্যবহার না করাই ছিল এ আইনের লক্ষ্য। এ সময় থেকেই নানাভাবে তিনি বৃহত্তর বাংলার সাহিত্য, কাব্য ভাষার চর্চায় অর্থাদি সাহায্য করেছেন সাধ্যমত। অবশ্য তাঁর এই কর্মকাণ্ড আজ নানাভাবেই সমালোচিত হচ্ছে কারণ তিনি তাঁর রাজ্যের আদি ভাষা ককবরকের স্বীকৃতি বা উন্নতির জন্য কোন প্রয়াস নেন নি।

ব্যক্তিগতভাবেও তিনি বাংলা ভাষার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন। 'ঝুলন' 'হোলী' 'প্রেম মরীচিকা' 'উচ্ছ্বাস' 'অকালকুসুম' এবং 'সোহাগ' নামে তিনি কয়েকটি কবিতার বই প্রকাশ করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত গবেষক দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। অন্ধ কবি হেমচন্দ্রকে মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করেন। তবে এসব বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব

শক্তির খ্যাতি বাইরে ছড়ানোর আগেই উচ্ছ্বসিতভাবে উপহার সহ তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে বৃহত্তর বঙ্গদেশের সংস্কৃতিতেও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁর রাজসভায় আয়োজিত রাস নৃত্য দেখে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে নৃত্যশিক্ষক প্রার্থনা করাতে তিনি বুদ্ধিমন্ত সিংকে নৃত্য শিক্ষার জন্য দেন এবং ত্রিপুরার পুষ্পশিল্পের বৈচিত্র দেখে রবীন্দ্রনাথ পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে এই শিল্প শিখে নিতে উৎসাহ দেন। এর পরই শান্তিনিকেতনে উৎসবে অনুষ্ঠানে নৃত্যে পুষ্পশিল্পের প্রচলন হয়।

বাংলাদেশে এর আগে ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের মধ্যে নৃত্য চর্চার কোন প্রচলন ছিল না। বুদ্ধিমন্ত সিংহের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যে বাঙালী মেয়েদের নৃত্যকলা চর্চা শুরু করেন। অথচ এ সময়ে ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরে কুমারীদের মধ্যে নাচগান পূর্ণ মাত্রায় শিল্প লাবণ্যে চর্চিত ও প্রচলিত ছিল। শান্তিনিকেতনে হোলি উৎসবও ত্রিপুরার উৎসবের ভিত্তিতেই চালু হয়।

রাধাকিশোর মাণিক্যও পিতৃদেবের ঐতিহ্য বজায় রেখে গুণী জ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা, সাহায্য এবং শিল্পকলা চর্চার ধারা বজায় রেখেছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে তাঁর গবেষণার জন্য দশ হাজার টাকা দান, শান্তিনিকেতনের বহ্ম বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য এবং নিয়মিত অর্থ পাঠানো ছাড়াও বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য নানা পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি অর্থ সাহায্য করেছেন।

বাধাকিশোর মাণিক্যের রানী রত্নমঞ্জরী, যাঁকে ঢাকা থেকে আনা হয়েছিল বলে 'ঢাকা লেইমা' বলা হত। অপূর্ব সুন্দরী ও অশেষ গুণবতী ছিলেন তিনি। তাঁর বাবা মহারাজ দেবেন্দ্র সিং মণিপুরের রাজবংশীয় ছিলেন। তিনি ঢাকা চলে গিয়েছিলেন। রত্নমঞ্জরী সঙ্গীত নৃত্যে পটিয়সী ছিলেন। খুব ভালো খোলও বাজাতে পারতেন। রাসনৃত্য এবং অন্যান্য মণিপুরী নৃত্যকে আলঙ্কারিকভাবে তিনি রাজ অন্তঃপুরে চালু করেন। তখনকার দিনে এসব নৃত্যগীত শিক্ষা রাজকুমারীদের বিভিন্ন যোগ্যতার সঙ্গে বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃত হত। বীরচন্দ্রের কন্যারা — কুমুদিনী, মৃণালিনী, ললিতবালা দেবীরা এভাবেই মণিপুরী নৃত্যে নৈপুণ্য লাভ করেন।

ত্রিপুরায় মহিলা শিক্ষা সংস্কৃতির অগ্রগণ্যা এবং সার্থক রূপকার হিসেবে নাম করা যেতে পারে মহারানী তুলসীবতীর। সাধারণ দরিদ্র ঘরের মেয়ে তুলসীবতী ত্রিপুরায় মেয়েদের শিক্ষার অদম্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁরই চেষ্টায় প্রথম রাজ অন্তঃপুরে, পরে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির দীঘির পুব পারে এবং পরে বর্তমান স্থানে তুলসীবতী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। বনমালী পণ্ডিত, ভুবন পণ্ডিত, সরোজিনী চৌধুরী — এদের নিয়ে প্রথমে স্কুল শুরু হয় পরে রাধাকিশোর একটি অবৈতনিক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার চেষ্টা নেন। ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বাহুল্যের কারণে পড়ুয়াদের কাছ থেকে বেতন নেয়ার প্রস্তাব দেন। সেটি রাধাকিশোর মাণিক্যের পছন্দ হয় নি বলে তিনি শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দেন।

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সময় থেকেই ত্রিপুরায় নেপালী সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে।

তাঁর মহারানীরা প্রায় সকলেই নেপালী ছিলেন।

এ সময় থেকেই রাজ অন্তঃপুরে ভিন্নতর বর্ণবহুল সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য একজন প্রতিভাধর চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁর 'সন্ন্যাসী' 'ঝুলন' ইত্যাদি অপূর্ব চিত্রগুলি গুণীজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। রাজ অন্তঃপুরে এসময়ে বহু নাটক, নৃত্যানুষ্ঠান নিয়মিত হত। এই নাট্যচর্চার প্রভাব ত্রিপুরায় জনসাধারণের উপরও পড়ে। রাজ অন্তঃপুরের বাইরেও এসময়ে নাটকের চর্চা হয়েছে। তাঁর কন্যা মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবী ত্রিপুরার সংস্কৃতিতে একটি অনন্য সাধারণ নাম। তিনি নৃত্য সঙ্গীত চিত্রকলা নাট্যচর্চা সবদিকেই সমান প্রতিভাময়ী। কাব্য কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা ছাড়াও গীতিনাট্য ইত্যাদি রচনা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।

১৯৭৫ সালে আগস্ট মাসে আগরতলা মিউজিয়ামে তাঁর এবং তাঁর দুই কন্যা ধৃতি ও হৈমন্তিকার একানব্বইটি ছবির প্রদর্শনী হয়। বিষয়বস্তুর বৈচিত্রে এবং অঙ্কন সূক্ষ্মতায় এটি সবাইকে মুগ্ধ করে। এক কথায় কমলপ্রভার প্রতিভার পরিচয় সম্ভব নয়। আজ ত্রিপুরার বাঁশ শিল্পের যে সুনাম এবং গৌরব বহির্ত্রিপুরা এমনকি বহির্ভারতেও বিস্ময় ও প্রশংসা জাগিয়েছে, তার উদ্ভাবক মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবী। আপন খেয়ালে বাঁশের টুকরো দিয়ে তিনি যেসব শিল্পদ্রব্যের নমুনা তৈরী করেছিলেন (যেমন, নারী মূর্তির ল্যাম্প শেড, অ্যাশ ট্রে, জাগ, ফুলদানী, পুতুল, হবি ক্রিশমাস কার্ড, গয়না) সবই ত্রিপুরা সরকারের শিল্প প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছে। তাঁর থেকেই সব নমুনা নেয়া হয়েছে। তবে তাঁর মৌলিক সৃষ্টির কাছাকাছিও সেগুলো যেতে পারে নি।

ত্রিপুরার কিছু মহিলাদের নিয়ে আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে তিনি সংরক্ষণ ক্লাব তৈরী করেন। ছেঁড়া কাপড়, বোতল, ভাঙা কাঠের টুকরো, খালি কৌটো ইত্যাদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ফেলে দেয়ার মত বা আবর্জনার বস্তু তৈরী করেছেন। ছেঁড়া সুতো, কাপড় থেকে টুপি, সোয়েটার, ব্লাউজ, তুলোর ওপর সুতো দিয়ে নানা জিনিষ, পেপার পাল্প থেকে পেপার ওয়েট, কাঁথা কত কি করেছেন। এসবের পেছনে কোন ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। সাংসারিক প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের লক্ষ্যেই এগুলো করতে চেষ্টা করেছেন। গৃহিনীদের দিয়ে বিক্রয়যোগ্য ক্রিশমাস বা অন্যান্য কার্ড করিয়েছেন। মোম মাটি ইত্যাদির জিনিষও এই ক্লাবে তৈরী হয়েছে।

বীরেন্দ্র কিশোর উঁচু দরের সেতার শিল্পী ছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর সেতার বাদনের রেকর্ড হয়েছিল যদিও তা বাইরে বের করান নি তিনি। এই বাদ্য, সঙ্গীত, চিত্রকলার প্রতিভা তাঁর পুত্রকন্যা নাতিনাতনীরা পান। এদের মধ্যে পৌত্রী ঝর্ণা দেববর্মা সঙ্গীত জগতে যথেষ্ট নাম করেছেন। রাজ অন্তঃপুরের এই শিল্পচর্চার পরিবেশে ত্রিপুরার আরো অনেক শিল্পী তৈরী হয়েছেন। এদের প্রতিভা লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে। শচীন দেববর্মণের মত বাইরে গেলে এদেরও নাম যশ অর্থ সবই হত।

উজীরবাড়িতে অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণ (১৯০০) সঙ্গীত-বাদ্য-চিত্রকলার চর্চা করেন।

রাজ দরবারে যেসব বড় বড় শিল্পী আসতেন, তিনি তাঁদের দেখাশোনা করতেন। এভাবেই ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। রাজ অন্তঃপুরের সুদীর্ঘকাল আবদ্ধ সঙ্গীত বাদ্য সাধনাকে তিনি বাইরে ছড়িয়ে দেন। ত্রিপুরা ঐকতান বাদন সমিতি নামে ১৯২৬ সালে একটি অবৈতনিক সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করেন। পরে এরই নাম হয় 'অনিল সঙ্গীত বিদ্যালয়'। বহির্ত্রিপুরায় অনেক অনুষ্ঠানে যোগদান করে তিনি প্রশংসা পান। এগুলির মধ্যে ১৯৩২ সালে এলাহাবাদে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন, ১৯৩৪ সালে কলকাতায় বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স উল্লেখযোগ্য। কলকাতার অনুষ্ঠানে মহারাজ বীর বিক্রম ছিলেন সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্বোধক। তাঁর আঁকার হাত ছিল চমৎকার। 'চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর সহ কীর্তনাভিসার' এবং 'প্রেমময় যীশুখ্রীষ্টের ছবি' — এ দুটি বীর বিক্রম তাঁর নিজস্ব বৈঠকখানায় রেখেছিলেন। তাঁর বংশের সলিলকৃষ্ণ, উৎপলকৃষ্ণ, প্রাঞ্জলকৃষ্ণ ঠাকুরেরা সকলেই প্রখ্যাত কবি শিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মহারাজা বীর বিক্রম ত্রিপুরার শেষ মহারাজ নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না কিন্তু বিদ্যা এবং সুকুমার শিল্পের চর্চার একজন আগ্রহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিক্ষা এবং সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠায় তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। সামন্ততান্ত্রিক রাজা হিসেবে একটি বিশেষ ব্যবস্থার অংশীভূত হয়ে রাজাদের অনেক সময় দুর্নাম কুড়োতে হয়। পার্শ্বচর বা রাজকর্মচারীদের বাড়াবাড়িতেও এমন দুর্নামের ভাগী হতে হয়। বীরবিক্রমের জীবন বিচারে ভবিষ্যত বিশ্লেষণে তাঁর নামে প্রচলিত অনেক দুর্নামের বোঝা হয়ত হালকা হয়ে যাবে। তিনি অগ্রণী হয়ে ত্রিপুরায় বৃহৎ জনগণের ভাষা সংস্কৃতির জন্য চেষ্টা করেন নি এটা যেমন সত্য তেমনি জনশিক্ষা আন্দোলনের সূত্রে স্থাপিত বিদ্যালয়গুলির অধিগ্রহণে বিরোধিতা না করে খুব সহজে তিনি সম্মতি দান করেছিলেন এটাও সত্য। ত্রিপুরায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারে তাঁর বিদ্যাপত্তন নামের শিক্ষা পরিকল্পনা এবং মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের প্রতিষ্ঠা তাঁর চিন্তা চেতনা জগতের উৎকর্ষতা প্রমাণ করে। দিল্লীর কনট প্লেসের মত আগরতলায় মহারাজগঞ্জ বাজারকে তিনি তৈরী করান। নীরমহলও তাঁর শৈল্পিক রুচির পরিচয় দেয়।

রাজ অন্তঃপুবে রাস উৎসবে বড় মাতা মহারানী প্রভাবতী দেবীর দলের সঙ্গে তাঁর নৃত্যচর্চাকারী দলের প্রতিযোগিতা হত।

এভাবে রাজ অন্তঃপুরকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার শিল্প সংস্কৃতির চর্চা আগরতলা শহরে, মফঃস্বলে, অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। এটা অনস্বীকার্য যে এই শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা কোন বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে হয় নি। এগুলো সবই গুরুমুখী, অভিজাত ব্যক্তি বা পরিবার ভিত্তিক উচ্চাঙ্গ শিল্প সংস্কৃতির বস্তু। তবু এগুলোর পাশাপাশিই বিয়ে, সূর্যদর্শন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি আনন্দ উৎসবে রাজ অন্তঃপুরে একদিকে হয়েছে অচাই এনে লাম্প্রা পূজা, জেলে কৈবর্ত মহিলাদের গ্রামীণ গান, অন্যদিকে ব্রাহ্মন পুরোহিতের শাস্ত্রাচার সম্মত ক্রিয়াকাণ্ড। আবার এরই সঙ্গে কীর্তন আসর, বহির্বাটীতে ওস্তাদী গান বাঈজীর আসর।

মোটামুটি কোনটিকেই অস্বীকার বা তাচ্ছিল্য করা হয় নি। এইসব চর্চার মাধ্যমেই

বেরিয়ে এসেছেন লেবুকর্তা, বিপিনকর্তা, বঙ্কিমকর্তা, পুলিন দেববর্মা, লহরী দেববর্মা, কৃষ্ণজিৎ দেববর্মা, অমল দেববর্মা, শৈলেন দেববর্মা, হৃষিকেশ দেববর্মা, অনন্ত দেববর্মাদের মত বিখ্যাত সঙ্গীত-চিত্র-নৃত্য শিল্পীরা, সমরেন্দ্রচন্দ্র, অনঙ্গমোহিনী দেবীর মত সাহিত্যিকরা। *রবি*ইত্যাদির মত মাসিক পত্রিকাগুলি। এখনো রয়েছেন অজস্র প্রতিভাধর জাতি-উপজাতি সাহিত্যিক শিল্পীগণ। এঁরা বৃহত্তর ক্ষেত্র পেলে অনেক বিকশিত হতে পারতেন। হারিয়ে গেছে কত রাগ, কত গান, কত সুর তার ইয়ত্তা নেই। এক সময়ে আদিবাসী প্রধান রাজ্য হলেও কালের যাত্রায় বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে, উদার জীবনবোধের আত্মীয়তায় একটি মিশ্র সাংস্কৃতিক জীবনধারার পরিচয় গড়ে উঠেছে।

ত্রিপুরায় একদিন জুমচাষী জুম করা ছাড়া কিছু জানত না। বাংলাদেশের মুসলমান জিরাতিয়া প্রজা তাদের দিয়েছেন চাষবাসের জ্ঞান, গো-মহিষ পালন পদ্ধতি। তাদের বেত বাঁশের নানা কাজ শিখেছেন বহিরাগতরা। আবার পাল্টা তাদের ওনাহ্ বিবির গান বা রূপবান গান ছড়িয়ে পড়েছিল ত্রিপুরার পাহাড়ে পর্বতে। রাতের পর রাত জেগে চোখের জলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আদিবাসীরা শুনেছেন এসব।

হিন্দুধর্ম বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের ফলে জন্ম মৃত্যু বিবাহে লৌকিক আচারের সঙ্গে মিশে গেছে বৈদিক নিয়ম ক্রিয়াকানুন। বাউল গান, কীর্তন গান ছড়িয়ে গেল ত্রিপুরী জমাতিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ে। বীরচন্দ্র প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে পৈতা নিলেন ত্রিপুরী এবং জমাতিয়ারা। বাঙালীদের ভাষা পোশাক খাদ্যরীতি পূজাপার্বণও ত্রিপুরাতে গুরুত্বপূর্ণভাবে স্থান নিয়ে সকলের জীবনধারায় প্রভাব ফেলেছে।

খাদ্যধারায়ও সেভাবেই এসেছে আদিবাসী খাদ্যাদি — গুদক, পিঠালী, মণিপুরী সিঞ্জু, ইরোম্বা ইত্যাদি। পাঁচ মিশালী উচ্চারণে ছন্দে ভাষা হয়ে গেছে মিশ্রিত। অনেক শব্দেরই মূল উৎসের সঠিক পরিচয় মুছে গেছে। সাজসজ্জার ব্যাপারে কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা, ফুলের গয়না, ফুল — যা এক সময়ে শুধুই আদিবাসী সমাজে প্রচলিত ছিল এবং যা গত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেও অন্যান্য সমাজে অপ্রচলিত ছিল তা সকলের মধ্যেই গৃহীত আদরণীয় হয়ে গেছে। আজকাল বেশীর ভাগ বিয়ে বাড়িতেই আদিবাসী ফুলের গয়না, মালার ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাগরাগিনীর অনুসরণে আবার জাতি উপজাতি সব সম্প্রদায়ে উৎসাহে উদ্দীপনায় হোলির গান তৈরী হচ্ছে, সুর দেয়া হচ্ছে। চতুর্দশ দেবতার পূজায় আদিবাসীদের নিজস্ব পূজা বুড়া দেবতা সিঁদুর চর্চিত হয়ে সকলের শ্রদ্ধায় গৃহীত হয়ে গেছেন। পাহাড় অঞ্চলে মঙ্গলচণ্ডী শনি ধুমধাম করে পূজিত হচ্ছেন। এভাবেই গাজনের গানের সঙ্গে গাজীর মোকাম মিশে গেছে সহজেই।

শুধু বিবাহে নয়, মৃত্যুতেও একের সংস্কৃতির প্রভাব অপরে পড়েছে। রাজ অন্তঃপুরের সংস্কৃতি অনুযায়ী খাট বা পালঙ্কে বিছানা বালিশে সুদৃশ্য মশারী টাঙিয়ে, ফুলের মালায়, আতরে ধূপধুনায় মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার প্রচলন ছিল।

পরবর্তীকালে এই মশারী টাঙিয়ে ফুলে ধূপধুনায় শবযাত্রার রীতিটা সকলের মধ্যেই

প্রচলিত হয়ে গেছে। এভাবেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কৃষ্টি আমরা যাকে বলি সংস্কৃতি, আচার আচরণ, সাহিত্য সঙ্গীত সবই ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহে দৃশ্যত প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হয়েছে। এরপর চলিষ্ণু সংস্কৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দেয়া নেয়ায় বিন্দু বিন্দু জল নিষেকে পত্র পুষ্পবতী হয়ে উঠেছে।

উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ

হীবা মুক্তা মাণিক্যেব ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তেব ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
শুধু থাক
এক বিন্দু নয়নেব জল
কালেব কপোলতলে শুভ্রসমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

আলোচ্য বিষয় তাজমহল নয় -- ত্রিপুবার উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ। হীরা-মুক্তা মাণিক্যের ঘটা এক বিলাস-ব্যসনের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা নিয়ে একদিন এ প্রাসাদ লোকচক্ষে গমগম করতো। কালের কপোলতলে তাজমহলের হীরা মুক্তা লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। তার আজ সে শুভ্র সমুজ্জ্বলতাও নেই — মথুরা অয়েল রিফাইনারীর প্রকোপে তার শ্বেতশুভ্র সমজ্জ্বল দেহ অনেক মলিন হয়ে গেছে। তবে মমতাজ মহলের জন্য একবিন্দু নয়নের জল — সেটা বোধহয় প্রেমিক কবি শিল্পী এমনকি সাধারণ মানুষেরও থেকেই যাবে। কারণ তার মত দেহে মনে নিঃশেষিত হয়ে রমণীয় ভালবাসার ইতিহাস তো সহজে মেলে না এবং সে প্রেম এবং আত্মসমর্পণকে মর্ম দিয়ে অনুভব করার মত স্বামী-প্রেমের মণিকাঞ্চণ যোগও সুলভ ব্যাপার নয়।

একদিন উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের জৌলুস, চাকচিক্য হাঁকডাক যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরাই আবার তার পরবর্তী মলিন দৈন্যদশাও প্রত্যক্ষ করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ আবার তার দেহশ্রী সুশোভনরূপে ফিরে পেয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের হস্তক্ষেপে — অন্য বৃহত্তর মর্যাদায়। লোকসমাগমে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ এখন বছরের বিভিন্ন সময়ে গমগম করে। এখান থেকেই একদিন সামন্ততান্ত্রিক শাসনে ত্রিপুরাবাসীর ভালোমন্দ নির্ধারিত হতো। আজ উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ, যা বিধানসভা, সেখান থেকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহীত হয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে ত্রিপুরাবাসীর বর্তমান এবং আগামী দিনের উন্নতির রূপরেখা।

বয়সের দিক থেকে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ খুব একটা কৌলীণ্য দাবী করতে পারে না। ত্রিপুরার রাজবাড়ি বিভিন্ন রাজকীয় শাসনের আমলে বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে।

আগরতলায় শহর এবং রাজধানী পত্তনের আগে রাজধানী এবং রাজবাড়ি ছিল উদয়পুরে। আগরতলা শহরের পত্তন করেন মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য। তাঁর রাজবাড়ি ছিল পুরান আগরতলার বর্তমান চৌদ্দদেবতার বাড়ির পুবদিকে। সেই রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ এখনো রয়েছে।

মহারাজ কৃষ্ণকিশোর ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী রোম্যান্টিক এবং সাহসী শিকারী। তিনি পারস্য ভাষায় দক্ষ ছিলেন, শস্ত্র বিদ্যা এবং মল্লযুদ্ধে ছিলেন সুনিপুণ। তন্ত্রশাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ ভক্তি ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ছিল অনেক রমণীর আনাগোণা। তাঁর মহিষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আসামের রাজকন্যা রত্নমালা, মণিপুরের মহারাজা মারজিতের কন্যা চন্দ্রকলা, অখিলেশ্বরী, বিধুকলা। এছাড়াও ছিলেন মহারাণী সুদক্ষিণা। সুদক্ষিণার গর্ভেই জন্মান ঈশানচন্দ্র, উপেন্দ্রচন্দ্র ও বীরচন্দ্র। অখিলেশ্বরীর গর্ভে জন্মান নীলকৃষ্ণ। মহারাজা কৃষ্ণকিশোরের ত্রিপুরী ও মণিপুরী আরো অনেক কাছুয়া মহারাণী ছিলেন।

মহারাজা মণিপুরের রাজকন্যা কুটিলাক্ষী দেবীকে বিবাহ করেন। এরপর সাধারণ পরিবারের আরো তিনজন রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এছাড়াও তাঁর ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অনেক কাছুয়া পত্নী ছিল। মহারাণী কুটিলাক্ষীর গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র নামে তাঁর এক পুত্র জন্মায়। তাঁর অভিষেককালে ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণকিশোরকে যুবরাজ এবং কৃষ্ণচন্দ্রকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই কৃষ্ণচন্দ্র মারা যান।

পারিবারিক কোন অজানা কারণে — মহারাজ কাশীচন্দ্রের সঙ্গে যুবরাজ কৃষ্ণকিশোরের মনোমালিন্য হলে কাশীচন্দ্র আগরতলা ত্যাগ করে উদয়পুরে চলে যান এবং ১৮২৯ খ্রীঃ সেখানে জ্বর হয়ে মারা যান।

মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের জীবন ব্যাঘ্র শিকার, ব্যাঘ্রের বিবাহ, বরাহ এবং অন্যান্য শিকারের ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিলো। শিকারের সুবিধার জন্য তিনি অনেক অর্থব্যয় করে আগরতলার (অর্থাৎ এখনকার পুরোনো আগরতলার) কাছাকাছি এক জলাভূমিতে 'নূতন হাবেলী' নামে এক শহর গড়ে তুললেন এবং রাজপাট স্থাপন করলেন।

সেই রাজবাড়ির কোন ছবি বা বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে সে সময়ে পুরোনো রাজবাড়িতেও (চৌদ্দ দেবতার মন্দির সংলগ্ন) মহারাজা এবং পরিবার পরিজন বাস করতেন। ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দের (১৮৪৯ খ্রীঃ) ২রা বৈশাখ রাতে, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার সময় রাজপ্রাঙ্গনে তিনি বজ্রাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী, অপব্যয়ী পিতার ১১ লক্ষ টাকার ঋণজালে জর্জরিত হয়ে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। একদিকে আর্থিক অশান্তি এবং অন্যদিকে তাঁর দেওয়ান বলরাম হাজারী ও তার ভাই শ্রীদামের দুর্ব্যবহারে ক্ষিপ্ত জনসাধারণের বিদ্রোহে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। পরীক্ষিৎ ও কীর্তি নামে দুজন পাহাড়বাসী সর্দার ত্রিপুরী ও কুকি জনতা সহ তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তির তিন

বছরের মধ্যেই বলরামের বাড়ি আক্রমণ করে। বলরাম পালিয়ে যান। শ্রীদাম কীর্তির হাতে মারা পড়েন। মহারাজ ঈশানচন্দ্র বলরামের শত্রুগণকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র কীর্তিকে বধ করেন। বলরামের প্রতি উপেন্দ্রচন্দ্রের একটু অন্যায় অনুগ্রহ ছিল। সেজন্য তিনি অনেকসময় অন্যায় কাজ করতে যেতেন। এতে মহারাজ ঈশানচন্দ্র বাধা দিতেন বলে বলরাম তাঁর বন্ধু রামমাণিক্য বর্মণ, কাপ্তান সর্দার খাঁ, ছোবান খাঁ নামে কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে মহারাজাকে হত্যার পরিকল্পনা নেন। কিন্তু বিশ্বস্ত অনুচরের মুখে এই ষড়যন্ত্রের খবর জেনে যাওয়ায় মহারাজা কাপ্তান সর্দার খাঁ, বলরাম হাজারী এবং রামমাণিক্যকে নির্বাসিত করেন। এরপর ব্রজমোহন ঠাকুরের কাছে রাজ্য এবং জমিদারী পরিচালনার ভার দেন।

ব্রজমোহন ঠাকুর ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে পদে পদে অপমানিত হচ্ছিলেন। চাকলা রোশনাবাদ প্রায় বিক্রি হয় হয় অবস্থা। এমন সময় বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে রাজা উপাধি পান, কথা দিলেন ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা তিনি করবেন তবে প্রধানমন্ত্রীত্ব তাঁকে দিতে হবে। কিন্তু বাদ সাধলেন রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী। তিনি অন্যান্য অমাত্যদের পরামর্শে রাজাকে নিযুক্তিপত্র দিতে মানা করলেন। ঈশানচন্দ্র মাণিক্য নিযুক্তিপত্র ছিঁড়ে করে ফেলে দিয়ে গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে বললেন — প্রভু, চাকলা রোশনাবাদ রক্ষার আর উপায় দেখছি না। আপনি রাজ্য এবং জমিদারী রক্ষার ভার নিন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনবিহারী ত্রিপুরার শাসনভার নিলেন। শিক্ষিত না হয়েও অসাধারণ বুদ্ধিবলে ও সুকৌশলে তিনি রাজ্য চালাতে লাগলেন। ব্রজমোহন ঠাকুর, গোলকচন্দ্র সিংহ এবং গুরুদাস বর্ধন — এসব গুরুত্বপূর্ণ অমাত্যদের মতামত না নিয়ে তিনি কিছু করতেন না। আয় বাড়িয়ে ব্যয় কমিয়ে দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন। এ সময়েই সিপাহী বিদ্রোহের পলাতক সৈন্যরা ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করলে ঈশানচন্দ্র মাণিক্য তাদের বাধা দিতে শুরু করলেন। মহারাজের পক্ষে গোলকচন্দ্র সিংহ হলেন 'পলিটিকেল অফিসার'। তিনি এ বিষয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

ধর্মপ্রাণ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য শেষ পর্যন্ত একটা জিনিষ সহ্য করতে পারলেন না। গুরু বিপিনবিহারীর চাকলা রোশনাবাদের অন্তর্গত 'সিদ্ধ-অসিদ্ধ' নিষ্কর জমি বলে ও কৌশলে বাজেয়াপ্ত করার বদ্ধ পরিকর কার্যধারায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। অনুরোধ জানালেন — প্রভু, একাজ থেকে বিরত হোন। আমার পূর্বপুরুষগণ অনেক নিষ্কর জমি দান করে গেছেন। এগুলোর সনদ যদি কালক্রমে নষ্টও হয়ে গিয়ে থাকে তাহলেও সেটা হরণ করে নিলে ঘোর নরকে পতিত হতে হবে। বিপিনবিহারী বোঝালেন — তোমার সব পাপ আমি নিলাম। লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করে আমি তোমার লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করবো। মহারাজের একথা প্রীতিকর মনে হলো না। প্রথমেই বলক্রমে একজন রাজপুরোহিতের ব্রাহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত করে বিপিনবিহারী তাঁর কর ধার্য করলেন। তাঁর বন্দোবস্তী পাট্টাতে মহারাজের

সিলমোহরের ছাপ দেবার জন্য ঈশানচন্দ্রের কাছে নিয়ে এলে তিনি আবার অনুরোধ জানালেন — প্রভু, এ কাজ থেকে বিরত হোন। গুরু বললেন, বাবা তা হয় না। তিনি নিজে মহারাজের বাক্স খুলে সিলমোহর নিয়ে কালি মাখিয়ে মহারাজের হাত দিয়ে বললেন — আমার আজ্ঞা পালনের জন্য এ পাট্টায় তোমাকে মোহর করতে হবে। গুরুভক্তি পরায়ণ নৃপতি গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্য 'শ্রীগুরু আজ্ঞা' মোহরের ছাপ মারলেন। কিন্তু ধর্মভয়ে ভীরু নৃপতির হৃদয় কেঁপে উঠলো।

এর কিছুক্ষণ পরেই মহারাজ একটা চিঠি লেখার জন্য কলম নিলেন কিন্তু কলম নাড়তে পারলেন না। তার ডান হাত কাঁপতে শুরু করলো। সেদিনের বিচারে ও ভাষায় এটা ছিল তাঁর পাপকর্মের ফল—অভিশাপ।

আজকের দিনে আমরা বলবো, সাইকো সোম্যাটিক ডিজিজ, সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাধি। যাই হোক, এভাবেই মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ঈশানচন্দ্র মাণিক্য দুরারোগ্য বাতব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন।

অসুস্থ হওয়ার আগে থেকেই আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে থাকার জন্য তৈরী হচ্ছিল মহারাজের নূতন অট্টালিকা। এটা তৈরী হয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার পর (১৮৬২ খ্রীঃ) ১২৭২ ত্রিপুরাব্দের ১৬ই শ্রাবণ মহারাজার নূতন অট্টালিকায় যাবার দিন ঠিক হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য মহারাজের পেছনেই ছিলো। নির্দিষ্ট ১৬ই শ্রাবণে তিনি মহারাণী, কুমার-কুমারী, অন্যান্য পবিবার পরিজন দাসদাসী সহ গৃহপ্রবেশ করলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় পরদিনই সকাল ১০টায় অসাধারণ গুরুভক্তিপরায়ণ প্রজারঞ্জক মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য লোকান্তরে চলে গেলেন।

এই রাজপ্রাসাদটি বর্তমান উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের পশ্চিমে ছিল। এর ছবি এখনো রাজবাড়ির তোষাখানায় রায়েছে। এটি ছিল দ্বিতল অট্টালিকা। উপর ও নিচে দুটি তলাতেই সামনের বারান্দায় গোল গোল মোটা থামের সারি। দেখতে প্রায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির চেহারা।

ছবিতে দেখা যায় যে রাজপ্রাসাদের সামনে অগণিত জনতার ভীড়। এরই মধ্যে কারুকার্য করা ছাতার নিচে প্রাসাদের সামনে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় কেউ আছেন এই জনসমুদ্রের মাঝে। কোন মহারাজা কি? সঠিক ব্যাখ্যার সাহায্য পাইনি বলে উল্লেখ মুস্কিল।

বীরচন্দ্র সিংহাসনে বসার আগে বেশীরভাগ কাটিয়েছেন পুরোনো আগরতলার রাজবাড়িতে। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পর তিনি সিংহাসনে বসলেন ১৮৬২ খ্রীঃ। তাঁর আমলে রাজপ্রাসাদের সৌখীন আভিজাত্য, অলঙ্করণ, জাঁকজমক সবই বাড়লো। বহুমূল্য গালিচা পাতা ঘরে ফরাসের উপর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, ভারতবিখ্যাত গায়ক বাদক — কোথাও বিরাট সোনার থালায় অপূর্ব কারুকাজ করা। ছাদ থেকে ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন — কোন ঘরে দুর্মূল্য টেলিস্কোপ, বিভিন্ন ক্যামেরা — এমনি সাজানো থাকতো রাজপ্রাসাদের ঘরগুলি।

১৮৬২ থেকে ১৮৯৬ তিনি সিংহাসনে ছিলেন। তাঁর আমলেই পার্বত্য ত্রিপুরা হয়ে

ওঠে আধুনিক ত্রিপুরা। সাজ-পোষাক, সঙ্গীত-বাদ্য, কাব্য-কবিতায়, আইন-অনুশাসনে রাজস্ব ও বিচারব্যবস্থায় তিনি ত্রিপুরাকে সুসংস্কৃত, সুচারু এবং গুণীজন প্রশংসিত করে তুললেন।

১৮৯৭ খ্রীঃ রাধাকিশোর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং সে বছরই ১২ই জুন এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ফলে নূতন হাবেলীর রাজপ্রাসাদ একেবারে নষ্ট হয়ে গেলো। রাধাকিশোর কোনরকমে ছোটখাটো কিছু দালানপাটে কষ্টেসৃষ্টে রইলেন পরিবার পরিজনদের নিয়ে।

এরপরই কোলকাতার প্রসিদ্ধ মেসার্স মার্টিন এণ্ড বার্ন কোম্পানীর উপর ভার দিলেন রাজবাসের উপযোগী একটি প্রাসাদ গড়ে তোলাব। এই কোম্পানীর স্যার আলেকজান্ডার মার্টিন, আর. এন. মুখার্জী মহারাজ রাধাকিশোরের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দেই মহারানী ভিক্টোরিয়ার সারা ভারতবর্ষব্যাপী জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মার্টিন-বার্ন কোম্পানী বর্তমান উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ তৈরীর পর একে একে মন্ত্রী অফিস, কোর্ট, উমাকান্ত একাডেমী, কারমাইকেল ব্রীজ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল (বর্তমান ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল) তৈরী করেন। ১৯০১ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পব ভারত সরকার কোলকাতায় তাঁব স্মৃতিসৌধ তৈরীর জন্য পরিকল্পনা নেন। সে অনুসারে লর্ড কার্জন মহারাজ রাধাকিশোরের কাছে চাঁদা চাইলে তিনি উত্তর দেন যে,— আমাব এ বাজ্যেই আমি তাঁর স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করবো।

১৯০৩ সালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালের নির্মাণ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। ১৯০৪ সালে যখন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর উডবার্ন সাহেব আগরতলায় আসেন তখন এটাই প্রথম এ ধরণের আগমন বলে খুব ধুমধামের মধ্যে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয় এবং তাঁর দ্বারা হাসপাতালটির উদ্বোধন করা হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে এটির নামকরণ করা হয়েছিল।

১৮৯৯ সালে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ তৈরীর কাজ শুরু হয় এবং ১৯০১ সালে শেষ হয়। এতে খরচ পড়ে প্রায় ১২ লাখ টাকা। সামনের দিকে মোগল গার্ডেন তাজমহলকেই মনে পড়িয়ে দেয়। এরপরেই মূল প্রাসাদ। ১৪৯৪ একর জমির উপরে দাঁড়িয়ে আছে মূল প্রাসাদ। ইটালিয়ান মার্বেলের সিঁড়ির দুপাশে পরীকে দাঁড় করিয়ে উঠে গেছে মাটি থেকে দোতলায়। বার্মা টিক্‌কাঠের বিশাল কাজ করা দরজায় চীনে কারিগরের শিল্পস্মৃতি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে দেখা যেতো প্রথম গোল হলঘরে উপরের মূল ডোমের নিচে রয়েছে বিরাট পিতলের কমণ্ডলু। চারপাশের দেয়ালের খাঁজে হেলান দেয়া ছিলো বীরেন্দ্রকিশোরের আঁকা ছবিগুলো — সন্ন্যাসী, ঝুলন। চাইনীজ রুম, জেড পাথরের বুদ্ধমূর্তি, দেয়ালে জেডের হাতীর দাঁতের ছবি, পালঙ্কে টেবিলে হাতীর দাঁতের কাজ, কাঁচের ফুল — নয়নমনোহর, দুর্মূল্য শিল্পশোভাসমৃদ্ধ সব স্বাক্ষর।

উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে রয়েছে সিংহাসন কক্ষ, দরবার হল (বর্তমান বিধানসভা),

ডাইনীং হল, ড্রেসিং রুম, লাইব্রেরী, স্টাডি রুম, রিসেপশন্ হল — মূল প্রাসাদের সঙ্গে করিডোর দিয়ে পুবদিকে সংযুক্ত রয়েছে লাটমহল। বড় বড় লণ্ঠন, বর্ম, বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র, ভারতীয় যন্ত্রবাদ্যের অপূর্ব সংগ্রহশালায় ভরা ছিলো উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ। বীরেন্দ্রকিশোর ছিলেন জাতশিল্পী। তাঁর আমলে তিনি এনে জমিয়েছেন হাতীর দাঁতের সব জিনিস, শিল্প, সঙ্গীত, সংস্কৃতি বিষয়ক ক্লাসিক্যাল সব বই। জে. এম. ফার্গুসন, ড্যানিয়্যাল প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা সব ছবি। বীরবিক্রম নিয়ে এসেছেন চাইনীজ, জাপানীজ, তিব্বতী, পলিনেশিয়ান, আমেরিকান, কাঠের খোদাই করা ইন্দোনেশিয়ান সমস্ত শিল্প সংগ্রহ। উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে ছিলো সুজার ঐতিহাসিক তরবারি, আওরঙজেবের পত্র, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের উপহার দেয়া অজস্র বই।

রাধাকিশোরের পছন্দ অনুযায়ী রাজপ্রাসাদের ডোমটা করা হয়েছিলো। এই কাঠের কাজ করেছে আগরতলার স্থানীয় লোক দীনা মিস্ত্রী। পুবের দিকের ছোট ডোমটা ইংলিশ ধাঁচের। এতেই উড়তো ত্রিপুরার সিংহলাঞ্ছিত রাজপতাকা। জমির উপর থেকে ৮৬ ফিট উঁচু এই রাজপ্রাসাদের দরবার ঘরে বছরের বিভিন্ন সময়ে বসেছে বিভিন্ন দরবার সঙ্গীত সম্মেলন। ওপরের ব্যালকনীতে ঘেরা পর্দায় বসতেন অন্তঃপুরের রানী, মহারানী, কুমারীরা।

নিচতলায় ছিলো বিলিয়ার্ড খেলার হল, কাঠের মেঝেওয়ালা বলরুম, নাচের ঘর। বীরবিক্রমের আমলে মূল প্রাসাদের আরো সংযোজন হয়েছে। পশ্চিম দিকে পেছনের করিডোব দিয়ে সংযুক্ত রাজার বাসকক্ষ, অন্দরমহল।

সাধারণত মহারাজারা মূল রাজপ্রাসাদ, যা বৈঠকখানার মতো ব্যবহার হতো তাতে রাত্রিবাস করতেন না। বহির্মহলে যখন বিভিন্ন দরবারের পাশাপাশি চলতো গান বা নাচের জলসা, তখন অন্দরমহলে চলতো ঝুলন, রাস, কীর্তন, থিয়েটারের রিহার্সাল। দোল উপলক্ষে সমস্ত রাজপ্রাসাদ রঙে, গন্ধে, সুরে মাতাল হতো। বিভিন্নভাবে গান তৈরী করে, সুর সংযোজন করে, সচিত্র পুস্তিকা ছাপিয়ে উৎসবকে আনন্দমুখর করে তোলা হতো।

সকালে বেজে উঠতো বিউগল, রাজপতাকা উত্তোলিত হতো। বিকেলে আবার বিউগলের শব্দে রাজপতাকা নামতো। উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন দরবারে আগমন নির্গমনের কঠোর বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছিলো। একে লঙঘন করা চলতো না। বিভিন্ন দরবার উপলক্ষ্যে দরবারীরা কে কেমন পোষাক পরবেন, কোথায় দাঁড়াবেন, কিভাবে দরবারের কাজ চলবে সবই নির্ধারিত করা থাকতো।

দরবারের রাজপুরুষগণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও উচ্চ কর্মচারীরা যে কোন জাতির যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন মাথায় পাগড়ি, চোগা-চাপকান পরে দরবারে তাকে আসতে হতো। তেমনি ছিলো রাজপ্রাসাদ সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী। উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের চারটি দ্বার ছিলো — সিংহদ্বার (দক্ষিণে), পূর্বদ্বার, উত্তরদ্বার ও পশ্চিমদ্বার। ২নং পূর্বদ্বার এবং ৪নং পশ্চিমদ্বার ছিলো সর্বসাধারণের প্রবেশ ও নির্গমন পথ। সকাল আটটা থেকে এগারোটা এবং বিকেল ছ'টা থেকে সাতটা এটা খোলা থাকতো। রাজবাড়ির বা সরকারী

গাড়িঘোড়া ছাড়া ভাড়াটিয়া ঘোড়া ও গরুর গাড়ির প্যালেস সুপারিন্টেডেন্টের কাছ থেকে পাশ নিতে হতো।

রাজবাড়ির প্রয়োজনে, নিজ তহবিল বা তোষাখানার বা সংসার অফিসের কাজে এসব যানবাহন আসতে পারবে। কিন্তু উপযুক্ত পাশ ইত্যাদি না থাকলে প্রহরী আটকে দিতে পারতো। ভাড়াটিয়া গাড়ি নিয়ে সিংহদ্বার দিয়ে ঢোকা নিষেধ ছিলো। কোন মিছিল, বাদ্য-ভাণ্ড, ঔষধ বা থিয়েটার সার্কাসের বিজ্ঞাপনদাতার দল, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগী, বিকলাঙ্গ বা অঙ্গহীনের প্রবেশ ছিলো নিষিদ্ধ এবং নিষিদ্ধ ছিলো না শ্রীশ্রীযুতের সরকারী মিছিল, বাদ্য-ভাণ্ড, রথাদির গমনাগমন, প্রসিদ্ধ সাধুসন্ন্যাসী, ফকির — এঁরা কোন সুপরিচিত পণ্ডিত বা তফশীলের সঙ্গে ঢুকবেন। যাদের এইসব আইন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তারা বাদে অন্যান্যরা প্যালেস সুপারের কাছ থেকে পাশ নিয়ে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষাকালে ইতস্তত ভ্রমণ করতে পারবে না। তাহলে গার্ড-কমাণ্ডার-পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগমতে মোকদ্দমা চলতে পারবে।

এই নিয়মের বাইরে ছিলেন রাজঅন্তঃপুরেব মহিলা, কুমার-কুমারী, শ্রীপাটের (প্রভু-বাড়ি) লোকজন, অন্তঃপুরচারিণীগণ এবং অনুচর-ভৃত্যবর্গ। এঁরা অবাধে চলাফেরা করতে পারবেন। কিন্তু প্রভু ব্যতীত অনুচরেরা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় প্যালেস সুপারের পাশ ছাড়া কোন দ্বার দিয়েই যাওয়া-আসা করতে পারবে না। বিদেশী রাজকুটুম্বেরা এবং মহিলাবর্গও রাজপরিবারের মতোই অবাধে যাতায়াত করতে পারবেন।

এই যাতায়াতের জন্য আরো সুদীর্ঘ নিয়মাবলী বয়েছে, যাব বর্ণনা বিস্তৃত পবিসব ছাড়া সম্ভব নয়।

তবে যাদের পাশ লাগবে না তাদের নামের তালিকা নির্দিষ্ট ছিলো এবং সময়ে প্রকাশিত হতো। মহারাজার দর্শনপ্রার্থী জনতা বা ব্যক্তি পাশ দেখাতে অসমর্থ হলে এবং সেটা প্রহরীকে জানালে প্রহরী গার্ড-কমাণ্ডারকে জানাবেন। মিলিটারী গার্ড হলে মিলিটারী কমাণ্ডান্টের কাছে, পুলিশ হলে পুলিশ সুপারের কাছে। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায় জানতে পারলে, সেভাবে কাজ করা হতো।

এই নিয়মে ছিলো, বিশেষ কারণ না থাকলে দূর দেশ থেকে আগত দর্শকগণকে প্যালেস সুপার প্রবেশ-নির্গমন এবং প্যালেস দর্শনের পাশ দিতে আপত্তি করবে না।

কোন উৎসবাদি উপলক্ষ্যে রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গন এবং উদ্যান চব্বিশ ঘন্টা বা ততোধিক কালের জন্য খোলা রাখার প্রয়োজন থাকলে প্যালেস সুপার, শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর ও শ্রীশ্রীমতী মাতা ঈশ্বরী মহাদেবী এবং শ্রীল শ্রীযুত প্রেসিডেন্ট বাহাদুরের অনুমতি গ্রহণ করে পুলিশ মিলিটারী অফিসে পত্র লিখে এ সংবাদ জানালে, সেইমতে পুলিশ অফিস থেকে ঢোল মহরত দ্বারা প্রচার হবে। কিন্তু এ সময়ে যাতে শান্তি রক্ষা হয় সেদিকে পুলিশ সুপারকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

রাত্রি দশটার পর সরকারী কাজ ছাড়া কেউ রাজবাড়ির মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা

করতে পারবেন না। রাউণ্ড অফিসারগণ ছাড়া সরকারী কাজ বলে যাতায়াত করলেও তার নাম কাজের বিবরণ লিখে প্রহরী উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

পাশ থাকুক আর না থাকুক, নেশাসক্ত বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে রাজবাড়ির মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা করতে দেওয়া হতো না।

যাঁরা বিনা পাশে ঢুকতে পারবেন তাঁদের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ, ডাক্তার, লেডী ডাক্তার, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, পুরোহিত-ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত ঠাকুর লোকগণ ছিলেন।

উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দরবার অনুষ্ঠিত হতো যেমন, নববর্ষ দরবার, মহারাজার জন্মতিথি দরবার, বিজয়া দশমী দরবার ইত্যাদি।

মহারাজাদের দরবার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী কঠোর বিধিবদ্ধভাবে প্রতিপালিত হতো। বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের সময়েই এটা মেমো নং ৮২ বলে ১৯৪৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী সুশৃঙ্খলভাবে পূর্ণ প্রচারিত হয়।

এতে বলা হয়েছিলো যে, সাধারণভাবে দরবারের পোষাক হবে রেশম অথবা যে কোনপ্রকার উপযোগী (কালো রঙ ব্যতীত) কাপড়ের আচকান কিম্বা চাপকান। হাঁটু থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা হলে ভালো হয়। পায়জামা (চুড়িদার) সাদা অথবা কালো ছাড়া যে কোন রঙেব পাগড়ি, তলোয়ার।

বিশেষ দরবারের পোষাক হবে বেনারসী কিংখাব বা তাস, ঢাকাই বুটিদার রেশম বা সাটিনেব ব্রোকেডের আচকান কিম্বা চাপকান (কালো রঙ ছাড়া)। এটাও হাঁটু থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা থাকবে। পায়জামা (চুড়িদার) সাদা অথবা কালো ছাড়া যে কোন রঙের পাগড়ি, তলোয়ার।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ মেমো নং ৮৪ অনুসারে জানানো হয়, নববর্ষের দরবারে দরবারীরা কোথায় দাঁড়াবেন, বসবেন। চোপদারগণ, রাজচিহ্নধারীগণ কোথায় দাঁড়াবে। আসাবরদার, সোঁটা বরদার, বিনন্দিয়া, বল্লমধারী, বিশিষ্ট ঠাকুর লোকগণ, পুলিশ, মিলিটারী ব্যাণ্ড, বডিগার্ড, অর্ডারলী, জমাদার, উজীর বাহাদুর, সুবাসাহেব, কুমার-কুমারীরা, চামরধারী, ময়ূরপুচ্ছধারী, এ.ডি.সি প্রাইভেট সেক্রেটারী, রাজমন্ত্রী, চীফ জজ ইত্যাদি প্রত্যেকে কে কিভাবে দাঁড়াবেন, কে কোনটা আগে-পরে করবেন, সবই নির্ধারিত করে দেওয়া হয।

নির্ধারিত ছিলো, কিভাবে পণ্ডিত পুরোহিত স্বস্তিমন্ত্র পাঠ করবেন, কিভাবে দরবারস্থ সকলকে পান, আতর দেওয়া হবে, কিভাবে মহারাজ প্রজাদের অভিবাদন নেবেন, কোন সময় নাচঘরে যাওয়া হবে, আবশ্যকীয় আমোদ-প্রমোদ করা হবে ইত্যাদি।

সাধারণ দরবার, বিশেষ দরবারগুলি ছাড়াও উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে হতো গার্ডেন পার্টি। মহারাজা যাওয়ার আগে নিমন্ত্রিতরা উপস্থিত হতেন — মহারাজা উপস্থিত হলে জাতীয় সঙ্গীত হতো। সবাই দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাতেন। এরপর পার্টি শেষ হলে আতসবাজী পোড়ানো হতো। এব পোষাক ছিলো সাধারণ দরবারী পোষাক।

এইসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সৈন্যদের পরিচালনার জন্য বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ছিলো।

কিভাবে মহারাজা গাড়ি থেকে নামলে রয়্যাল স্যালুট দিতে হবে — জাতীয় সঙ্গীত একটু নয়, সম্পূর্ণাংশে বাজাতে হবে — কতবার তোপধ্বনি হবে — কিভাবে মার্চপাস্ট হবে সবই ঠিক করা ছিলো। এগুলো একটুও এদিক ওদিক হতে পারতো না।

এসব আজ এক বিগত দিনের ইতিহাস। শুধু কৌতূহলের বিষয়। উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ তার সেই কঠোর নিয়মকানুন, সামন্ততান্ত্রিক বিলাসব্যসনবহুল জীবন পেরিয়ে এসে নীরব সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। নূতন এক ভূমিকাকে বুকে নিয়ে, সগৌরবে।

ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজে কুসংস্কার

পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ৪৬০ কোটি বছর আগে। আর মানুষ সেখানে এসেছে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে। সেই থেকে মানবসমাজে এসেছে নানা পরিবর্তনের প্রবাহ। কোথাও দ্রুত, কোথাও ধীর কোথাও সমাজ বয়ে গেছে স্থির আবর্তে। এরই মধ্যে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ কৌম সমাজজীবন পরিচালিত হয়েছে প্রকৃতির নির্ভরতায়। এই প্রকৃতির বিভিন্ন কার্য-কারণের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী মন নিয়ে মানুষ সেদিন ব্যখ্যা করে বুঝে উঠতে পারেনি। ঝড় ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ বজ্রপাত রোগ-শোক সবকিছুর পেছনেই মানুষ খুঁজেছে এক অতি প্রাকৃত কোন শক্তি বা রহস্যের ইশারাকে। এভাবেই তাদের দৈনন্দিন জীবনে ভয়-ভীতি, বিস্ময়জাত নানা প্রাকৃতিক রহস্যকে ভূত-প্রেত, অপদেবতার কাজ বা তাদের দৃষ্টি জাত বলে ব্যাখ্যা করে। এবং এসব থেকে রেহাই পেতে ওঝা পুরোহিতের শরণাপন্ন হয়। নিজেদের জীবনে কতগুলি নিষেধাজ্ঞা, পূজাপার্বণ, নিয়মকানুন সৃষ্টি করে নিজেদের নিরাপদ করতে চেষ্টা করে।

এ ব্যাপারে আমরা দেখি সময়ের সঙ্গে পা ফেলে যে মানবগোষ্ঠী নিজেদের আহৃত অভিজ্ঞতা, উন্নত শিক্ষা, উন্নত চেতনা অনুসার করতে পেরেছেন তাঁরা নানা কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে অনেকাংশে বর্জন করে বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনে প্রবেশ করেছেন এবং ক্রমশ এসব থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত জীবনযাপন করছেন।

কিন্তু অরণ্যচারী আদিবাসী সমাজ আজও প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাত্রায় সর্বত্রই তাদের সেই পুরানো ধ্যানধারনা বিশ্বাস কুসংস্কারকে অবলম্বন করেই জীবন কাটাচ্ছেন। এ বিষয়ে আদিবাসী সমাজজীবনে যেখানে শিক্ষার প্রসারতা ঘটেছে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার ঘটেছে সেখানে এসব কুসংস্কার ভ্রান্ত ধারণা অনেকাংশে লোপ পেয়েছে। ভারতে ৫৬৫৩টি জাতিগোষ্টীর মধ্যে ৬৩৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে। তার মধ্যে ২০০র মত আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতে।

১৯৯১ সালের লোক গণণায় সাতটি রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৩১,৫৪,৭০১৪ জন। এই জনসংখ্যার মধ্যে ৮১,৪২,৬২৪ জন উপজাতি এবং ২১,৬১,১৬১ জন তপশীলি জাতি সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ১০,৪৮৬ বর্গ কি.মি. আয়তনের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায়

রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মোট আদিবাসী সংখ্যার ১০.৪৮ শতাংশ। মোট উনিশটি সম্প্রদায়ের আদিবাসী রয়েছেন ত্রিপুরায়। এই বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের জীবনযাত্রায় কিছু কিছু তফাৎ থাকলেও মূলত: এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য রয়ে গেছে প্রবল।

প্রধানত জুমভিত্তিক জীবনযাত্রার চেতনা লালিত সংস্কৃতিতে ধর্মীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও এইসব আদিবাসী সম্প্রদায়ে নানা কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণাগুলো প্রায় কাছাকাছি। এইসব কুসংস্কার ভ্রান্ত ধাবণাগুলোর রকমফের রয়েছে। এগুলো দৈনন্দিন জীবনে তারা নানাবিধি নিষেধের মধ্যে পালন করেন। যেমন বাড়ির কোন লোক বাইরে বেরোবার সময় বা বাইরে গেলে মাথা ধোয়া নিষেধ, ঘর মোছা, ঘর ঝাঁট দেয়া নিষেধ। মহিলারা ঋতুমতী হলে চুলা ছোঁবেন না, রান্নাবান্না করবেন না। তাদের ছোঁয়া কোন খাদ্যদ্রব্য পুরুষরা খাবেন না। গোয়ালঘরে ঢোকা, গরুর তত্ত্বাবধানও নিষেধ। পুকুরে নেমে স্নান করবেন না। গোলাপ ফুল তুলবেন না। গাছ থেকে লঙ্কা তুলবেন না, এছাছা রাত্রিতে আয়না দেখা নিষেধ। বাড়িতে কারো মৃত্যু হলে এরপর কেউ মাথা ধোবেন না, তেল দেবেন না। মেয়েরা গাছে উঠবেন না অন্তঃসত্বা অবস্থায় মৃগেল মাছ খাবেন না। বালিশের উপরে কেউ বসবেন না। ঘরের বীমের নিচে ভাত খেতে বসা ও রাত্রিবেলা শিস্ দেয়া নিষেধ। জোড়া কলা মেয়েরা খাবেন না। গ্রহণের সময় কেউ খাবেন না। গর্ভবতী নারী কোন কাটছেঁড়া করবেন না। রাত্রিবেলা লুকোচুরি খেলা নিষেধ। শনি-মঙ্গলবারে কেউ নূতন কাপড় পরবেন না। শিশুদের হঠাৎ অসুখ হলে ভাবতে হবে ডাইনের দৃষ্টি লেগেছে ইত্যাদি বহু নিষেধ রয়েছে যাদের সবগুলিকে কুসংস্কার বলা চলে না। কারণ এগুলো প্রায়ই সতর্কতামূলক এবং নিরাপত্তামূলক স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা। তবে গ্রহণের সময়ে খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কারের পিছনে রয়েছে গ্রহণ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবজনিত নানা কল্পিত আশঙ্কা।

রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছে নানা কুসংস্কার । যেমন বাড়ি থেকে বেরোনর সময় শূন্য কলসী দেখতে নেই। দুপুরে বাড়িব উপর চিল উড়লে সে বাড়িতে কেউ মারা যাবেন বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া ডাইনী সংক্রান্ত কুসংস্কার রয়েছে। একইরকম ডাইনী বলে চিহ্নিত মহিলার সামনে খেতে নেই। বিনা নিমন্ত্রণে বা নিমন্ত্রণে যদি তিনি এসে যান তবে তাকে আগে বা পরে খাবার দেয়ার নিয়ম ইত্যাদি।

এভাবে বিভিন্ন কুসংস্কার এবং নিষেধাবলী রয়েছে অন্যান্য সম্প্রদায়েও। এইসব কুসংস্কারও ভ্রান্ত ধারণাগুলোর রকমফের রয়েছে। কিছু কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা তেমন সামাজিক অমঙ্গলের কারণ নয়। কিন্তু কিছু কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা শুধু সামাজিক অমঙ্গলের কারণই নয়। এটা নৃশংস এবং মানবতা বিরোধী। সেজন্যই সেটা নিতান্ত নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে আদিবাসী সম্প্রদায়ে এই ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার থেকে শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকেই সর্বাংশে মুক্ত নন।

উল্লিখিত ক্ষতিহীন অথবা কম ক্ষতিহীন কুসংস্কারগুলির সংখ্যাও বহু। এগুলো প্রায়ই তাদের ঐতিহ্যবাহিত নানা দেবদেবীর কল্পনাপ্রসূত পূজা, যেগুলো আদিবাসী জীবনের

ধারণা অনুযায়ী তাদের জীবনে অমঙ্গলের দৃষ্টিকে বা পাপ-তাপকে সরিয়ে মঙ্গলকারক হয়ে উঠবে। এই সব দেবদেবীরা সবাই অতি প্রাকৃতিক জগতের এবং অলৌকিক শক্তিধর এইসব দেবদেবীর পূজা-অর্চনার দ্বারা আদিবাসীদের জীবনে নানা দুর্যোগ, ঝঞ্ঝাট এব ভোগান্তির শেষ হয়। এদের মধ্যে যারা হিন্দু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো মূলত: হিন্দু পৌরাণিব কাহিনীনির্ভর। তাদের পূজাঅর্চনায় তান্ত্রিক প্রভাব বা যাদুটোনার চর্চা দেখা যায় বেশী।

এদের কিছু মঙ্গলকারক দেবতা হচ্ছেন মতাই কতর এবং মতাই কতর মা (বড় দেবতা এবং তার পত্নী) তুইমা (গঙ্গা বা জলদেবী) সংগ্রাম (তুইমার স্বামী) মাইলুমা (ধান ও শস্যের দেবী) খলুমা (কার্পাসের দেবী) নকসু মতাই (গৃহদেবতা) কালিয়া গড়িয়া (সম্পদ সাফল্যের দেবতাগণ) সাকলাকা মতাই (স্বাস্থ্যের দেবতা)। এইসব দেবতারা আনন্দ, মঙ্গল এবং শান্তি সুখের কারক। কিন্তু এরই পাশাপাশি রয়েছে কিছু অশুভ দেবদেবী, যেমন থুম-নাই রুক, এবং বনিরুক। এরা মৃত্যুর দূত। এজন্যই তাদের খুশী রাখতে তাদের পূজা করা হয়। দুটি মুরগী বা দুটি ডিম উৎসর্গ করে থুম নাই রুককে বাড়ির উঠানে পূজা করা যায়। কিন্তু বনিরুককে জঙ্গলে পূজা দিতে হয়।

বুড়াসা দেবতাও ব্যাধির দেবতা। যখন ঘরে বাচ্চা বুড়ো বা অন্যান্য সদস্যরা অসুস্থ হন তখন ভাবা হয় যে বুড়াসা দেবতার অসন্তুষ্টির কারণে এগুলো ঘটছে। তখন দুটি কালো মুরগী এবং দুটি ডিম দিয়ে বুড়াসার পূজা করা হয়। এই পূজাও একেবারে গ্রামের বাইরে করতে হয়। বুড়াসার পত্নী হাই চুকমাও অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী। গৃহপালিত পশু হারিয়ে গেলে তার কাছে মানত করা হয় সেটিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। এই দেবতাকেও দুটি কালো মুরগী অথবা একটি ছোট বা বড়ো শুয়োর দিয়ে পূজা দিতে হয়। এছাড়াও ঘরের কোণে শিয়রের উপরে থাকেন কোণা দেবতা। তাকেও ভয়ে ভীতিতে সন্তুষ্ট রাখার জন্য পূজা দেয়া হয়। এইসব দেবদেবীর কোন নির্দিষ্ট প্রতিমা নেই। মুলীবাঁশ দিয়ে এদের বেদী এবং প্রতীক তৈরী করে পূজা করা হয়। মাইলুমা খলুমার প্রতীক ধান এবং তুলা দুটি মাটির হাঁড়িতে ঘরে রেখে নিত্য ধূপধূনো দিয়ে পূজা করা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত পূজাগুলির কোন ক্ষতিকর দিক নেই। কিন্তু দেখা যায় হাসপাতালে এসে চিকিৎসিত হতে থাকলে কিছুটা রোগমুক্তির পরও আদিবাসী সমাজে বহু মানুষ সম্পূর্ণভাবে আধুনিক চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল হতে চান না। চিকিৎসা সম্পূর্ণ না করেই পাহাড়ে গিয়ে মুরগী কেটে ডিম বলি দিয়ে জঙ্গলে পূজা করেন সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য। এভাবে কোন রোগ মাঝখানে বিগড়ে গিয়ে বেড়েও যেতে দেখা যায়। বাচ্চাদের ব্যাপারেও নজর লাগা, বাতাস লাগা ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা থেকে সময়মতো চিকিৎসার অভাবে শিশুর প্রাণহানি বা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কোন শারীরিক ক্ষতি হয়ে যায়। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এমনকি শিক্ষিত মানুষদের মধেও এসব ভ্রান্ত ধারণার জন্য বিজ্ঞানধর্মী চিকিৎসার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় যা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত।

এখন উপরে বর্ণিত দেবদেবীদের তেমন কোন ভয়ঙ্কর বলা যায় না। আদিবাসী

জীবনে অতি ভয়ঙ্কর সামাজিক অন্যায়, বিশৃঙ্খলা এবং নৃশংসতা ঘটে যে দেবতার জন্য তিনি হচ্ছেন 'ছেকাল জুক' বা ডাইনী দেবী। সমাজে যেসব মহিলারা 'ডাইনী' বলে অচাই বা পুরোহিতদের দ্বারা চিহ্নিত হন এবং বিশ্বাস করা হয় যে তারা এমন নারী যার সঙ্গে শয়তান বা কোন দুষ্ট আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। এরা নানা মন্ত্রতন্ত্র জানেন এবং ম্যাজিক শক্তির অধিকারী। এরা অন্যের ক্ষতি তথা প্রাণহরণ করতে পারেন, অন্যের শরীরে রোগ চালান দিতে পারেন। এদের দৃষ্টিতে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। শিশু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের ইউরোপে বেশীরভাগ ডাইনীর শাস্তি বা দন্ড দেয়ার মূলে ছিল কোন গ্রামবাসীর অভিযোগ — সে ডাইনী। এদেশে আদিবাসী সমাজে ডাইনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী চিকিৎসক যারা হবেন তারা প্রায়ই ট্রাইবাল এবং আদিম কৌম সমাজের অন্তর্ভুক্ত। ডাইনী খোঁজার চেষ্টা মানেই কোন নারীকে চিহ্নিত করা এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা করা। মুশকিলের কথা এই ডাইনীরা অবশ্যই লোকের অপ্রিয়, ব্যক্তিত্বপূর্ণ বা নিরীহ, সহায় সম্বলহীন অথবা উল্লেখযোগ্য সম্পদের অধিকারিণী একক নিঃসহায় হন।

এইসব তথাকথিত ডাইনীদের দ্বারা উৎপাদিত রোগ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পেতে আদিবাসী সমাজ ছেকাল জুক-কে পূজা দেন। এই পূজা গ্রাম থেকে অনেক দূরে বাইরে করা হয়। গ্রামবাসীর কোন আকস্মিক রোগ ব্যাধি ঘটলে অচাইকে ডেকে এ পূজা দেয়া হয়। অচাই মুরগী কেটে নাড়িভুঁড়ি পরীক্ষা করে বলেন যে এতে ডাইনীর দৃষ্টি পড়েছে। এরপরই ঘটে বেদনাদায়ক ঘটনাটি। অচাই দিশা দেখে ডাইনী বলে চিহ্নিত করে দেন কোনো নারীকে। অতীতে ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজে ডাইনীদের ভয় করলেও নির্যাতন বা প্রাণহরণ করা হতো না। সামাজিকভাবে তাদের এড়িয়ে চলা হতো। কখনো তার যাদু ক্ষমতাকে কাজেও লাগানো হতো। তারই উদাহরণ রয়েছে রাজমালায়। 'বলাগ্‌মা' নামক ডাইনীর সাহায্য নিয়েছিলেন মহারাজা ধন্যমাণিক্য যখন মুসলমান সেনাপতি হৈতান খাঁ গৌড় থেকে এসে ত্রিপুরা আক্রমণ করেছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্না বলাগ্‌মা। তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও চাতুর্যে গোমতী নদীর উপর দিকে বাঁধ দিয়ে কলাগাছের অসংখ্য ছোট ছোট ভেলা বানিয়ে বাঁশ দিয়ে পুতুল তৈরী করে হাতে মশাল গেঁথে ভেলায় বসিয়ে বাঁধ ছেড়ে দেন। ফলে নিম্নবর্তী নদীখাতে শিবিরবাসী মুসলমান সৈন্যরা আচমকা জলে ভেসে যায় এবং প্রতিটি মশালধারী বাঁশের টুকরাকে ভেলার উপর শত্রু সৈন্য ভেবে রণে ভঙ্গ দেন।

মহারাজ বলাগ্‌মাকে পুরস্কৃত করেন। কিন্তু সময়ের প্রবাহে আজ এই চিত্র সম্পূর্ণ পাল্‌টে গেছে। ডাইনীরা তাদের বুদ্ধিমত্তা কৌশলের জন্য কোন কার্যকরী স্থান পাচ্ছেন না। উলটে 'ডাইনী' বলে চিহ্নিত নারী সংঘবদ্ধ সামাজিক হিংসা এবং অত্যাচারের বলি হচ্ছেন। সবচেয়ে দুঃখের, তাঁরাই ডাইনী বলে চিহ্নিত হচ্ছেন যারা বিধবা স্বামী পরিত্যক্তা দুর্বল, একা কম বা বেশী কিছু সম্পত্তির অধিকারিণী, সধবা হলেও স্বামী নিরীহ এবং সামাজিক প্রতিপত্তিহীন।

এছাড়া আরেক ধরনের নারীকে ডাইনী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে যারা বুদ্ধিমতী,

প্রাগ্রসর, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, যাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে হীন উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ধ্বংস করে দেয়া। ইদানীংকালে পর পর বেশ কয়েকটি ডাইনী সংক্রান্ত ঘটনা ঘটে গেছে যা দুঃখজনক এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন--

এক) ১৯৯৭ সালের মার্চে জিরানীয়া থানাধীন মান্দাই সন্নিহিত এলাকায় এন.সি. কলোনীতে কার্তিক দেববর্মার স্ত্রী বীণা দেববর্মাকে কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি বাড়ি থেকে ডেকে এনে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ডাইনী সন্দেহে পিটিয়ে মেরে ফেলেন।

দুই) ১৯৯৯-এর জুন মাসে জিরানীয়া থানাধীন দুই নম্বর এন.সি. কলোনীর বাসিন্দা মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার বাড়িতে রাতে তিন সশস্ত্র দুস্কৃতি জল খাওয়ার অছিলায় দরজা খুলিয়ে তাকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করেন। ভদ্রমহিলা একা দুটি ছোট ছোট ছেলে নিয়ে থাকতেন। আট কিলোমিটারের মধ্যে কোন বাড়ি ছিল না। এই মহিলাকে 'ডাইনী' ঘোষণা দিয়েই হত্যা করা হয়েছিল।

তিন) ১৯৯৯-এর জুনের আরেকটি ঘটনা। অম্পির গ্রামীণ হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে মৃত রানী দেববর্মার মৃত্যুর জন্য তার মেয়ের জামাই (জিরানীয়া বাড়ি) প্রদীপ দেববর্মা প্রচার করেন যে কুঞ্জলক্ষ্মী দেববর্মা এবং বিশ্বলক্ষ্মী দেববর্মা দুজনেই 'ডাইনী' এবং তাদের জন্যই রানী দেববর্মা মারা গেছেন। সুতরাং কুঞ্জলক্ষ্মী এবং বিশ্বলক্ষ্মীকে অবিলম্বে গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। এই নির্দেশের প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন মাধাই দেববর্মা। যিনি একদিন গ্রাম পাহাড়ে এসব জঘন্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তিনি এভাবে 'ডাইনী' আখ্যা দিয়ে কাউকে গ্রাম ছাড়ানো বা নির্যাতন করা অন্যায় বলে বলেন। প্রদীপ দেববর্মা মাধাইকে কুপিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দেন এবং ১৬ই জুন ১৯৯৯ সনে তৈদু বাজার থেকে ফেরার পথে মাধাই দেববর্মাকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে মারে।

চার) ১৯৯৯-এর জুলাই মাসে সিধাই তৈরাজ-বাড়ি গ্রামের লক্ষ্মী দেববর্মা, যিনি সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত মহিলা স্বাস্থ্য প্রকল্পের কাজ করতেন এবং সেই মহিলা মন্ডলের সভানেত্রী, একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্না সুপরিচিত বহু ভাষাবিদ মহিলা ছিলেন। তাঁকে অত্যন্ত অন্যাযভাবে ডাইনী আখ্যা দিয়ে কিছু সমাজবিরোধী-- মলিন দেববর্মা, কুলেন্দ্র দেববর্মা, রাজেন্দ্র দেববর্মা, প্রবীর দেববর্মা -- এই চারজন তারই আত্মীয়, তাকে নিজের বাড়িতে কুড়ালের আঘাতে মেরে ফেলে। অভিযোগ হলো লক্ষ্মী অসুস্থ মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মাকে ২৬শে জুলাই দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি ২৫শে জুলাই থেকে অসুস্থ ছিলেন। লক্ষ্মী দেখে আসার পর মঙ্গলেশ্বরী সন্ধ্যাবেলা মারা যান। সেদিনই সন্ধ্যায় অচাইকে ডাকা হয়েছিল। অচাই এসে বলেন তার মৃত্যুর কারণ কোন ডাইনের দৃষ্টি। এক্ষেত্রে 'অচাই' লক্ষ্মীর নাম বলেননি। তবু লক্ষ্মীকে হত্যা করা হয়েছিল 'ডাইনী' ঘোষণা দিয়ে।

সাধারণতঃ অচাই প্রদত্ত ঘোষণায় গ্রামবাসীরা ডাইনীর শাস্তির পূর্বাহ্নেই জানতে পারেন তার পরিচয়। লক্ষ্মী দেববর্মার ক্ষেত্রে গ্রামে তার সম্পর্কে ডাইনী বলে কোন আলোচনা ছিল না। খুনীরা নির্দেশ দিয়েছিলে গ্রামবাসীরা কেউ যেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান না

করে। এই ঘোষণার পরও তার লোকপ্রিয়তা এবং সমাজসেবায় মুগ্ধ মহিলারা তার সৎকার কাজে অংশ নেন। এটা ছিল এক ইতিবাচক দিক।

ডাইনী সংক্রান্ত অপবাদ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখি যে উন্নত কল্যাণকামী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও এই ডাইনী প্রথার শিকার অগুন্তি মহিলা। সবক্ষেত্রেই খুনীরা প্রকাশ্যে মাথায় সিঁদুর, হাতে টাঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে খুনের পর থানার গিয়ে বলে 'ডাইনী মেরেছি একটা'। সেক্ষেত্রে গ্রামের লোকেও মুখ খুলে বলে, ''ডাইনী ছিল, মরেছে ভালই হয়েছে''।

এভাবে বহু ঘটনার উদাহরণ দেয়া যায়। সর্বত্রই অসহায় এক নারীকে বৃথা অপবাদ দিয়ে ঘরের কোন সদস্য শ্বশুর, ভাসুর, স্বামী ইত্যাদি বা গ্রামের কোন লোকের অসুস্থতাও মৃত্যুর জন্য ডাইনী আখ্যা দেয়া হয়। অতীতে আখ্যা দিয়ে তাকে ভয় করে এড়িয়ে চলা হতো, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে বঞ্চিত করা হতো। এখন এই আলোকিত শিক্ষা সভ্যতার যুগে 'ডাইনী' নাম দিয়ে নারীকে খুন করা হচ্ছে।

এবিষয়ে খুব আশ্চর্য এবং আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত আদিবাসী যারা সেসব অঞ্চল থেকে এসে স্কুল-কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন এমন আদিবাসী যুবক যুবতী স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীও এই 'ডাইনী' নামক ভ্রান্ত কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। আমার অজ্ঞতায় করুণা প্রদর্শন করে তারা বলেছেন 'তুমি জান না ডাইনী আছে. এটা মিথ্যে নয়'।

সুতরাং এই প্ররিপ্রেক্ষিতে শুধু অসহায় নারীর ব্যক্তিগত সাংবিধানিক অধিকার নয় বৃহত্তর মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে এই অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত প্রয়োজন। প্রয়োজন একে নিঃশ্চিহ্ন করে সমাজকে সুস্থ সুন্দর করে তোলা।

একদিন শিক্ষা সভ্যতার পীঠস্থান ইউরোপেও 'ডাইনী' নামক অবাস্তব বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সমাজে প্রবল ঘৃণা বীতরাগ প্রকাশ পেয়েছিল। নারীকে নোংরা অপবিত্র নরকের দ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। নারী নিগ্রহের চরম রূপ দেখি পুরুষদের যুদ্ধে বা বিদেশ যাত্রার কালে মেয়েদের কোমরে লোহার প্যান্টের মত 'সতীত্ব বন্ধন' বা চেস্‌টিটি বেল্টের প্রবর্তনে।

মধ্যযুগের নারী লাঞ্ছনার আরেকটি রূপ ডাইনী সন্দেহে পুড়িয়ে মারা। জেমস্ স্প্রেঙ্গার তার 'ম্যালিয়াস ম্যালিফিকেয়ার্স' গ্রন্থে দাবি করেছেন যে ইউরোপে ৯০ লক্ষ নারীকে ডাইনী সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। ফ্রান্সে জোয়ান অব আর্ককেও ডাইনী নাম দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

যাই হোক এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় ত্রিপুরা। ত্রিপুরাতেও আমারা দেখেছি উল্লিখিত কিছু ঘটনা বাদেও জিরানীয়াতে এক আদিবাসী মহিলাকে ডাইনী আখ্যা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে তার মাটির ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। সে সময়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনে আলোচনা সভা চলছিল। আরেক ক্ষেত্রে ভয়ভীত এক মহিলাকে

চৌকির তলায় তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে মারা হয়েছিল।

১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেজিং রাষ্ট্র সম্মেলনের ডিরেক্টার জেনারেল বুট্রাস ঘালি ঘোষণা করেছিলেন-- 'নারীর প্রতি হিংসা মানবাধিকারের চরম উল্লঙ্ঘন। আমাদের সবাইকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে'। এই প্ররিপ্রেক্ষিতে ডাইনী সম্বন্ধীয় অত্যাচারের গুরুত্বকে খুব ভালে করে বুঝতে হবে। কারণ কোথাও তা যেমন অশিক্ষা, পশচাদপদতা থেকে জন্ম নিচ্ছে আরেকদিকে সেটার উৎসমূলে শুধু ভ্রান্ত সংস্কার নয়, রয়েছে বঞ্চনা এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। তাকেও বিচার করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আলোকে যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে আজ আদিবাসী সমাজের মূল মানসিকতায় ছড়িয়ে দিতে হবে যার জন্য প্রয়োজন ঘন ঘন আলোচনাসভা, সচেতনতার শিবিরের ব্যবস্থা করা।

রাজ অন্তঃপুরের অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা

মহাকাব্যের যুগ যেমন নেই মহারাজের যুগও নেই। ইংল্যান্ডে রাজা আর তাদের রাজা এরা থাকবেন, এমনি হচ্ছে অভিমত। তবু এরই মধ্যে আমাদের হৃদয় ভাগের একটা দিক থাকে যাতে রাজারাজড়াদের প্রশংসনীয় দিকগুলি আমাদের কৌতূহল মনোযোগ এবং ভালোবাসা আকর্ষণ করে। তাঁদের সঙ্গীত শিল্প সাহিত্যচর্চায় দিক তাঁদের বদান্যতার দিক, তাঁদের মোহময় যাদুকরী সাজসজ্জা, ধনবত্ন অলঙ্কার প্রসাধন রঙীন এবং জৌলুষপূর্ণ জীবন-যাপন আমাদের মুগ্ধ করে, প্রশংসা কাড়ে।

আসলে যিনি রাজা তিনিও সামান্য মানুষই তবু তিনি সাধারণ মানুষ হয়েও রূপে গুণে শক্তি সামর্থ্যে, তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অথবা ঔদার্যে হৃদয় গুণে রঞ্জন করেন। এবং এই রঞ্জন করার কাজটুকু করেন বলেই তিনি রাজা।

তাই রঞ্জন করার পর তিনি আর সাধারণ মানুষ থাকেন না। আমরা পছন্দ করে ভালোবেসে তাঁকে নেতা মনে করে হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে রাজা করে তুলি। সেই রাজা যদি যোগ্য হন এবং রাজ্য যদি উপযুক্তভাবে চালিত হয়, তিনি যদি শিল্প-সঙ্গীত-সংস্কৃতির সঠিক পৃষ্ঠপোষক হন তবে সেই একনায়কতন্ত্রেও প্রভূত উন্নতি হয়।

রাজার উৎসাহ উদ্দীপনা এবং রাজ্যবাসীর প্রতি ভালবাসা থাকলে সে দেশের শিক্ষা, শিল্প সঙ্গীত সাহিত্য ব্যবসা-বাণিজ্য দেশের স্বার্থ নিরাপত্তা সবই অভাবনীয় উন্নতির মুখ দেখতে পারে। এ' বিচারে আকবব, অশোক বড় মাপের দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। এরপর অনেক উল্লেখযোগ্য মাঝারি বা ছোট রাজারা যাঁরা একনায়কতন্ত্রের ধারক বাহক হয়েও মোগল অত্যাচারের পথে না গিয়ে নিজের রাজ্য এবং প্রজার উন্নতিকে বড় করে দেখেছেন। কেরালার মত উন্নত রাজ্যের শিক্ষাব হার, স্ত্রী প্রগতির পিছনে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তদানীন্তন ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যের রাজাদের শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টার ইতিহাস।

আমাদের ত্রিপুরার মত একটি ছোট রাজ্যের কথা বলতে গেলেও এই রাজ্যের রাজাদের পুরানো ঐতিহ্যের কথা বলতে হয়। সুদীর্ঘ তেরশ' বছর যাবৎ ত্রিপুরার মহারাজারা রাজ্য শাসন করে গেছেন। তবে এদের মধ্যে অধিকাংশই প্রজাপালক দানে-ধ্যানে ব্রতী, মন্দির, দীঘি প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন। দোল, দুর্গোৎসব, পূজা-পার্বণই শুধু নয়, বছরে একবার

সাধারণ পার্বত্য প্রজাকুলকে নিয়ে মহারাজা একত্র ভোজনেও (হসম ভোজন) তাঁদের অন্তরঙ্গ করে নিয়েছেন। এগুলো সবই একটা বিশিষ্ট চিন্তাচেতনা ঐতিহ্যের ফসল। এ ধরনের ঐতিহ্যের নমুনা আমরা অন্যত্র অন্যান্য রাজবংশে দেখি না।

সময়ের স্রোতে সবই ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান। চিরন্তন হয়ে থাকে শুধু কিছু কথা। কাল থেকে কালে যুগ থেকে যুগে বয়ে চলে মুখে মুখে গানে গল্পে ছড়ায়। একেই কেউ বলে রূপকথা কেউ বলে উপকথা। সামান্য দিনের জন্য সাক্ষী হয়ে থাকে কিছু বাটিকা অট্টালিকা রাজপ্রাসাদ। এঁরা আমাদের কল্পনার জগতে অনেক ইন্ধন যোগায় অ তীতকে টেনে খুঁজে বার করে সহায়তা করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "একথা জানিতে তুমি ভাবত ঈশ্বর সাজাহান/কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান/শুধু তব অন্তর বেদনা/চিরন্তন হয়ে যাক, সম্রাটের ছিল এ সাধনা/রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন/সন্ধ্যারাগ রক্তসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন/...হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা/যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা/যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক/শুধু থাক এক বিন্দু নয়নের জল কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল/এ তাজমহল।"

তাই আছে শুভ্র উজ্জ্বলতা অনেকখানি হারিয়েও মমতাজ মহলের প্রেমে এক বিন্দু নয়নের জলের মতই ভাস্কর দ্যুতিতে দাঁড়িয়ে আছে তাজমহল। এক বিন্দু নয়নের জল আনন্দ বেদনার ঘন পিনদ্ধ হয়ে কবি শিল্পী প্রেমিকের হৃদয়ে অমিলন রয়েই গেছে।

তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ত্রিপুরাব উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ। পূর্বাঞ্চলেব রাজ্যগুলিতে সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ হলেও বয়সে নিতান্ত অর্বাচীন। মাত্র একশ' বছর। বিভিন্ন রাজকীয় শাসনের আমলে ত্রিপুবার নানাখানে নানা ছাঁচে গড়া হয়েছিল রাজপ্রাসাদ। কখনো উদয়পুরে কখনো অমরপুরে কখনো কল্যাণপুরে, কখনো কৈলাসহরে, কখনো খয়েরপুরে পুরানো আগরতলায়— এরপর বর্তমান আগরতলায়। হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা এবং বিলাস ব্যসনের ছটায় ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনু রচনা করে মোটামুটি ভাবে এ প্রাসাদ একদিন লোকচক্ষে বিষ্ময় সম্ভ্রম জাগানো, এ প্রাসাদ গমগম করতো।

একদিন উজ্জয়ন্ত রাজ প্রাসাদের জৌলুষ চাকচিক্য হাঁক ডাক যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাই আবার তার পরবর্তী মলিন দৈন্যদশাও প্রত্যক্ষ করেছেন। এরই মধ্যে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ আবার তার দেহশ্রী, সুশোভন রূপ ফিরে পেল রাজতন্ত্র থেকে সাধারণতন্ত্রের পীঠস্থান বিধানসভা হয়ে। আবার তার অঙ্গনে কিছু জনসমাগম দেখা গেল।

উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের বহিরঙ্গ কিছু ঝলমলে রূপ পেলো কিন্তু তার সংলগ্ন অন্দর মহল জল বিনা মছলীর মতো মৃতপ্রায় থেকে মৃত হয়ে গেল। কারণ যে রাজবৈভব, যে উজ্জ্বল জীবনধারায় সমস্ত অন্দরমহল ছিল সঙ্গীতে, নৃত্যে বিভিন্ন সূক্ষ্ম শিল্পের ছটায় বর্ণবহুল, তার জীবনীশক্তির সে উপাদান আর রইল না। তাই মনে হয় সেই ইতিহাসকে, যেদিন 'এখানে একদিন রাজার ব্যাংকোয়েট হল ছিল। কোর্সের পর কোর্স স্যুপ রোস্ট/লাঞ্চ ডিনারের ছড়াছড়ি সাদা টুপী বাটলারের কর্মব্যস্ত আনাগোনা/টুপী, পাগড়ি আচকানের রামধনু/রঞ্জরের

বাঁট ঠুকে স্ত্রীলোক বালক ভীতি/প্রতিগোট প্রতিহানী'.../হুসহাস্ শব্দে গাড়ী/সারি সারি/ওদিকে অপর পানে/ঝলমলে আলো মাতাল ফুলের গন্ধ/রিন্‌ঠিন্ অলঙ্কার চাপা হাসি/এসেন্সে বাতাস ভারী/চিকের আড়াল থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চার/উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে দুয়ারী/চালে ভারী/কোমরে চাবির গোছা/চৌকাঠ আনলে বানে সীমিত প্রবেশ। বহির্মহলের পাশে এই ছিল অন্দরমহলের চিত্র।

অন্দরমহল ঃ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুতিকাগার

মানবজীবনে অন্দরমহলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষশাসিত সমাজে এ সত্য স্বীকৃত হোক আর না হোক সব অন্দরমহলই অস্তিত্বের তথা মানব সভ্যতার সূতিকাগার। সব শক্তি উৎস আনন্দের খনি। ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যায় নারীরাই। সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যাপারেও তারাই অগ্রণী।

ত্রিপুরার সংস্কৃতিতে রাজ অন্তঃপুরেব অবদান যথেষ্ট। বিজয়, আনন্দ উৎসবে বা স্মরণীয় ঘটনা প্রসঙ্গে যখনই স্মারক বা রোপ্য মুদ্রা প্রচলন করেছেন তখন মহারাজ মহারাণীর যৌথ নামে মুদ্রা প্রচলন করেছেন এবং মহারাণীদের নামের আগে শ্রীশ্রী ব্যবহার করেছেন। শুভকাজ বা মহারাজার যাত্রাকালে যে লাম্প্রা পূজা হয় বিনাইগর বা বিনায়ক গণেশের পূজা হয় সেখানেও মহারাণীর বক্ষবন্ধনী রিয়া দেয়া হয়।

রাজ অন্তঃপুর কথা ঃ প্রাচীন যুগ

খুব প্রাচীন কাল থেকে যদি আমরা অন্তঃপুরচারিণী মহারাণীদের স্মরণ করে তাদের অবদান উল্লেখ করি তবে দেখবো যে মহারাজ ত্রিলোচনের ২৪০ জন সূক্ষ্ম হস্তশিল্প নিপুণা মহারাণীদের (যাঁদের মধ্যে এক ত্রিপুরী যুবতী ছিলেন যিনি মাছির পাখায় সূর্যরশ্মি পড়লে যেমন বিচিত্র বর্ণ সৌন্দর্যের উদ্ভব হয় সেরকম বস্ত্র বুনতে পারতেন) থেকে শুরু করে ছেংথুমফা রাজার (১২২৫-১২৫০ খৃষ্টাব্দ) পত্নী ত্রিপুরার বীরাঙ্গনা রূপসী ত্রিপুরাসুন্দরী (যিনি লুঠেরা হীরা বস্ত্রাগার এর আক্রমণে হৃত মনোবল ত্রিপুরা সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করে স্বয়ং যুদ্ধে যান এবং বিজয়লাভ করেন) খিচোংমা রাজার (১২৭০-১২৮০ খৃষ্টাব্দ) রাণী খিচোংমা (যিনি বস্ত্র বয়ন শিল্পে ছিলেন অসামান্য পারদর্শিনী, যাঁর সম্বন্ধে রাজমালায় লেখা আছে— তাঁর পুত্র খিচোংমা ছিল তাহার রমণী/বিচিত্র বয়ন শিক্ষা নির্মাণে তিনি মন থেকে নূতন ডিজাইন বা নমুনা বার করে অন্যদের শিক্ষা দিয়েছেন। এবং এভাবে রাজ পরিবারের প্রযত্নে প্রাচীনকাল থেকে বয়নশিল্পের প্রচলন ও উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটেছিল) মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের রাণী জাহ্নবী দেবী (যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর ১৭৮৩-১৭৮৫ দু'বছর রাজ্য শাসন করেছিলেন এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন) ধন্যমাণিক্যের দানশীলা

সহৃদয়া পত্নী রাণী কমলাবতী (যিনি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগিনী ছিলেন এবং যাঁর নামে কসবার কমলাসাগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) গোবিন্দমাণিক্যের (১৬৬৭-১৬৭২ খৃষ্টাব্দ) স্ত্রী মহারাণী গুণবতী দেবী (যিনি অশেষ গুণে গুণবতী ছিলেন, গ্রামোন্নয়নে আগ্রহী এবং অত্যন্ত দয়াশীল ছিলেন। মৃত্যুদন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত রিয়াং বন্দীদের নিজের বুকের দুধ বাটিতে নিয়ে পান করিয়ে আজীবন রাজ আনুগত্যের ঘোষণা আদায় করে তাদের মৃত্যুদন্ড রদ করিয়েছিলেন) রামগঙ্গা মাণিক্যের (১৮০৪-১৮০৮ খীষ্টাব্দ) বাঙালী মহারাণী চন্দ্রতারা দেবী (যিনি সিলেট জেলার সূচিকাশিল্পকে রাজ অন্দরে এনে প্রচারিত করেন) আরেক বাঙালী কন্যা-মহিম কর্ণেলের ঠাকুরমা সরস্বতী দেবী যিনি সূচিকর্মে, ব্রতের আলপনা আঁকায় পটু ছিলেন। মহিম কর্ণেল তাঁর 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে ত্রিপুরার শিল্প পরিচ্ছেদে যাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন— "তাঁর মত সূচিকর্মনিপুণা এ রাজ্যে কম ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত সূচিকর্মের দ্রব্য আমরা দেখিতে পাই নাই। আমার জন্মিবার বহু বৎসব পূর্বে গৃহদাহ হয়... সেইসঙ্গে শিল্পাদর্শ অগ্নিসাৎ হইয়া গিয়াছিল"। সরস্বতী দেবীর কন্যা সন্ধ্যামালার কাছে একটি সূজনী পাওয়া যায়। সেটি মহিম কর্ণেলের মা বদ্রীধামে নারায়ণকে দান করেন।

এঁদের কথা বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ হওয়ায় স্মৃতি রক্ষা পেয়েছে। এছাড়া বহু অগণিত মহিলা নানাভাবে শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ করে গেছেন।

প্রাচীন রাজা ত্রিলোচন (৪০তম) সুবরাই শিল্প সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি করে গেছেন। কার্পাস বপনের প্রথা তিনিই নাকি প্রথম ত্রিপুরায় প্রবর্তন করেন। ত্রিপুরায় ১৩৫ সংখ্যক রাজা অচোঙ্গফা বা রাজ সূটের রাণী অচোঙ্গ মরির নামও শিল্পেব প্রসারে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রতারা, সরস্বতী দেবীর সূজনী শিল্প রাজ অন্দরমহলে আরো চর্চার মাধ্যমে সৌন্দর্যের চরমে পৌঁছেছিল। এই প্রসঙ্গে পদ্মকাটা মলানী অর্থাৎ পদ্মের পাপড়ির অনুসরণে কাপড় কোট মশারী চার মাথায় ঝালরস্বরূপ সাজিয়ে বিশেষ মশারীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

যাহোক এভাবেই রাজ অন্তঃপুরে মূল্যবোধে চূড়ান্ত আদর্শবোধ অনুপ্রাণিত করেন। সন্তানের জীবনে আবার ব্যবহার মানবিকতা, ধর্মভাব সবকিছুকে বিকশিত করেন সেই সঙ্গে গৃহ পরিবেশ এমনকি গৃহাঙ্গনের বাইরে বৃহত্তর পরিবেশকেও আপন মাধুরী দিয়ে প্রভাবিত করে তোলেন। তবে সাধারণ অন্তঃপুরে যেমন সংকট, হিংসা কলহ দ্বন্দ্ব ষড়যন্ত্র থাকে রাজ অন্তঃপুরেও তার অন্যথা হয় না। এমনকি রাজনীতির প্রবল আবর্তেও জড়িয়ে যান এঁরা। তখনই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। এ বিচারে উদাহরণও রাজ পরিবারে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিজের পুত্রকে ক্ষমতার সিংহাসনে বসাতে গিয়েই ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন।

এইসব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সার্বিকভাবে ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরের কথা আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাব কিভাবে বিভিন্ন যুগ এবং কাল পর্যায়ে রাজ অন্তঃপুরের বিভিন্ন রাণী মহারাণী এবং অন্যান্য প্রভাবশালী মহিলারা শুধু রাজ অন্তঃপুর

নয় গোটা রাজ্যের শিক্ষা সংস্কৃতি এবং শিল্প চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

যুগে যুগে রাজ অন্তঃপুর

খুব সঙ্গত কারণেই আমরা আলোচনাকে শতাব্দী শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারি। সেটা করতে গেলে মহারাজা বীরচন্দ্রের যুগ থেকেই আলোচনা শুরু হতে পারে। বহুদিনের প্রচলিত জীবনধারার মধ্যে পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য এনে তিনি যেমন ত্রিপুরায় তেমনি ভিতরের অন্তঃপুরেও নূতন যুগধর্মের সূচনা করলেন।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরে এ পর্যন্ত মোটামুটি তিনটি বড়ো সাংস্কৃতিক ধারার পরিচয় রয়েছে। ১) মূল ত্রিপুরী বা আদিবাসী জীবনধারা ২) মণিপুরী জীবনধারা ৩) নেপালী জীবনধারা। এর সঙ্গে ধাপে ধাপে যুক্ত হয়েছে হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতি অর্থনৈতিক নানা সুত্রে সংযোগের ফলে মুসলমানী সংস্ক্রতিও বহু যুগ থেকেই চলে এসেছে ত্রিপুরায়।

মহারাজা বীরচন্দ্রের (১৮৬২-১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বকাল ঘটনার ঘনঘটায় আলোড়িত ছিল। তিনি সকল দিক থেকেই সার্থক সমাজ সংস্কারক, আধুনিক আইন কানুন এর প্রতিষ্ঠাতা কবি, শিল্পরসিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমালোচনার উর্ধ্বে না হলেও প্রবল ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ উদ্যমী এবং বহু প্রতিভার আকর ছিলেন। তিনি উচ্ছ্বাস (১৮৮৬) সোহাগ (১২৯৩ ত্রিং) শ্রীশ্রী ঝুলন গীতি (১৩০২ ত্রিং) প্রেম মরীচিকা (১৮৮১ খ্রীঃ) হোরী (১৮৯২ খ্রীঃ) এবং আকাশকুসুম (১২৯৬ ত্রিং) নামে পাঁচটি বই লিখেন। ফটোগ্রাফীতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ফিল্মের সব কাজ তিনি নিজে হাতে করতেন। ছেলেমেয়ে পরিবার পরিজনের বিশেষতঃ তৃতীয়া মহারাণী মনোমোহিনী দেবীর যে কত অসংখ্য ফটো তুলেছেন তার হিসেব নেই। তাঁর ছবি তোলার স্টুডিও ঘরটির নাম ছিল 'মানাঘর'। এখানে ছবি তোলাও হতো, নেগেটিভ থেকে পজিটিভও করা হতো। সাধারণ অসাধারণ থেকে ন্যুড ফটো সবই তিনি তুলেছেন। সারা ভারতে যে কয়টি দামী এবং উৎকৃষ্ট ক্যামেরা ছিল তার একটি ছিল বীরচন্দ্রের হাতে। গান লেখা, সুর দেয়া, রাস, হোলী ইত্যাদির নাচ গান করা এবং তার সব বিশিষ্ট নামী সভাসদ যাঁদের জন্য তাঁর সভাকে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা বলা হতো। যেমন গায়ক যদুভট্ট তবলা বাদক কাশেম আলী, সেতার বাদক এনায়েত খাঁ, বিখ্যাত সরোদ বাদক ওস্তাদ আলউদ্দীন খাঁ, নিসার হুশেন খাঁ, কাশ্মীরের কত্থক নৃত্য শিল্পী ফুলন্দর বক্স, বেহালা বাদক হরিদাস স্তোরী, নবীনচন্দ্র গোস্বামী এঁরা ছিলেন তাঁর সভায়। সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শী পদ্মানন মিত্র ত্রিপুরার দরবারে ২২ বছর ছিলেন। তিনি নিজেও খুব ভালো তবলা, বাঁশী এবং পাখোয়াজ বাজাতেন।

রাজ অন্তঃপুরের কথা বলতে গিয়ে রাজার কথা এত সাত কাহন বলার কারণ এরই পাশাপাশি অন্দরের পরিস্থিতিটুকুও বিচার করে বুঝে নেয়া। বীরচন্দ্রের এইসব গুণ

এবং তাঁর শিল্প সঙ্গীত কাব্যচর্চার অমোঘ প্রভাব পড়েছিল সমস্ত পরিবারের উপর। তিনি পুত্র কন্যাদের শুধু সুশিক্ষার ব্যবস্থাই করেননি হাতের লেখা, গানের গাথা, নৃত্যকলা সবই যেন তাদের বিকশিত হয়। তার সুব্যবস্থা করেছিলেন। মেম গভর্ণেস তাঁর কন্যাদের ইংরাজী শেখানো, এমব্রয়ডারী, উল ক্রুসেট বোনা ব্রহ্মণ পণ্ডিতের কাছে বাংলা সংস্কৃত মণিপুরী নৃত্যগুরু বুদ্ধিমন্ত সিংহের কাছে নৃত্য তথা রাজ অন্দরের ত্রিপুরী সেবাইতের কাছে বস্ত্র বয়ন শিক্ষা ছাড়াও সাহিত্য পাঠ সঙ্গীতচর্চা সবই তাদের নিত্য শিক্ষার অন্তর্গত ছিল।

স্বয়ং মহারাণীও কোমর তাতে বুনতেন রেশমের সূতোয়, রূপোয় সূতোয় সোনার সূতোতে ধাবমান হাতী ঘোড়া উড়ন্ত পাখি, প্রজাপতি, সব ফুল লতাপাতার বাহারী বক্ষ বন্ধনী রিয়া কখনো পরনের রিগনাই।

বীরচন্দ্রের অন্দরমহলে ত্রিপুরী এবং মণিপুরী সংস্কৃতির যুগ ছিল। রাজ অন্দরে ককবরক এবং মণিপুরী দুটো ভাষাতেই কথা বলা হতো। বীরচন্দ্রের তিন মহারাণী, ভানুমতী, রাজেশ্বরী এবং মনোমোহিনী দেবী ছাড়াও তাঁর কাছুয়া পত্নী ছিলেন অনেক। এদের গর্ভে তাঁর পুত্র কন্যাও ছিলেন বহু। অনেক সময়ই দেখা যায় কোন কাছুয়া পত্নীকে বিশেষভাবে পুত্র সন্তানের জন্মের পর উপযুক্ত প্রয়োজনে অথবা স্নেহবশতঃ তাকে মহারাণীর মর্যাদা দিয়েছেন পরবর্তী কালে।

এ বিচারে একটি উল্লেখ্য ব্যাপার হচ্ছে যে বহির্মহলে অনেকেরই ধারনা যে এই সব রাজা-রাজড়ারা অত্যাচার করে মেয়ে উঠিয়ে অন্দরমহলে তুলে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের মর্যাদা নিম্নস্তরে ছিল বা আর্থিকভাবে তারা শোষিত বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তা নয়। কাছুয়াদের পছন্দ করে (অথবা অন্দরমহলের রান্না শেখার প্রয়োজনে) মহারাজারা দূতের মাধ্যমে প্রস্তাব দিয়ে নিয়ে এলেও তাঁদের স্বীকৃতি একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণকে সাক্ষী রেখে পত্নীত্বে বরণ করা হতো।

এরপর এদের জন্য জায়গাজমি, মা'সোহারা, পোযাক আশাক অলঙ্কারাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা হতো। এবং আগেই উল্লেখ করেছি যে যেখানে গর্ভস্থ সন্তানকে হয়তো সিংহাসনে বসানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে সেখানে তাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহারানীত্বে উত্তরিত করা হতো। তাদের কোথাও অবহেলায় রাখা হচ্ছে বা নিষ্ঠুরতা করা হচ্ছে এমন দেখা যেতো না।

বীরচন্দ্রের তিন মহিষী ভানুমতী, রাজেশ্বরী এবং মনোমোহিনী তিনজনই মণিপুরী ছিলেন। এব মধ্যে মনোমোহিনী ভানুমতীর বোনঝি এবং খুবই অল্পবয়স্কা ছিলেন। ভানুমতীর গর্ভে সমরেন্দ্রচন্দ্র, রাজেশ্বরীর গর্ভে রাধাকিশোর, অনঙ্গমোহিনী এবং মনোমোহিনীর গর্ভে আট কন্যা — নলিনী, কুমুদিনী, মৃণালিনী, ক্ষীরোদ, নন্দিনী, প্রসন্নময়ী, কুসুমকুমারী, ললিতবালা এবং শৈলেন্দ্রবালা একমাত্র পুত্র-ব্রজনিধি, যিনি নিধুকর্তা নামেও পরিচিত ছিলেন।

কেমন ছিল রাজকন্যাদের জীবন-যেহেতু রাজকুমারী তাই সোনার খাটে মাথা আর রূপার খাটে পা তো বটেই। পদমর্যাদার কারণে হীরে মুক্তা মাণিক্যের ঘটা, ধনবৈভবের

ছটাও তাদের ঘিরেই থাকতো। তবু এত সম্পদ সত্ত্বেও সাধারণ শিশুদের যে সহজাত সম্পদ পিতৃমাতৃ সান্নিধ্য তা তারা পেতো না অনায়াসে। নিয়মকানুন, রাজকীয় আচার অনুষ্ঠান ছিল অন্যরকম। প্রটোকল আছে যা ভাঙা যায় না। যা মেনে নিয়েই তাঁরা বড়ো হন। জন্মের পরই তাঁরা চলে যান ধাত্রী মা বা দুধালী মায়ের প্রত্যক্ষ রক্ষণাবেক্ষণে। দুধালী মায়েরও রয়েছে কোলে সদ্যোজাত শিশু, যে শিশু বেশীরভাগই স্বয়ং মহারাজের। যার স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হয়েছে উপযুক্ত চিকিৎসকের মাধ্যমে। যিনি দুটি সন্তানকেই বক্ষ সুধায় বর্ধিত করার সুযোগ্য অধিকারিণী। যদি নেহাৎই তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব না হয় তবে তাঁর গর্ভের শিশুর জন্য বন্দোবস্ত হবে গরুর দুধ এবং তাঁর বুকের দুধে বেড়ে উঠবেন রাজকুমার-কুমারীরা।

এভাবে রাজপুত্র রাজকন্যারা পেয়ে যান ধাত্রী মা যাঁর বুকের দুধে তাঁরা শুধু বড় হয়ে ওঠেন না, তাঁর শাসনে আদরে তার সঙ্গে দুষ্টুমী আবদারে তাঁরা সাধারণ শিশুর মতই মাতৃ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন।

অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে মহারাণীও তাঁর অবসর মত সন্তানকে কোলে-কাঁখে নিয়ে আদর করেন কখনো স্তন্যও পান করান। মহারাণী মনোমোহিনী দেবী বীরচন্দ্রের সঙ্গে অন্দরের বাইরে ছবি তোলার ঘর 'মানাঘরে' অনেক সময় কাটাতেন।

কুমার কুমারীরা জেনে যান তাঁদের মা বাবা সাধারণ মানুষ নন। ওঁরা মহারাজ-মহারাণী। তাঁদের অনেক বাঁধাধরা নিয়ম। দূরাগত অতীত থেকে বয়ে আনা কিছু পুরানো ঐতিহ্য বা ক্রিয়া কর্ম থাকে। এরপর থাকে ব্যক্তিগত শৈল্পিক সূক্ষ্ম কার্যাবলী। আরামে আয়াসে চাইলেই তাঁদের পাওয়া যাবে না। তাঁরা যেতে অভ্যস্তও হন না। তাঁদের ধাত্রী মা'র সঙ্গেই তাঁদের রাগ, খুশী, আবদার, অভিমান।

যখন মহারাজ অন্দরে আসেন শিশুদের দেখতে চান বা বাধাধরা সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় হয় তখন দুধালী মায়েরা কুমার কুমারীদের খাইয়ে দাইয়ে, চুল আঁচড়ে রেশমে মখমলে গয়নগাঁটিতে সজ্জিত করে রাজা মহারাজের সামনে উপস্থাপিত করেন। তিনি তাঁদের কাছে ডেকে চিবুক ধরে কথা বলেন, কখনো চুমু খান, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁদের সখ আহ্লাদ সম্পর্কে জানতে চান। পিতৃস্নেহে উদ্দীপ্ত হয়ে যে যতটা প্রকাশক্ষম হন প্রত্যুত্তরে ততটাই নিজেদের মেলে ধরেন। সাক্ষাতের সময় চলে গেলে দুধালী মায়েরা তাঁদের অন্দরমহলে নিয়ে যান।

এমনি এক দুধালী মায়ের কাছে বড়ো হন কুমুদিনী, আমার ঠাকুরমা বীরচন্দ্র মাণিক্যের মেয়ে। তাঁর দুধালী মা মারা যান তাঁর সেবা-যত্নে। কুমুদিনীর নাতিনাতনীরা তাঁকে ডাকতেন বম্মা (বড়মা) বলে।

কেমন করে কেটেছিল রাজকুমারীর তাঁর বাল্য কাল? কোন ত্রুটি ছিল না শিক্ষাদীক্ষায়। একটু বড়ো হতেই মেম গভর্ণেস এসে গেলেন। তাঁর কাছে ইংরাজী, এমব্রয়ডারী উল বোনা ক্রসেট, নানা শিক্ষায় শিক্ষিতা হলেন। তেমনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে বাংলা-

সংস্কৃত, আপন মেসোমশাই বুদ্ধিমন্ত সিংহের কাছে শিখতেন নৃত্যকলা। সেইসঙ্গে রাজ অন্দরের ত্রিপুরা সেবাইত বা অন্য পরিচারিকার কাছ থেকে নিয়েছেন বস্ত্র বয়ন শিক্ষা। গামছা টাওয়াল ওঁরা নিজের হাতে বুনেছেন, বুনেছেন রিয়া।

স্বয়ং মহারাণীও কোমর তাঁতে বুনতেন রেশমের সুতোয়, রূপার সুতোয়, সোনার সূতোয় ধাবমান হাতী, ঘোড়া, উড়ন্ত পাখী, অপূর্ব সব ফুল-লতাপাতার বাহারী নক্সায় বক্ষ বন্ধনী রিয়া রিগনাই। তখন কুমারীরা পাশে বসে দেখেছেন, শিখেছেন কিভাবে সুতোয় হিসেব রাখতে হয়, বুনতে হয় এগুলো। কুমুদিনীও শিখেছেন মানির (মহারাণী মা) কাছ থেকে। মহারাণী মনোমোহিনী দেবী খুব ভালো বয়নকার্য জানতেন। তাঁর সময়ে অন্দরে রাণী মহারাণীরা রিয়া রিগনাই পরেই থাকতেন। এগুলো অধিকাংশ তাঁরাই বুনতেন।

এরপর রয়েছে কীর্তন পাঠ। পুষ্পসজ্জার নানা শৈল্পিক অলঙ্করণ। কানে পরার 'নাচম' খোঁপার মালা ফুলের পাথা। মনোমোহিনী দেবী খুব ভালো এমব্রয়ডারী কাজও জানতেন। যার একটি নমুনা রয়েছে আমার কাছে। কালো মখমলে হলুদ সুতোয় ছোট ছোট নাগেশ্বর ফুলের ডিজাইন। এদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ছিল কোন ভাষা মুখ্যত ককবরক এবং মণিপুরী ভাষা।

মনোমোহিনীদেবী খুব সুন্দরী ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব ত্বকের লাবণ্য আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁর সম্পর্কিত নাতিরা তাঁকে ঠাট্টা করে বলতো— নানা, তোমার শরীরটা এত নরম সুন্দর যে মনে হয় খেয়ে ফেললেও খুব স্বাদের হবে।

বীরচন্দ্রের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য তাঁর প্রায় পিতাকন্যার মত ছিল। তবু অসামান্য বোঝাপড়া ছিল তাদের। তাঁর প্রতিটি ইচ্ছায়, কাজে তিনি সার্থক সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি সম্পূর্ণ যৌবন বয়সে স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধনে প্রাণ দিয়েছিলেন। স্বামী জিয়ানের মৃত্যুর পর কবছর কম্বলে প্রথমে ফল, এরপর শুধু জল খেয়ে পূজার তুলসী মুখে দিয়ে খালি মেঝেতে শুয়ে তিনি নিজের দেহকে শেষ করে দিয়েছিলেন। বীরচন্দ্র কিশোর মাণিক্যের কুমারী কমলপ্রভা দেবী বলেছেন অন্দরে তাঁকে জেটাঈশ্বী বলে সম্বোধন করা হতো। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি মাথার চুলে আর চিরুনী ছোঁয়ান নি। সমস্ত মাথা জটে ভরে গিয়েছিল। তিনি কারো কাছ থেকে কোন সেবা নিতেন না।

অন্তঃপুরের দিনলিপি

বীরচন্দ্রের আমলে ত্রিপুরা রাজ্য যেমন আধুনিক যুগে প্রবেশ করলো তেমনি তাঁর আমলেই ত্রিপুরা রাজ্যে বৈষ্ণব ভাবধারা, বৈষ্ণবীয় চিন্তা চেতনার জোয়ার এসে গেল। দোল হোলী কীর্তন পূজা-অর্চনা খুব লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং বীরচন্দ্র খালি গায়ে ধুতি পরে গলায় ঢোল বেঁধে কখনো করতাল বাজিয়ে নেচে গেয়ে কীর্তনের আসর মাত করে দিতেন। আসনে বসনে-ভূষণে বৈষ্ণবীয় ভক্তির জীবন্ত প্রতিভূ হয়ে তিনি

সমস্ত অন্তঃপুরিকাদেরও নিজের সহগামিনী করে তুলেছেন। তেমনি হারমোনিয়াম বাজিয়ে বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীতাদিও তিন চর্চা করতেন। সেসময়ে অন্দরমহলে পূজাপাঠ, রাসের নাচের মহড়া, ফলের গয়না, ফুলের পানা, কানে ফুলের নাচম তৈরী করা জীবনযাত্রার অঙ্গ ছিল।

মনোমোহিনীর গর্ভজাত দ্বিতীয় কন্যা ছিলেন আমার ঠাকুরমা কুমুদিনী দেবী। তাঁর কাছে শুনেছি বড়ো মেয়েরা অন্দরের বাইরে গিয়ে নাচ শিখতেন না বলে ছোট ছোট কুমারীরা বাইরে নাচ শিখে এসে এদের শেখাতেন। তিনি রাসে কৃষ্ণ সেজে নাচতেন। আবার হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতও করতেন। তাঁর কণ্ঠে শুনেছি 'ও চাঁপা ও করবী' বা 'পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'। ছেলে সমরেন্দ্রচন্দ্রও খুব ভালো ফটোগ্রাফী জানতেন। সাহিত্যে তাঁর গভীর প্রীতি ছিল। তিনি বেশ কয়েকটি বই লিখে গেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো 'ভারতীয় স্মৃতি' ও 'ত্রিপুরার স্মৃতি'। বীরচন্দ্র সন্তান সন্ততিদের মধ্যে একটি গুণ সঞ্চার করে দিতে পেরেছিলেন। সেটি হচ্ছে সাহিত্য পাঠ ও সৃষ্টির পিপাসা। অনঙ্গমোহিনী দেবী এক প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত কবি ছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের মহিলা কবি' পুস্তকে তাঁর নাম আছে। কিন্তু তাঁর অন্যান্য পুত্র কন্যাদেরও বাংলার চমৎকার দখল ছিল এবং অনেকে সুন্দর কবিতা লিখতেন। মনোমোহিনী দেবীর গর্ভজাত মৃণালিনী দেবীর কবিতা *রবি* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কুমুদিনী দেবীও কবিতা লিখতেন। মৃণালিনী দেবীর বৈদগ্ধ্য পাণ্ডিত্য এবং বাগ ভঙ্গিমা তাঁর চিঠিপত্রে ধারালো হাতের লেখা ছিল, যাকে বলে মুক্তা সদৃশ্য। সবারই প্রায় এক ধাঁচের হস্তাক্ষর ছিল

মাত্র আট বছরে বিয়ে হয় কুমুদিনীর ও পাঁচ বছরের মৃণালিনীর, একই দিনে। খাটের বদলে রূপোর থালায় বসিয়ে তাদের বরকে প্রদক্ষিণ করানো হয়েছিল। অন্দরমহল থেকে কোন ফাঁকে পালিয়ে গিয়ে একছুটে বহির্মহলে দুটি বরকেই দেখে এসেছিলেন মৃণালিনী। এসে দিদিকে বললেন, - - 'বাইরে বাই তোর জামাইটা বেশ সুন্দর, আমারটা বাঁদরের মতো।' কুমুদিনী বোনকে ভর্ৎসনা করালেন - - ছিঃ এরকম কথা বলতে নেই। বিরাট বড়ো থালায় বসিয়ে পাঁচ বছরের মৃণালিনীকে যখন তাঁর থেকে আট বছরের বড়ো রাধামোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হৃদয় রঞ্জনের হাতে সম্প্রদান করা হলো ততক্ষণে ঘুমে ঢুলু ঢুলু বোন মৃণালিনীর। খাঁটি রূপার তৈরী জরির হুতেম ভারী শাড়ী আর জমকালো ব্লাউজ পরে আপাদমস্তক সালঙ্কারা রাজকুমারী কুমুদিনী মালা দিলেন রাধামোহনের দ্বিতীয় পুত্র রেবতী মোহনের গলায়। গয়নাগাটি তৈজসপত্র কেমন পেলেন। এক কথায় অনবদ্য। সোনা, পান্না, হীরা চুনী মরকতে ছয়লাপ এবং উল্লেখযোগ্য যেগুলো শুধু মূল্যের দিক থেকে নয় রুচি এবং ডিজাইনের দিক থেকেও অমূল্য। কুমুদিনীর গয়নার মধ্যে সেরকমই উল্লেখযোগ্য একটি ভারী সোনার চেন ও ভাল সাইজের ডালা দেয়া সোনার লকেট। একদিকে আট বছরের কুমুদিনী অন্যদিকে ১৬ বছরের রেবতীমোহনের ফটো। অন্দরে ক্ষুদ্র কিন্তু রঙীন আর এই রঙ করেছেন বীরচন্দ্র নিজে। রেবতীমোহনের মাথায় গোলাপী পাগড়ী, ঈষৎ হলুদ রঙের আচকান, কুমুদিনীর সিঁথের লাল সিঁদুর, কপালে লাল টিপ, শাড়ীখানার রঙীন

উজ্জ্বলতা। কিভাবে এই মিনিয়েচার ছবিতে তিনি এটা সম্ভব করেছিলেন তা বিস্ময়কর।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপহার— দুটি মোহরের ছড়াহার মহারাজ বীরচন্দ্র ও মনোমোহিনীর নামাঙ্কিত স্বর্ণ মোহরের নাভিকুম্ভ পর্যন্ত প্রলম্বিত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে পুত্র কন্যার মধ্যে সেই ব্যবধানের কথা। ব্রজনিধির বিয়ে হয়েছে সোনার থালায় বসে দেড় বছরের মেয়ে কমলা, কামিনী সিং মন্ত্রীর বোনের সঙ্গে।

এই ছোট ছোট গৌরীদানের রাজকুমারীরা কিন্তু সঙ্গে শ্বশুরঘরে যান না। রজঃস্বলা হবার পর যৌবন উদ্‌গমে তাঁদের স্বামী গৃহে পাঠান হয়। এর আগ পর্যন্ত এরা পিতৃগৃহেই থাকেন। এভাবেই কুমুদিনী গিয়েছেন পিতা বীরচন্দ্রের সঙ্গে কার্শিয়াং। রবীন্দ্রনাথের নিজের গলায় গান শুনেছেন যা তাঁর মতে একেবারে মেয়েদের মত, সরু গলা। জুতো মোজা ভারী মখমলের ফ্রক পরা কার্শিয়াঙের ছবিতে তাঁকে দশ-এগারো বছরের মনে হয়।

এভাবেই বঙ্গোপসাগরে গিয়েছেন বীরচন্দ্র যখন ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারে লোক লস্কর পাইক-পেয়াদা পরিবার পরিজন সহ জাহাজ ভাড়া করে প্রায় মাসখানেক ঘুরেছেন।

বীরচন্দ্র তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সব কুমারীদের বিয়ে দিয়ে যেতে পারেন নি। তাদের বিয়ে দিয়েছেন রাধাকিশোর মাণিক্য। তিনি খুবই সহৃদয় ভ্রাতা-ভগ্নী বৎসল এবং তাদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁর দেয়া ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ামটি কুমুদিনীর মৃত্যুর পর আমার কাছেই ছিল। ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় এখানে ওখানে ঘুরে থাকার ফলে এটি ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। এখন মনে হয় একটু যত্ন নিলে সাবধান হলে এটিকে স্মারক চিহ্ন হিসাবে রক্ষা করা যেতো।

আজ দু'হাজার সালে সংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি সংরক্ষণে দিকে দিকে প্রয়াস চলেছে। অসাধারণ পুরাতাত্ত্বিক স্মৃতিসৌধের ভাণ্ডার রয়েছে আমাদের দেশে। রয়েছে বিশেষ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত সংরক্ষণ যোগ্য কত অমূল্য বস্তু। এগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সচেতন করাও আমাদের ঐতিহ্যের গর্ব।

রাজ অন্তঃপুরের রূপছটা

রাজার অন্দরে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী রাণী-মহারাণী-কুমারীদের ছড়াছড়ি। রাজ অন্দরে কেমন ছিল তাঁদের রূপছটার বিষয়? লেখাপড়া, গান-বাজনা নাচের অভ্যাসের মত সৌন্দর্যচ্ছটাও ছিল একটা বিশেষ দৈনন্দিন অঙ্গ।

আমরা আজ হাল ফ্যাশানের উইমেন্স ম্যাগাজিনে পড়ি Hundred strokes a day। চুলের যত্নের জন্য অবশ্য পালনীয় এই শতবার আঁচড়ানোর ব্যাপারটা তাদের কাছেও ছিল তারা চুল ধুতেন কলাগাছ পোড়ানো ক্ষার জল দিয়ে। খুব জোরে জোরে শক্ত চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ানো হত। চাল ধোয়া জল, সাম্‌বেরমা (একরকমের গোল গোল ভারী খসখসে পাতা) পাতা সেদ্ধ জল দিয়ে মাথা ধোয়া হতো ভাল ঘন চুল পাবার জন্য। বীরচন্দ্র মাণিক্যের

অন্দরমহলে ভাল খাঁটি নারকেল তেলের ব্যবহার ছিল বেশী প্রিয়। ডালবাটা, হলুদ বাটা, সর এগুলো তারা সৌন্দর্যচর্চায় ব্যবহার করতেন। তাদের খাদ্য তালিকায় ইরোম্বা গুদক ইত্যাদির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে সবুজ নানা ধরণের সব পাতা — এনাম, ধনে, পুদিনা, আসিলা ইত্যাদি কুচি কুচি করে স্যালাডের মত খাওয়া হত। টক ফল সেদ্ধ, স্যুপজাতীয় সিঁদলের ঝোল এবং অন্যান্য ফল তাদের চামড়া রঙ এবং উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘস্থায়ী এবং সটান করে তুলতো।

তবে বীরচন্দ্রের আমলে অন্দরমহলের রান্নায় মুরগীর ডিম, মাংসের প্রবেশ ছিল না। কুমুদিনী শ্বশুর বাড়ি আসার আগে মুরগী কোনদিন দেখেন নি। এই নতুন পাখি দেখে তিনি অন্যদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা কি? ছয় বছরের কুমুদিনী অন্দরমহলের ফোকর থেকে রাজ অঙ্গনে দেখেছিলেন বন্দী করে নিয়ে আনা উলঙ্গ কুকিদের। ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন এদের দেখে।

অন্তঃপুর সংস্কৃতির দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শিক্ষার প্রচার প্রসার, রাধাকিশোরের কাল (১৮৯৬-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ)

বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাধাকিশোর। তাঁর যুগেও অন্দরমহলে শক্তিশালী ছিল মণিপুরী সংস্কৃতি। রাধাকিশোর মাণিক্যের অপরূপ সুন্দরী মহারাণী রত্নমঞ্জরী মণিপুরের রাজবংশীয় রাজা দেবেন্দ্র সিং-এর কন্যা ছিলেন এবং এঁরা ঢাকায় থাকতেন বলে রত্নমঞ্জরীকে 'ঢাকা লেইমা' বা ঢাকা ঈশ্বরী বলা হতো। রত্ন মঞ্জরী সঙ্গীত নৃত্যে অত্যন্ত পটিয়সী ছিলেন, খুব ভালো খোলও বাজাতে পারতেন। রাস নৃত্য এবং অন্যান্য নৃত্যকে তিনি অত্যন্ত আলঙ্কারিকভাবে আভিজাত্য ও শিল্পসুষমা দিয়ে রাজ অন্তঃপুরে চালু করলেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে স্থলে এলো সারল্যের স্থলে সূক্ষ্মতা।

রাধাকিশোরের আরেক রাণী মহারাণী তুলসীবতী, যাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে — খুব সাধারণ দরিদ্র ঘরের মেয়ে হয়েও তিনি ত্রিপুরার অন্তঃপুরে প্রাথমিকভাবে এবং সমস্ত ত্রিপুরায় ব্যাপকভাবে নারী শিক্ষার গৌরবময় সূত্রপাত করলেন। তাঁরই চেষ্টায় প্রথমে রাজ অন্তঃপুরে পরে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির দীঘির পূর্ব পারে এবং পরে বর্তমান স্থানে তুলসীবতী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। বনমালী পণ্ডিত, ভুবন পণ্ডিত, সরোজিনী চৌধুরী — এঁদের শিক্ষকতায় প্রথম স্কুল শুরু হয়। তুলসীবতী স্কুলের দেয়ালে চির ভাস্বর ছবি হয়ে রয়ে গেছেন তুলসীবতী — এক অপূর্ব ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রতিকৃতি — নাকে নোলক, কানে ঢেড়ি ঝুমকা, জরির কাজ করা মখমলের ব্লাউজ, গলায় সাতনরী হার-কাঁধে জরির পাল সাদা ফি (চাদর) পরনে জরির ফানেক।

সেদিনকার সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যশাসিত ছোট্ট ত্রিপুরায় মেয়েদের মধ্যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল না। কঠিন পর্দা প্রথা, নানা সংস্কার, বাল্য বিবাহের

যন্ত্রণা — এরই মধ্যে এক ঝলক তাজা বাতাস বইয়ে দিলেন তুলসীবতী।

সোনামুক্তা হীরা পান্না পরে বিলাসে আনন্দে থাকার মানসিকতা ছিল না তুলসীবতীর। তাঁর ভেতরের সংবেদনশীল অন্তর এবং উচ্চ চিন্তাধারা ভবিষ্যতকালের মেয়েদের চিন্তা চেতনার বন্ধন মুক্তির প্রয়াসে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তালুকের আয় থেকে স্কুলের খরচ পত্র চালাতেন। সমাজের নানা চাপে আড়ষ্ট মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেন কোন পাঠ-দক্ষিণা না দিতে হয় সেটা ভেবে তিনি বেতন রদ করে দেন।

স্কুলের মেয়েদের জন্যও বই সার্টিফিকেট না দিয়ে দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিষ পত্র, পিতলের কলসী, ঘটি, বাটি, ট্রাঙ্ক দিতেন। পিতৃগৃহে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দের কথা হয় তো তাঁর মনে পড়ত।

শুধু শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কাজেও তুলসীবতী আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ত্রিপুরায় মেয়েদের চিকিৎসার জন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালে দশটি বিছানার ব্যবস্থা করেছিলেন। নূতন হাভেলীর আগরতলার বাজারে এসে দূরবর্তী অঞ্চলের সাধারণ প্রজাদের বাজারের অসুবিধার কথা ভেবে মহারাজকে বলে শহর থেকে দূরে একটি বাজারের পত্তন করেন। সেটিই আজ রাণীরবাজার। লোকে শুধু জানেন না কে এই রাণী।

তুলসীবতী সাক্ষর না নিরক্ষর এ নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। হতে পারে তিনি আক্ষরিক অর্থে সাক্ষর ছিলেন না। কিন্তু বুদ্ধি এবং প্রতিভার বিচারে তিনি কোনমতেই অশিক্ষিতা ছিলেন না। যথেষ্ট সংস্কৃতিমনস্কা এবং সাহিত্যিক জ্ঞানে তিনি যে অনন্যা ছিলেন তার প্রমাণ পাই আমরা তাঁরই রচিত হোলীর গানে — "ঘেরি ঘেরি সখীসবে, পুলকে মাতিল যবে / আবির কুম্‌কুম্ কস্তুরী দিতেছে শ্যামের অঙ্গে / লালে লাল হল তনু আকুলিত রাই কানু / চূড়া কুন্ডল হেলে বাজে মোহন বাঁশীরে / হেরি অপরূপ রাই কানুরূপ / তুলসীবতী যেন রাংগাপদ হেবরে।"

একশো বছর আগে তুলসীবতীর মূল্যবান প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আজ সারা ভারতে যেখানে নারী সাক্ষরতার হার মাত্র ৩৯.৪২ শতাংশ সেখানে ত্রিপুরায় তা ৪৯.৬৫ শতাংশ। প্রাথমিক এবং অবৈতনিক স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের এই আদর্শ আজ ত্রিপুরার গর্ব এবং মূল্যবান ঐতিহ্য। রাধাকিশোর মাণিক্যেরও কিছু কাছুয়া পত্নী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য, তিনি কামিনী সিংহ মন্ত্রীর বোন ফৈরবী দেবী। অসামান্য দৃঢ়তা ব্যক্তিত্ব এবং রাজ অন্তঃপুরে তাঁর প্রভাব লক্ষ্যণীয় ছিল। আমার ঠাকুরমা ও তাঁর বোনেদের তাঁকে বাঈ ফৈরবী বলে ডাকতে দেখেছি।

সঙ্গীত-চিত্রকলা-শিল্পের মণি-কাঞ্চন যুগ — বীরেন্দ্রকিশোর (১৯০৯-১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ)

রাধাকিশোর এবং তাঁর সুযোগ্য পত্নীরা রেখে গেছেন ঐতিহ্যের সম্পদ। কৃষ্ণ কিশোর

মাণিক্যের প্রাসাদ ভেঙে গেল ভূমিকম্পে (১৮৯৭, ১২ই জুন) রাধাকিশোর আবার গড়ে নিলেন শিল্প সৌন্দর্য সমন্বিত রাজপ্রাসাদ — যার নাম হলো উজ্জয়ন্ত (১৮৯৯-এ ভিত স্থাপন, সমাপ্ত ১৯০১)। বীরচন্দ্র সিংহাসনে বসার আগে বেশীরভাগ কবি গেছেন পুরানো আগরতলার রাজবাড়িতে। তিনি রাজা হওয়ার পর (১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ) রাজপ্রাসাদে ছিল বহুমূল্য গালিচা-পাতা, ফরাসের উপর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, কোথাও বিরাট সোনার থালায় অপূর্ব কারুকাজ করা, ছাদ থেকে ঝুলছে ঝাড় লণ্ঠন, কোন ঘরে দুর্মূল্য টেলিস্কোপ, বিভিন্ন ক্যামেরা। ভূমিকম্পের ফলে সে প্রাসাদ ভেঙে গেল। পুত্র রাধাকিশোব নূতন প্রাসাদ, হাসপাতাল, কারমাইকেল ব্রিজ গড়লেন। সব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ সেদিনকার সময়ে ১২ লাখ টাকা খরচ করে আধ বর্গ মাইল এবং ১৪৯৪ একর জমির উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

সে প্রাসাদ বার্মাটিক কাঠের বিশাল কাজ করা দরজায় চীনের কাবিগরের শিল্প স্মৃতি পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে, প্রথম গোল হলঘরে উপরের ডোরের নিচে বিরাট পিতলেব কমণ্ডলু, চারপাশের দেয়ালেব খাঁজে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে সাজান হলো বীরেন্দ্রকিশোরেব ছবি — সন্ন্যাসী, ঝুলন। ঝাড় লণ্ঠন, বর্ম, বিভিন্ন অস্ত্র ভারতীয় যন্ত্রের অপূর্ব সংগ্রহশালায় ভরে তোলা হল উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ।

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের পাট মহারাণী ছিলেন প্রভাবতী দেবী, যাকে সবাই বড মহারানী বলতো। এটা শুধু মুখের কথা নয়, তাঁর চরিত্রে যে বিশাল জ্ঞান, ঔদার্য, পরিবার পরিজন এবং অন্তঃপুরের বাইবের জনসাধারণের প্রতি অপাব স্নেহ ভালবাসা ছিল তা বর্ণনাতীত।

বহু দবিদ্র কন্যাদের নিজ খবচে তিনি বিয়ে দিয়েছেন। যেমন তেমন বিয়ে নয়, অলঙ্কার তৈজসপত্রে জাঁকজমকে সেসব বিয়ে নিতান্ত দায়সারা ব্যাপার ছিলনা। প্রভাবতী দেবীই আগরতলায় (গোলবাজারে) শিববাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নেপালেব বাণাবংশের বিখ্যাত কন্যা ছিলেন বাল্যকালে মৃত্যুযোগ থাকায় তাঁকে একজন বড় বাঙালী সিভিল সার্জনের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করায় তিনি সে যুগের কলকাতাতেই বড় হয়েছিলেন। সেজন্য খুব চমৎকার বাংলা বলতে পারতেন। তাঁর বিয়ের সময় রাণা এসে বর্তমান হকার্স কর্ণারে খোশমহল কিনে সেখানে বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যান। কারণ পরের জমিতে বিয়ে দেয়া তাঁদের ঐতিহ্যে ছিল না। আবার ব্যবহার লোক লৌকিকতা কর্তব্য পালন এবং জনসংযোগে প্রভাবতী দেবীর স্থান আজো অদ্বিতীয়। তিনি সাধারণ ঠাকুর লোকদের বাড়িতেও বিয়ের নিমন্ত্রণে যেতেন। কিছু খেতেন না, গয়না, শাড়ী ও প্রচুর মিষ্টি উপহার নিয়ে যেতেন। তাঁকে পড়াতেন তুলসীবতী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা চারুবালা দত্ত। তাঁর একটি ছেলে এবং মেয়ে অকালে মারা যায়। তিনি সপত্নী রাণী মহারাণী এবং কাছুয়া রাণীদের সমস্ত সন্তানদের নিজ জ্ঞানে স্নেহ করতেন। মহারাজা বীরবিক্রম তাঁর সঙ্গে প্রতিদিন দেখা করে প্রণাম করে যেতেন। তাঁকে বীরবিক্রম 'দুদুমণি', 'প্রাণমণি' বলে

ডাকতেন। এবং বাবা রাজা এলে তাঁর জন্য ব্যতিব্যস্ত মাতা উপযুক্ত বৈঠক দিয়ে তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা দিতেন।

প্রভাবতী দেবী নিজেও রোজ সোনার কৌটোয় জল নিয়ে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করিয়ে তা নিজে এবং অন্যান্য মহারাণীদেরও পান করাতেন। বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের ছিল ছয়জন রাণী এবং বাইশ জন কাছুয়া পত্নী।

কিন্তু বড় মহারাণীই সমস্ত অন্তঃপুর আকাশে ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়া। রাজার পদাঙ্কে মহারাণী নিদ্রা যেতেন। বীরবিক্রমের মা অরুন্ধতী দেবীর আর দুটি কন্যা ছিল বাসন্তী এবং বিভাস। চতুর্থ মহারাণীও ছিলেন নেপালী। তাঁর পুত্র কন্যারা কুমার দুর্জয়, সুকুমার এবং কুমারী কমলপ্রভা দেবী। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ রাণী চিনিয়া ও নেপালী সম্প্রদায়ের। পঞ্চম মহারাণীর কন্যারা ইলা এবং বীণা এবং ষষ্ঠ মহারাণীর কন্যা ষোড়শী।

বীরেন্দ্রকিশোরের অন্তঃপুর নেপালী বংশতির যুগ

এ সময়ে অন্তঃপুরের নাটক, থিয়েটারের বাইরেও যাত্রা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। খাবার ব্যবস্থা সেই চিরন্তন পিতলের বেড়ীর ওপর রূপার থালায়। বসতেন সৃজনীতে। কিন্তু খাদ্য বস্তুর রুচির মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসে গেল। নববট, দোল দূর্গা হার নিয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাস হৈচৈ — বিশেষভাবে বড় মহারাণীর নাচের দলের সঙ্গে বীরবিক্রমের নাচের মহড়া নিয়ে পরবর্তী কালে জোরদার প্রতিযোগিতা হতো।

বীরেন্দ্রকিশোর যতদিন ছিলেন তিনিও নাটক থিয়েটারের ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতাই শুধু নয় স্বয়ং এতে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন। উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের উত্তরেব সিঁড়িতে ষ্টেজ বানিয়ে নাটক হতো। অবশ্য তাতে বাইরের কুলীনরা অভিনয় করতেন।

নির্বাক সিনেমাও দেখানো হতো উজ্জয়ন্ত অঙ্গনে। অন্তঃপুরে কুমারীরা নিজেরা অভিনয় করতেন বিভিন্ন নাটকে।

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের প্রতিভা তাঁর পুত্র কন্যাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে খুব সার্থকভাবে। এজন্য আমরা পাই সঙ্গীতজ্ঞ হেমন্ত কর্তা, কবি চারু কুমারী এবং বিচিত্র প্রতিভার আধার কুমারী কমলপ্রভা দেবীকে। কমলপ্রভা ছিলেন সঙ্গীতে, চিত্রাঙ্কনে, নৃত্যকলায়, অভিনয়ে অনবদ্য। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপাব, যে আজ যে বাঁশ নির্মিত শিল্পদ্রব্যের জন্য ত্রিপুরা ভারতে এমনকি বর্হিভারতেও প্রশংসিত তাঁর আদি জননী কমল প্রভা। এক দালান থেকে আরেক দালানে যাবার সময় আনাদবে পড়ে থাকা বাঁশের টুকরো দেখে তাঁর মাথায় এই শিল্পের আদর্শ ঝলসে ওঠে। তাঁর ছবির মাধ্যম জল রঙ, তেল রঙ। বিষয়বস্তু নিসর্গ, পোর্ট্রেট থেকে আদিগন্ত। এক কথায় তাঁর প্রতিভা, সৌন্দর্য, গুণাবলী ব্যাখ্যা করা যাবে না। তিনি একজন সাহিত্যিকও। তাঁর কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'খেলাঘর' নামক আত্মজীবনীমূলক রচনাটি গুণীজনের প্রশংসা পেয়েছে। সঙ্গীত রচনা

এবং সেগুলোতে তিনি সুরারোপও করেছেন।

সাধারণত অন্তঃপুর মানেই ঝগড়াঝাটি-রেষারেষি-মুখ ভার করা। অন্দরের অন্তঃস্থলে যাই হোক-পরিশীলিত-এবং সযত্নে চর্চিত সংস্কৃতিতে এবং ছোট বড়ো সম্মানের স্তর বিন্যাসকে প্রথম থেকেই সুস্থ মনে মেনে নেয়ার ফলে রাজ অন্দরমহলে শান্তি সহযোগিতা শৃঙ্খলা বিরাজ করতো।

বড় মহারাণীর অন্দরে কার্পেট বিছানো থাকতো। সন্ধ্যাবেলায় সবাই একসঙ্গে বসে আলাপসালাপ গান ইত্যাদি গাওয়া হতো। বড় মহারাণী প্রভাবতী দেবী নাকি কবিতা লিখতেন, পড়াশোনা করতেন। অন্দরমহলের প্রবেশ দ্বারেই দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাণী। এ পূজা এখনো হয় এবং বাইরে থেকে মহিলারা যান।

রাজবাড়িতে অসুখ বিসুখ

বীরবিক্রমের মা অরুন্ধতী দেবী যক্ষ্মায় মারা যান। তাঁকে দেখতে এসেছিলেন ডঃ বিধান রায়, নীলরতন সরকার। এসে 'আত্মদর্শন' নাটকে অনিল দাশগুপ্তের পিতার দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কাছে থেকেদেখতে চেয়েছিলেন — জীবন্ত মানুষ চলছে ফিরছে, এত হাড়গোড় সর্বস্ব হন কি করে?

বীরবিক্রমের বোন বসন্তকুমারীও যক্ষ্মায় ভোগেন। তাঁকে সুইজ্যারল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সঙ্গে গিয়েছিলেন তদানীন্তন ভি.এম. হাসপাতালের সরকারী চিকিৎসক ডঃ নিরঞ্জন দেববর্মণ এবং ফৈরবী দেবী। ৫/৬ মাসের বাচ্চা ভ্রমদাকে মা মধ্যম মহারাণীর কাছে রেখে মারা যান। শোনা যায় বীরবিক্রমের আরেক বোন বিভাস কুমারীরও মাথায় টিউমার হয়েছিল। প্রভাবতী দেবীরও এক ছেলে এক মেয়ে অকালেই মারা যায়। সেসময় হাসপাতাল থেকে যে ডাক্তাররা যেতেন তাঁদের একজন মুসলমান একজন খ্রীষ্টান ছিলেন। এছাড়া যেতেন সুরেন্দ্র কবিরাজ।

শিক্ষা সংস্কৃতি-গঠনমূলক যুগের প্রতিভূ বীরবিক্রমের যুগ

বীরবিক্রম ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত নম্র স্বভাবের, বিলাসী এবং কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। বারকয়েক বিদেশে ভ্রমণের ফলস্বরূপ তাঁর চরিত্রে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী আসে।

এর মূলে বিমাতা প্রভাবতী দেবীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। তাঁর সঙ্গে বীরবিক্রমের সবসময় নিকট এবং সুসম্পর্ক ছিল। রাস নৃত্য উপলক্ষ্যে দুজনের নাচের দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতো। এতে নিমন্ত্রিত হতেন বিশিষ্ট মহিলারা। ঘোড়ার জুড়ি গাড়ি করে কুমুদিনী, মৃণালিনী (বীরচন্দ্রের কন্যারা) এবং অন্যান্য বিশিষ্ট মহিলারা এই প্রতিযোগিতায় যেতেন এবং জুরীর ভূমিকা পালন করতেন।

তাঁর প্রথমা পত্নী সঙ্গে নিয়ে আসেন বিশাল এবং বিচিত্র সম্পদ অজস্র সোনা দানা মণি মুক্তা, রূপোর খাট। তাঁর বিয়েতে এক হাজার বরযাত্রী এখান থেকে যান। সেসব গল্প এখনো চলে আসছে মুখে মুখে। তিনি দীর্ঘজীবী হন নি। বিয়ের এক বছর পরেই মারা যান। টাকা ছড়াতে ছড়াতে তাঁকে সসম্মানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শ্মশানে।

এরপর তিনি বিয়ে করলেন মধ্যপ্রদেশের পান্না রাজ্যের রাজকন্যা কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে। তিনি খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্না এবং নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে থাকতেন। তাঁর আরো পত্নীরা ছিলেন নন্দরাণী, বিজয় মোহিনী, পুণ্যলতা এবং মাধবী দেবী। নন্দরানীর সন্তান নক্ষত্র এবং ভানুকর্তা, বিজয় মোহিনীর কন্যা বীণা কুমারী এবং মাধবী দেবীর পুত্র সহদেব বিক্রম কিশোর কর্তা।

এই সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা এবং নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত হলেও এরই মধ্যে অন্দরমহলে যথেষ্ট সংস্কৃতির চর্চা হয়েছে। দুর্গোৎসব ইত্যাদি ঘিরে অলঙ্করণে কুমার কুমারীরা শৈল্পিক কাজকর্ম করেছেন। এসময়েই নীরমহল তৈরী হয়েছে। প্রমোদ ভবনে আনন্দোৎসবে অংশ নিয়েছেন সবাই।

রাজার রান্নাঘর — আবদারখানা

রাজার খাওয়া বলে কথা। বর্তমান গ্যাসকো গ্যাস অফিসের উল্টোদিকে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের বিপরীতে আবদারখানায় প্রতিদিন হতো নানা দেশী এবং বিদেশী রান্না।

এছাড়া অন্দরমহলে কাছুয়া রানীরা স্নান করে কেজিখানেক খাসা চালের ভাত, নির্বাচিত আমীষ, সিঁদল গুদক, পিটাখী সিঞ্জু ভাজা, চাটনী, শাকসব্জী রাঁধতেন। আবদার খানা থেকে চপ কাটলেট অন্যান্য সাহেবী রান্না তো আসতোই। ঠাকুরবাড়ি থেকে আসতো ভোরের প্রসাদ। সকালে লুচি, হালুয়া, মিষ্টি, পাউরুটি (নিজের মেসিনে আঁটা ভাঙিয়ে)। রাত্রি নটা দশটায় লুচি -তরকারী।

সব কিছু কি রাজা খেতেন ? কখনোই নয়। ছোটবেলায় আমিএকদিন ঠাকুরমার সঙ্গে অন্দরে গিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছলাম খাবার টেবিলের পাশে। বিরাট শ্বেত পাথরের টেবিলের মাঝখানে সাজানো ভাতের চারপাশে অজস্র বাটিতে বিচিত্র সব ব্যঞ্জন। সবাই হাঁ-হাঁ করে বললেন, এখানে নয়, এখানে নয়, ওদিকে যাও। এই খাবারের উদ্বৃত্ত অংশই ভাগ হতো ভিতরের মহলে।

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কালে কালে

বীরচন্দ্রের আমলে ছাদে লাগানো আংটা থেকে নেটের মশারী ঢেকে দিত সমস্ত শয়নঘরের চৌহদ্দি। গ্রীষ্মকালে ভূমিশয্যায় রাজারাণী শয়ন করতেন মেঝেতে। সেই বিরাট

মশারীর নিচে সেবাইতরা বিরাট তালপাতার পাখায় ব্যজন করতেন রাজারানীকে।

তাঁদের সজ্জার উপাদান ছিল চন্দন, পচাপাতা, আতর, ফুল। অবশ্য দামী পাউডার এসেন্স ও ভেষজদ্রব্যেও হতো তাঁদের রূপচর্চা। পরবর্তী যুগে সৌন্দযচর্চার উপাদান — চুলে ডিম দেয়া, ডিমের কুসুম, মধু মুখে মাখা, পচাপাতা সেদ্ধ করে সামবেরমা দিয়ে চুল ধোয়া হতো। আতপ চালের জল ব্যবহৃত হতো। বাটির মধ্যে সর নিয়ে মিহি কাপড়ে মুখে ঘষা হতো।

বীরবিক্রম নানা কারণেই হতশ্বাস হয়ে মর্ম বেদনায় ভুগতেন। সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ সৈন্যবাহিনী উচ্ছৃঙ্খলা নিয়ে এলো। সে সময়টায় আধুনিক জীবনের ছোঁয়া লাগলো। বৈদ্যুতিকআলো ছিল, বরফ বানানো হতো ড্রিংকসের জন্য। পাখা ছিল না। বড় মহারাণীর ঘরে হিটার ছিল। কিন্তু তালপাতার পাখা তখনো চলতো।

সম্বোধন — ব্যবহার রীতি

রাজবাড়িতে সম্মানিতা রানী মহারাণীদের 'মাই দেবতা' (মহাদেবীর অপভ্রংশ) অথবা ধারার (ঠাকরাণীর অপভ্রংশ) কুমার কুমারীদের কর্তা, কুমারী বলে সম্বোধন করা হয়। পান জল, খাবার ইত্যাদি দিয়ে মাথা নুইয়ে সম্মান জানান হয়। নমস্কার জানালেও মাথা নুইয়ে 'হালাম' (সেলামের অর্থে) করছি পিপি (পিসিমা) কাকী ইত্যাদি বলা হয়। বড়রা ঘরে এলে ছোটরা চেয়ার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান।

ত্রিপুরার শেষ মহারাজ কিরীটবিক্রম

রাজবাড়ির গাড়িতে মেম গভর্নেসের সঙ্গে আমাদের বাড়ির গেটে আসতেন বালক কিরীটবিক্রম। সঙ্গে কোনদিন একজন বা দু'জন বোন থাকতেন। বাবা তখন সরকারী ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী, আর্থিক বিষয়ে কথা বলতে আসতেন গভর্নেস।

সৌম্য সুন্দর অবয়ব প্রফুল্ল দেহকান্তির সেই রাজপুত্র ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র এবং নম্র। দু-একটা কথা বলতে না বলতেই মেম সাহেবের কাজ শেষ হয়ে যেত। এঁরা বাইরে বাইরেই থেকেছেন বেশী। গোয়ালিয়রের রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়েতে জাঁকজমক হয়েছিল বহু। এই বোধহয় প্রথম কোন রাজপুত্র এবং পুত্রবধূ প্রকাশ্যে মিছিল করে বাজনা বাজিয়ে রাজপথ সচকিত শোভিত করে শোভাযাত্রা করেছিলেনা। সেই প্রথমা মহারাণীর মৃত্যুর পর কিরীটবিক্রম আবার বিয়ে করেছেন খয়রাগড় রাজকুমারী বিভূদেবীকে। তিনি শিক্ষা দীক্ষায় বুদ্ধিমত্তায় সপ্রতিভতায় আপামর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তিনিই প্রথম মহারানী যিনি ত্রিপুরার রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পীঠভূমি লোকসভায় গিয়ে সদস্যা হলেন।

রাজন্য যুগের অবসান

রাজন্য যুগের অবসানে খুব স্বাভাবিকভাবেই একে একে নিভে গেল দেউটি। বৃদ্ধারাণী মহারাণীদের মৃত্যুর পর অন্যেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলেন স্থানে স্থানে। ঘাসপাতা বাড়লো বিরাট অঙ্গনে, মলিন হয়ে গেল রাজকীয় প্রাসাদ। কলহাসি, নুপুর নিক্কণ নাচ গানের মহড়া আতর এসেন্স পচাপাতার গন্ধ সবই স্বপ্ন মাত্র। শুধু রয়ে গেছে কিছু রাজবংশীয় কর্তা ব্যক্তিগণ আর কিছু বিশ্বাসী কর্তব্যপরায়ণ সেবাইত লোকজন, তাঁদের বংশধর।

তথ্যসূত্র ঃ

১) ঠাকুর পার্বীন্দ্র দেববর্মণ (৯৯ বৎসব), উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের প্রাক্তন কর্মচারী।
২) শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী (বয়স ৮৬ বৎসর), নাজির ঃ হেমেন্দ্র দেববর্মাব কন্যা, কৃষ্ণনগর।
৩) কুমাবী ইবা দেবী, কৃষ্ণনগব।

ত্রিপুরীদের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যমূল্য

পৃথিবীতে রান্নার যে তিনরকম পদ্ধতি আছে — সিদ্ধ করা (Boiling), ঝলসানো (Roasting) ও ভাজা (Frying)। তার মধ্যে সিদ্ধ করা বা ঝলসানোকে স্বাস্থ্যসম্মত ও গ্রহণযোগ্য বলে সমস্ত পৃথিবীতে বিবেচনা করা হয়েছে। অধিক মশলার ব্যবহার বা অতিরিক্ত ভাজা খাদ্যের স্বাদ বাড়ালেও তার খাদ্যমূল্য নষ্ট করে দেয় বলে বহু দেশে এবং বহু জাতির মধ্যেই এ পদ্ধতি অনুসৃত হয় না।

সমস্ত ইউরোপীয় দেশেই বেশীর ভাগ খাদ্যই সেদ্ধ করে বা ঝলসিয়ে খাওয়া হয়। মশলার ব্যবহার তাদের মধ্যে খুবই কম। ফলত তাদের পেটের গোলযোগ বা আন্ত্রিক গন্ডগোল কম হয়।

অন্যদিকে আমাদের দেশে কম বেশী সর্বত্রই মশলার ব্যবহার বেশী। খাদ্যদ্রব্যকে তেলে-মশলায় ভাজা-ভাজা করে সুস্বাদু করে গ্রহণ করার রীতি প্রায় সর্বভারতীয়। তার মধ্যে বাংলাদেশের রন্ধন প্রণালী আরো তেল-মশলায় যুক্ত। খাদ্য বিজ্ঞানের নিদর্শন অনুযায়ী দেখা যায় যে এতে খাদ্যগুণ প্রায়ই রক্ষিত হয় না।

ত্রিপুরায় এখন মিশ্র রন্ধনরীতি চলেছে। অর্থাৎ আদিবাসী ত্রিপুরীদের বিশেষ রন্ধনরীতি অ-আদিবাসীদের মধ্যেও কিছু কিছু গৃহীত হয়েছে এবং অ-আদিবাসীদের রন্ধনরীতিও কিছু কিছু আদিবাসীদের মধ্যে চালু হয়েছে।
এই মিশ্রণের ব্যাপারটা আজ পার্বত্য ত্রিপুরার অভ্যন্তরে আদিবাসী সামাজিক ক্রিয়া বা উৎসবাদিতে লক্ষ্য করা যায়।

মূলত ত্রিপুরীদের রন্ধনরীতির মধ্যে সিদ্ধ ও ঝলসানো পদ্ধতিই প্রধান। খাদ্যদ্রব্যকে ভেজে গ্রহণ করার রীতি খুব কম।
আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তাদের খাদ্য প্রস্তুত করার রীতি বেশ স্বাস্থ্যসম্মত ও সরল এবং প্রস্তুত খাদ্যও যথেষ্ট সুস্বাদু।

প্রথমেই ধরা যাক শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের বিষয়। ত্রিপুরীরা সাধারণত, সকলেই আতপ চাউল ব্যবহার করেন। পাহাড়ে মাটির হাঁড়িতে জলসহ চাউল আগুনে বসানো হয়। নির্দিষ্ট জলে ভাত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠলে তা নামানো হয়।

ফেন ফেলার রীতি তাদের মধ্যে নেই। ঘরের ঢেঁকিতে ছাঁটা চাউল সফেন গ্রহণের এই রীতিটি খুবই স্বাস্থ্যসম্মত।

ভাপে সিদ্ধ বিন্নী চাউল ত্রিপুরীদের আরেকটি প্রিয় খাদ্য। লাল বা সাদা খোসা যুক্ত তৈলাক্ত এই চাউলের খাদ্যমূল্য যথেষ্ট। এই চাউল রান্নার একটি বিশিষ্ট রীতি রয়েছে। উনুনের উপর জলপূর্ণ হাঁড়ির উপরে আরেকটি বহুছিদ্রযুক্ত হাঁড়িতে চাউলগুলি রাখা হয়। নিচের হাঁড়ির উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প আঠালো চাউলগুলিকে আলাদা আলাদা রেখে সুসিদ্ধ করে তোলে।

এই চাউলকেই আরেকটি পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। লাইরু নামক একটি বিশিষ্ট পাতায় পানের খিলির মত ঠোঙ্গা করে আগের দিন রাত্রের ভেজানো বিন্নী চাউলকে আদা, নুন ও ঘি বা তেল মেখে এই বড় আকারের ভার মুখটা বেতের সরু সরু টুকরা দিয়ে খুব আঁট করে বেঁধে দেয়া হয়। তারপর ছিদ্রযুক্ত হাঁড়িতে রেখে ভাপে অথবা সিদ্ধ করে বড় একটি হাঁড়িতে জল দিয়ে এগুলো সেদ্ধ করা হয়। মুখ ঢেকে সেদ্ধ হয়ে গেলে পাতার ঠোঙ্গা খুলে নিলেও এই আঠালো চাউলের আকৃতি cone বা শঙ্কু আকৃতিই থেকে যায়। একে ভাঙ্গুই বলে।

সপাতা ভাঙ্গুইকে কখনো উনুনের আগুনে ফেলে পুড়িয়ে নেয়া হয়। এতে উপরের পাতাগুলি পুড়ে যায় এবং ভাঙ্গুইয়ের উপরের গাগুলি লাল, শক্ত ও সুস্বাদু হয়। কখনো বা ভাঙ্গুইকে কড়াইয়ে তেলে বা ঘিয়ে ভেজে নেয়া হয়। এই শেযোক্ত পদ্ধতিটি সাধারণত শহরের ত্রিপুরীরাই করে থাকেন। লাইরু পাতার অভাবে শহরের ত্রিপুরীরা কলাপাতাতেও ভাঙ্গুই তৈরী করেন।

পাহাড়ে ভাতের গোল গোল বল তৈরী করে গনগনে উনুনে পুড়িয়ে ছোট বাচ্চাদের খেতে দেখা যায়। একে মাইদুল বলে। পাহাড়ে বা শহরে ত্রিপুরীরা সাধারণত ডাল খুব কম ব্যবহার করেন। ডালের মধ্যে মুসুরী ডালই বেশী ব্যবহৃত হয়। অন্য ডাল তাদের প্রিয় নয়। তবে ডাল দিয়ে ক্ষার ত্রিপুরীদের সবচেয়ে প্রিয়। পাহাড়ে ক্ষার বা সোডা সাধারণত তৈরী করা হয় ছাই চোঁয়ানো জল থেকে। Cone বা শঙ্কু আকৃতি বাঁশের তৈরী ঝুড়িতে, যাকে ত্রিপুরী ভাষায় বলা হয় চেখাকক্, ছাই রেখে উপর থেকে আস্তে আস্তে জল দেয়া হয়। এই জলধারা ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে নিচে রাখা পাত্রে পড়ে। একে বলা হয় চাখ্তুই বা ক্ষার জল। এই ক্ষার জল অসমীয়ারাও খান।

ডাল যখন সেদ্ধ হয়ে আসে তখন এতে নানা তরিতরকারী যেমন পেঁপে, বাঁশের কড়ুল, কাঁঠালের বীচি, শক্ত ডাঁটা ইত্যাদি দেওয়া হয়। পরে সোডা বা ক্ষার জল দিয়ে সবগুলো খুব সুন্দর সুসিদ্ধ হয়ে যায়। তখন এতে নুন, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, আদা, গোল মরিচ, কিছু ঘি বা তেল দিয়ে নামানো হয়। অনেকে এতে আবার লেবুর পাতা দিয়েও সুগন্ধ করে নেন।

পাহাড়ে এই চাখ্‌তুই-এর মধ্যে কলা গাছের ভিতরের খুব নরম অংশগুলো টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়। সঙ্গে কখনও আলুও দেয়া হয়। শহরের ত্রিপুরীরা চাখ্‌তুই-এর বদলে বেকিং পাউডার আন্দাজ মত ব্যবহার করেন। মাছ, মাংস ইত্যাদি যুক্ত গুরু ভোজনে এই ক্ষার জল হজমে খুব সহায়তা করে।

পাহাড়ে অবশ্য এ ধরণের জলের ক্ষার খুব কমই খাওয়া হয়। তবে চাখ্‌তুই বা জল দিয়ে কখনো মাংশ বা অন্য কোন তরকারী দিয়ে চাখুই রান্না হয়।

ডালের পরই অন্য তরিতরকারীর মধ্যে যেগুলো ত্রিপুরীরা বেশী খান তার মধ্যে ঘোদক প্রধান। ঋতু ভেদে বিভিন্ন তরিতরকারী দিয়ে এ তরকারী রান্না হয়। রান্না বলতে যদিও সবটা প্রক্রিয়াই শুধু সেদ্ধর ব্যাপার, তবে এতে খুব আন্দাজ জ্ঞানের প্রয়োজন। মাপ মত জল এবং সেদ্ধ করার সময় জ্ঞানের উপর তরকারীর স্বাদ নির্ভরশীল।

উচ্ছে, ডাঁটা, কচি সজনে, বরবটি, বাঁশ কড়ুল, শিম, মূলো, মোচা ইত্যাদি যে কোন তরকারী দিয়ে গুদক করা যায়। শহরের ত্রিপুরীরা এসব তরকারীর সঙ্গে অবশ্যই আলু ব্যবহার করেন। পাহাড়ে আলুর তেমন প্রচলন নেই।

কখনও দুটি তরকারী মিশিয়েও এটা করা যায়। যেমন বরবটি, মূলো, আলু, বাঁশ কড়ুল, বরবটি, অথবা ডাঁটা, কাঁঠালের বীচি, আলু ইত্যাদি। তরকারী আন্দাজ মত সিদল, কাঁচা লঙ্কা, পিঁয়াজ কুচি দিয়ে সিদ্ধ করে মেখে নিতে হয়। গুদক খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি মশলা এবং তেলের অভাবে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। পাহাড়ে আরেক ভাবেও গুদক করা হয়। কাঁচা বরাক বাঁশের গাঁটওয়ালা টুকরোর (ত্রিপুরী ভাষায় বলে ওয়াসং) মধ্যেও মাছ, সিদল, তরকারী, লঙ্কা, নুন, পিঁয়াজ দিয়ে মুখটা শক্ত করে কলাপাতা ইত্যাদিতে বন্ধ করে আগুনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। বাঁশের গা ঠলে আন্দাজ মত সময়ের পর বার করে ভিতরের তরকারী ইত্যাদি একত্রে মেলে নেয়া হয়।

বহিরাগত বাঙ্গালী সমাজেও আজ স্বাদের জন্য বহু পরিবারে গুদক আদরণীয় হয়েছে। বেশী সেদ্ধ হয়ে গেলে বা জল বেশী হয়ে গেলে ঘোদকের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে রন্ধনে সতর্কতা প্রয়োজন। মুখে ঢেকে রান্নার ফলে এতে ভিটামিনও ভালোভাবে থেকে যায়।

ঘোদকের পর সিদলের ঝোল ত্রিপুরীদের আর একটি প্রিয় খাদ্য। এতেও ঋতু ভেদে বিভিন্ন তরিতরকারী ব্যবহৃত হয়। তবে এতে তরকারীর পরিমাণ থাকে খুব অল্প। এ তরকারীতেও বেগুন, সীম, ডাঁটা, কড়ুল, ঢেঁড়স, উচ্ছে ব্যবহৃত হয়। এ তরকারীও মূলতঃ সেদ্ধই তবে এতে জলটা ঝোল হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে এর পরিমাণ একটু বেশী থাকে। ঘোদকে এভাবে জল দেয়া হয় যাতে তরকারী মেখে নিলে আর আলাদা কোন ঝোল থাকে না।

সিদলের ঝোলে প্রথমে পাত্রে আন্দাজ মত মাছ সিদল, কাঁচা লঙ্কা বা শুকনা লঙ্কা খুব মিহি করে বাটা পিঁয়াজ ও নুন দিয়ে ফুটতে দেয়া হয়। তারপর লম্বা লম্বা করে কাটা তরকারীগুলো ফুটন্ত ঝোলে দিয়ে মুখ ঢেকে দেয়া হয়। একটু শক্ত থাকতেই নামিয়ে রসুন

বাটা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। ফলে গরম জলীয় বাষ্পের তাপে তরকারী নরম হয়ে যায়।

এ তরকারীতে যে কোন মাছ ব্যবহার করা যায়। এ তরাকারীও খেতে খুব সুস্বাদু। এটি খুব গরম পরিবেশন করা হয়। শাকপাতা দিওে এ ঝোল রান্না করা হয়।

পাহাড়ে অন্যান্য তরকারীর অভাবে বাঁশ কড়ুল ঘোদক বা সিদল ঝোলে বেশী ব্যবহৃত হয়।

বাঁশ কড়ুলের খাদ্যমূল্য বৈজ্ঞানিকভাবে কতটুকু তা জানা নেই তবে স্বাদের জন্য বাঁশ কড়ুল বা bamboo shoot সমস্ত পৃথিবীতে আদরণীয়। সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রিয় চাইনিজ ডিশে বাঁশ কড়ুলের পর্যাপ্ত ব্যবহার দেখা যায়।

মনে হয় সঠিকভাবে বিশ্লেষিত হলে কড়ুলের খাদ্যমূল্য যে খুব উচ্চমানের তা প্রকাশিত হবে। আরেকটি তরকারীও ত্রিপুরীদের প্রিয় খাদ্য, একে বলা হয় পিঠালী। প্রস্তুত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সিদলের ঝোলের মতোই তবে এতে নামানোর আগে আতপ চাল মিহি করে বেটে জল দিয়ে গুলে দেয়া হয়। ফলে ঝোলটা থকথকে হয়ে যায়। পরে রসুন দেয়া হয়।

বাঁশ কড়ুল, আস্ত কাঁচা অড়হর, মূলো, পুষ্ট বরবটি, ইঁচড় ইত্যাদি শক্ত জাতের তরকারী দিয়ে পিঠালী করা হয়।

তরিতরকারীর পরে আসে মাছ, মাংস এবং ডিম। পার্বত্য ত্রিপুরায় অধিকাংশ স্থানেই নদী নালার অভাবে মাছ দুষ্প্রাপ্য। তবে যেখানেই নদী, ছড়া ইত্যাদি আছে সেখানে বা নিচু ক্ষেতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

মাছের ঝোল বা ঝাল হলুদ, লঙ্কাবাটা, পিঁয়াজ দিয়ে গতানুগতিক ভাবেই রান্না হয়। তবে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হচ্ছে, কখনো সম্ভারের তেল মশলা ও ফোড়নের মধ্যে সিদল আন্দাজ মতো দিয়ে ভাজা ভাজা করে পরে মাছ ও পর্যায়ক্রমে জল দেয়া হয়। যে সব মাছের স্বাদ স্বাভাবিকভাবে একটু কম তাকেই এভাবে রান্না করা হয়।

যখন মাছ বেশী পাওয়া যায় তখন উনুনের উপর বাঁশের ঝুলানো মাচাতে ধোঁয়ার মধ্যে মাছগুলি শুকিয়ে নেয়া হয়। বাজারের সাধারণ শুঁটকী মাছের চাইতে এগুলো সুন্দর ধোঁয়াটে গন্ধের হয়, এতে দুর্গন্ধ থাকে না। পরে প্রয়োজন মতো এগুলো তরকারী দিয়ে বা ছাড়া রান্না করে নেয়া হয়। কখনো উনুনের আগুনে পুড়িয়ে পিঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা সহযোগে খাওয়া হয়।

মাছের বিশেষ সংরক্ষিত রূপই হচ্ছে শুঁটকী এবং সিদল। শুঁটকী, সিদল বেশী খায় বলে ত্রিপুরীদের দুর্নাম আছে। তাঁর সিদল শুঁটকী খেতে বাধ্য হন কারণ ত্রিপুরায় নদী নালার অভাবে মাছের যোগান কম। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে যে এর যোগান আসে ত্রিপুরার বাইরে থেকে। সিদল প্রস্তুতের প্রক্রিয়াও এদের অজানা।

একটু আলোচনা করলেই দেখা যায় যে সমুদ্র, বড়ো নদী এবং বড়ো খাল বিলের আশে পাশের অধিবাসীরা পৃথিবীর সর্বত্রই তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত মাছকে বিশেষ প্রক্রিয়ায়

সংরক্ষণ করে থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে শুঁটকী মাছ বা Dry fish- এর খাদ্য মূল্য অর্থাৎ প্রোটীন ইত্যাদি নষ্ট হয় না। কাজেই তা মোটেই অপকারী নয়।

অপকারী হচ্ছে রন্ধন প্রক্রিয়া কিভাবে আমরা খাদ্যটিকে গ্রহণ করি তার উপরই নির্ভর করে খাদ্যটির বিশেষ মূল্য। বাংলাদেশের শুঁটকী বা সিদলকে তেল-লঙ্কা পিঁয়াজ-জরজর করে ভীষণ দুষ্পাচ্য করে গ্রহণ করার রীতিটি নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। এতে পেটে অম্লের সঞ্চার হয়ে রোগ বাধায়।

পক্ষান্তরে পুড়িয়ে বা সেদ্ধ করে খেলে এগুলো এত ক্ষতিকর নয়। প্রত্যহ খেলে এতে কোন অনিষ্ট হয় না। একটা বিশেষ মাত্রায় প্রোটিন পাওয়া যায়। শুধুমাত্র মাছের অভাবেই যে ত্রিপুরীরা সিদল শুঁটকী খান এটাও ঠিক নয়। শুকনো মাছের যে একটা বিশিষ্ট স্বাদ আছে তা অনস্বীকার্য, ফলে যাঁরাই খেতে শেখেন তারাই এতে আসক্ত হয়ে পড়েন দেখা যায়।

এবার ত্রিপুরীদের সিদল শুঁটকী রন্ধনের বিশেষ প্রক্রিয়ার আলোচনা করা যাক। খুবই সহজ কিন্তু খুবই প্রিয় প্রক্রিয়া হচ্ছে সিদল বা শুঁটকী ভর্তা। এতে সিদল মাছ, কাঁচালঙ্কা পুড়িয়ে মেখে নেয়া হয়। পাহাড়ে এই মাখার জন্য একটি বিশেষ পাত্র ও কাঠের ছোট মুগুর থাকে। হাত না দিয়ে সেই ছোট মুগুরের সাহায্যে সবগুলি জিনিষকে একত্র করে মিহিভাবে ঘুটে নেয়া হয়। কখনো বা শিলেও বেটে নেয়া হয়। এইভাবে বেটে নেয়ার ফলে লঙ্কার বীচি বা খোসা নরম অন্ত্রের ঝিল্লীতে আটকে গিয়ে কখনো প্রদাহের সৃষ্টি করে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার এই ভর্তা এঁরা ভাতের সঙ্গে চাটনীবৎ ব্যবহার করেন।

শুধু সিদল, লঙ্কা এবং অল্প মাছ দিয়েও ঝোল তৈরী হয়, তাকে পাহাড়ে বেরমা বুতুই বলে। উৎসব বাড়ীতে প্রচুর মাংস খেয়ে মুখ ফিরে গেলে এই ঝাল ঝোল পরিবেশন করা হয়। তারপর আবার মাংস পরিবেশিত হয়। কখনো বা এই সিদলের ঝোলে ক্ষার জল দেয়া হয়। এই ক্ষারে তরকারী থাকতেও পারে অথবা এটা শুধু সিদল আর ক্ষারের ঝোলও হতে পারে। ত্রিপুরীদের মধ্যে পশ্চিম বাংলার অঞ্চল বিশেষের মতো গুগলী খাওয়ারও যথেষ্ট প্রচলন আছে। গুগলী দিয়ে সাধারণত পিঠালী রান্না হয়।

মাছ সিদলের পরে আসে মাংসের কথা। ত্রিপুরীরা মূলত মাংসাশী। যদিও ত্রিপুরীদের মধ্যে একটা বিরাট সংখ্যক নিরামিষাশী বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছেন তবু এঁদের ছাড়া আর সবাই প্রচুর মাংস খান। মুরগী, কচ্ছপ, পাঁঠা, শুয়োর, হরিণ ও নানা প্রকার পাখীর মাংস এঁদের প্রিয় খাদ্য।

মাংস রান্নার যে তিন প্রক্রিয়া আছে-সেদ্ধ, ঝলসানো এবং ভাজা-তার সবগুলিই ত্রিপুরীদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে থাকে।

কাঁচা বাঁশের চোঙায় (এক গাঁট থেকে অন্য গাঁট নিয়ে) পিঁয়াজ, হলুদ, লবণ, লঙ্কা, মাংস ও জল দিয়ে আগুনের ভেতর চোঙটাকে দিয়ে সেদ্ধ করা হয়।

কচ্ছপ, মুরগী এগুলো প্রচলিত নিয়মে মশলা তেল সহযোগে রান্না হয়। তবে হরিণ বা

শুয়োরের মাংসের রন্ধন প্রক্রিয়া বিভিন্ন আছে, যেমন শুয়োরের তেল সহ মাংসের টুকরা বেছে নিয়ে আন্দাজ মত জলে নুন সহ সেদ্ধ করে পরে কুচি কুচি করে কেটে আদা, পিঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে মেখে খাওয়া হয়। এটি খেতে খুবই সুস্বাদু।

হরিণ বা শুয়োরের মাংস নুন মাখিয়ে আঁচে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। পরে এগুলোকে ছেঁচে নিয়ে রান্না করা যায়। অথবা আবার গনগনে আগুনে পুড়ে ভর্তা করা হয়।

অতিরিক্ত তৈলাক্ত মাংস দিয়ে পাহাড়ে চাখুই রাঁধার পদ্ধতিও দেখা যায় শুয়োরের তেল গলিয়ে ভাজা বা রান্নার জন্যও সংরক্ষিত করা হয়।

ত্রিপুরীদের মধ্যে দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রতি বিশেষ রুচি দেখা যায় না। পাহাড়ে সাধারণত কোন গাইয়ের দুধ দোয়ানো হয় না। তবে অনেকেই মহিষের বা গাইয়ের দুধ ব্যবহার করেন। এরা খুবই সংখ্যালঘু।

দুগ্ধের প্রতি অনীহার ফলে দই, ছানা, মাখন, ঘিয়ের প্রচলন খুবই কম। তবে শহরের ত্রিপুরীরা ঘি, মাঘন, ব্যবহার করেন। পায়েস ইত্যাদিরও অল্পস্বল্প প্রচলন আছে।

জাতিগতভাবে ত্রিপুবীদের মিষ্টি জিনিষের চাইতে নোন্‌তা, ঝাল এবং আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে। আগরতলায় ত্রিপুরী সমাজে উৎসবাদিতে পোলাও মাংসের চল বহু কাল থেকে। হাল আমলে ত্রিপুরীদের মধ্যে মিষ্টি বা দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যের আধিক্য দেখা যাচ্ছে।

ত্রিপুরীদের মধ্যে যে সব পিঠার প্রচলন দেখা যায় তা প্রায়ই নোন্‌তা। কের পূজার দিনে যে মাছ পিঠা ত্রিপুরীদের অবশ্য করণীয় ছিল তাও নোন্‌তা। প্রথমে চালের গুঁড়ি থেকে কাই করা হয়, তার পর সেটা দিয়ে পুলি পিঠার মত খোল তৈবী করে ভেতরে সেদ্ধ মাছ-মশলা দিয়ে পুর দিয়ে ভেজে নেয়া হয়। এই পিঠা সকলেরই খুব প্রিয়।

পাহাড়েও নূতন আমন ধান উঠলে তাকে ভিজিয়ে মিহি গুঁড়া করে অল্প জলে চটকে নিয়ে নুন যোগে কাঁচা বরাক বাঁশের ভিতরে দিয়ে আগুনে ঝলসানো হয়। পরে নরম কাঁচা বাঁশ কেটে এই লম্বা বাঁশের আকৃতির কেক্‌কে বার করে নিয়ে খাওয়া হয়।

তবে মিষ্টি পিঠা যে একেবারেই হয় না তা নয়। চাল ভিজিয়ে গুঁড়ি করে গুড় দিয়ে মেখে নিয়ে হাতের তেলোয় পিঠে গড়ে তেলে ভেজে নেযা হয়। খেতে এগুলো মালপোয়ার মত হয়। আগরতলা শহরের দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন বহুদিন থেকেই প্রচলিত।

রান্না করা জিনিসের পর আসে কাঁচা খাদ্যের কথা। জুমের বিভিন্ন ফল যেমন শশা, তরমুজ, ভুট্টা, চিন্দ্রা ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে কলা, আম, আনারস, পেঁপে, আখ, পেয়ারা ও অন্যান্য ফল ত্রিপুরীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করে থাকেন। একেকটি ত্রিপুরী শিশু পাহাড় অঞ্চলে যেভাবে কাঁচা ফল খায় তার পরিমাণ দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

শহরের ত্রিপুরীদের মধ্যেও আরেকটি স্বাস্থ্যকর কাঁচা খাদ্য গ্রহণের রীতি আছে। অবশ্য এই প্রথাটি ত্রিপুরীদের নিজস্ব নয়। মূলত এই খাদ্যরীতি মণিপুরীদের। তবু মণিপুরীদের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশিত্ব এবং আত্মীয়তার সূত্রে বহু যুগের পুরানো এই খাদ্যরীতি নিজস্ব না হয়েও ত্রিপুরীদের খাদ্যতালিকায় স্থায়ীভাবেই ঢুকে গেছে।

এর নাম হচ্ছে শিঞ্জু। অধিকাংশ কাঁচা তরকারী ও পাতা-যেমন কাঁচা পেঁপে, মূলো, বাঁধা কপির ভিতরের অংশ, বুটপাতা, মটর পাতা, ধনেপাতা, পিঁয়াজ পাতা, আচিলা পাতা, এনেম পাতা ইত্যাদি এবং অন্যান্য কোন কোন ভক্ষণযোগ্য গাছের কচি পাতা একত্রে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ভাবে কুচিয়ে নেয়া হয়। সঙ্গে থাকে মাছ, সিদল আর কাঁচা লঙ্কা পুড়ে মেখে নিয়ে পিঁয়াজ কুচি দিয়ে মাখা বেশ ঝাল ভর্তা। অতি সামান্য ভর্তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা পাতা নিয়ে মেখে ভাত খাওয়া হয়। এভাবে শহরের ত্রিপুরীদের খাদ্যরীতিতে পাহাড়ী পদ্ধতি, প্রতিবেশী বাঙালী পদ্ধতি, মণিপুরী পদ্ধতি ও রাজ আমলের মুসলমান মাংস-পোলাওয়ের পদ্ধতি মিশে গিয়ে এক অভিনব খাদ্য পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেছে। তাছাড়াও বৈবাহিক সূত্রে উড়িয়া, অসমীয়া বা হিন্দুস্থানী পদ্ধতির আমদানীতে ত্রিপুরী খাদ্যরীতি বৈচিত্র লাভ করেছে।

সেই রকমই পাহাড়েও আজকার দেখা যায় বিয়ে বা শ্রাদ্ধ উৎসবে বাঙালীদের মতো ডাল, ভাজা, তরকারী ইত্যাদি করতে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বহু বাঙালী পরিবারেও আজ ঘোদক, সিদল ঝোল বা শুয়োরের মাংসের প্রচলন ঘটেছে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখতে পাই যে খাদ্যের উপাদান অনুযায়ী খাদ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ১। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ২। স্নেহ জাতীয় খাদ্য ৩। প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য ৪। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ৫। লবণ জাতীয় খাদ্য ৬। জল বা জল জাতীয় খাদ্য। তার সব কয়টি ভাগেই খাদ্যমূল্য বজায় রয়ে গেছে।

১। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের জন্য চাউল, নানারকম কচু, আলু, ফল ত্রিপুরীরা খেয়ে থাকেন। সফেন ভাত, কাঁচা কাঠ আলু ইত্যাদি ফল ও কচু থেকে এরা সঠিক খাদ্যমূল্য সহ খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন।

২। স্নেহ জাতীয় খাদ্যের জন্য শুয়োরের চর্বি, নানাপ্রকার কাঁচা বাদাম, কাঁচা নারিকেল এঁরা খান। শুয়োরের তেল সংরক্ষিত করে প্রত্যেক পরিবারে পিঠে ভাজাও রান্না করা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জগৎ বিখ্যাত চাইনিজ ডিশও শুয়োরের চর্বিতে রান্না হয় বলেই এত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয়ে সকলের কাছে গৃহীত হয়েছে।

৩। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের জন্য ত্রিপুরীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে মাংস, ডিম, শুঁটকী, বাদাম ইত্যাদি খান। প্রায় প্রত্যেকেই মুরগী, ছাগল, শুয়োর, হাঁস পালেন বলে মাংস, ডিম এদের পক্ষে নিত্য ভক্ষ্য হতে পারে। বেশী প্রোটীনজাত খাদ্য গ্রহনেও যথেষ্ট পরিশ্রমে এঁদের শরীর সুগঠিত ও শক্ত।

৪। ভিটামিনের জন্য এরা যেসব কাঁচা ফল ইত্যাদি খায় এগুলি আদর্শ স্থানীয় বলা যেতে পারে। এছাড়াও সমস্ত খাদ্য রীতিতেই রন্ধন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের জন্য পূর্ণ মাত্রায় ভিটামিন রক্ষিত হয়ে থাকে।

৫। লবণ জাতীয় খাদ্যের জন্য প্রচুর ছোট মাছ, ফল, টাটকা শাকসব্জি এঁরা গ্রহণ করে থাকেন।

৬। জলীয় জাতীয় খাদ্যের জন্য পানীয় জল, ফল ইত্যাদি ছাড়া এঁদের অধিকাংশই প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার থেকে প্রস্তুত মদ্য পান করেন।

অবশ্য বর্তমান ত্রিপুবাব কি শহরে কি পাহাড়ে নিদারুণ খাদ্যাভাবে পতিত ত্রিপুরীদের খাদ্যবস্তু নিয়ে বিচার করলে তাদের খাদ্যে আলোচ্য বস্তুগুলি সব থাকে বলা যাবে না। এবং এখন যা এঁরা খেয়ে থাকেন তাকেও কোনমতেই সুষম খাদ্য (Balanced Diet) বলা যাবে না। তবে স্মরণাতীত কাল থেকে জাতি হিসাবে ত্রিপুরীদের সাধারণ খাদ্যাভ্যাস ও তার সম্ভাব্য খাদ্যমূল্য নিয়েই এ আলোচনা সীমিত রাখা হলো।

দুর্গাপূজা ঃ স্মৃতিপটে সেকাল ও একাল

শুভ্র সুনীল আকাশে সোনামাখা রোদ্দুর -- দূর্বাদলের বুকে ভোরের শিশির শিউলির গন্ধে চারদিক ম ম। পলাতক কালো মেঘ কোথায় সরে গিয়ে পেঁজা তুলার মত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘকে আকাশে পাঠিয়ে দিয়েছে -- নদীর ধারে ধারে কাশবন, চারদিকে খুশীর ঝিলিক-- এই হলো শরতের চিরন্তন চিত্র। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় -- কখনো এমন প্যাচপ্যাচে বর্ষা নামে -- প্রবল বর্ষণ হয় -- এমনকি বন্যা এসেও বাড়িঘর মাঠ ভেসে যায়। মা বলেছিলেন শুনেছিলাম, একবার পূজাতেই আগরতলায় প্লাবন হলো--তখন আমরা ছোট। মা'র কোলে আমার ছোট ভাইটি, ঘরেও জল এসে গেছে; খাটের উপরে খাট রেখেও যখন সুবিধা হলো না তখন ঘরের সিলিঙে যে মাচার মত ছিল তাতে মই দিয়ে ওঠার কথা হলো -- তখনই নাকি মা'র কোল থেকে কাঁথা জড়ানো ভাই জলে টুপ করে পড়ে গিয়েছিল। অবশ্য চেঁচামেচি করে তখনই তাকে তোলা হয়েছে। কাজেই ভরা শবতেও ভরা বাদলের রূপ দেখা যেতো — এখনও যায়। সারা বছরের আশাভরা সঞ্চয়ে কেনা শাড়ী; জামা-প্যান্ট পবে ঠাকুব দেখা এবং নিজেকে দেখানো -- সমস্ত উদ্যোগে জলাঞ্জলি -- দুম করে একটানা বর্ষা নেমে যায়।

তবু শরৎ শরৎই। ভরা বর্ষায়ও স্মৃতির ঢাক বাজতে থাকে দূরাগত ধ্বনির মতো। আজ শারদ লগ্নে তেমন ঢাকের আওয়াজ শোনা যায় না। শোনা গেলেও তা মনকে মাতায় না। না, এটা যে আমাদের বয়েস হয়ে গেছে বলে তা নয়, আসলে সমস্ত ব্যাপারটিতেই যে উদগ্রীব প্রতীক্ষা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল তা আজ আর নেই বলে। তবু আনন্দময়ী আসেন, লজ্জা, হতাশা, কুশ্রীতাকে ঢেকে দিয়ে কয়েকদিনের জন্য আমরা পুলকিত হয়ে উঠি -- শরৎ এবং শারদোৎসবে সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে। মনে পড়ে পেছনে ফেলে আসা দিনগুলিকেও। দুর্গাপূজা শুধু একটি সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নয়, এর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক তাৎপর্য আরো গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। একে ঘিরে যা উৎসব তা প্রায় সমাজের সকল স্তরেই মানুষকে নানাভাবে স্পর্শ করে যায়, মুছে দেয় বিভাজন রেখা।

বাঙলাদেশে দূর্গাপূজা শুরু হয়েছিল ঠিক কবে সেটা বলা কঠিন। বস্তুত শিব এবং দুর্গা ছিলেন অনার্যদের পূজিত দেবতা -- পূজার কিছু আচার অনুষ্ঠান দেখে পন্ডিতরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন। দুর্গা ছিলেন শবর বা আদিম সমাজের দেবী। তারপর হিন্দু দেবতামন্ডলীতে

তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটলো -- তা রামায়ণ, মহাভারত বা দেবী মাহাত্ম্য থেকে জানা যায়। এ জন্য সব কৃতিত্ব কৃত্তিবাসের প্রাপ্য। তিনিই প্রথম ফলাও করে দেবীর রূপ বর্ণনা, মাহাত্ম্য এবং পূজার বিবরণ রামায়ণে লেখেন। বাল্মীকী রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণে দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ নেই। রামচন্দ্রের অযোধ্যাতে তথা সমস্ত উত্তরপ্রদেশে কোথাও দুর্গাপূজা নেই। যদিও অযোধ্যায় একমাস ধরে বিজয়োৎসব চলে--দশাননের কুশপুত্তলিকা দশমীর দিনে দাহ করা হয়।

পাঁচ শতকের আগে ঘটে-পটে দুর্গাপূজা হতো। মৃন্ময়ী দুর্গা প্রতিমা পূজার পিছনে রয়েছে কৃত্তিবাসের অবদান। পুরাণ অনুযায়ী রাজা সুরথই প্রথম বাংলাদেশে দুর্গাপূজা করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল বালিপুর (বর্তমানে বোলপুর)।

প্রতিমা নির্মাণ করে দশভূজার পূজা নাকি দিনাজপুরের রাজা গণেশ আরম্ভ করেন। আবার মতান্তরে বলা হয়--তাহেরপুরের রাজা কংস নাবাযণ ৮ (আট) লক্ষ টাকা খরচ করে দুর্গাপূজা করেন। নদীয়ার বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাঁকজমকে এই মহাপূজা করেন। মুসলমান রাজত্বকালে বিখ্যাত ধনীরা অর্থ সম্পদ গোপন করার জন্য খুব অল্প লোকেই দুর্গাপূজা করতেন। ইংরাজ রাজত্বে এ ধাবা পাল্টে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির জন্য উঠতি ধনী সম্প্রদায় জাঁকজমকে পূজা শুরু কবলেন।

বাঙলাদেশে দুর্গাপূজা সম্বন্ধে 'দর্পণ' ১২৩৬ সালেব ২রা কার্তিক লেখা হয়েছিল--"সমারোহ পূর্বক এই উৎসবকরণ অল্পকাল হইয়াছে এবং তাহা প্রায় কেবল বঙ্গদেশেই হইযা থাকে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ গভর্মেন্টের আমলে যাহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনাদের দেশাধিপতি সমক্ষে ধন সম্পত্তি দর্শাইতে পূর্বমত ভীত না হওয়াতে তদৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা বায করিতেছেন।"

বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার নানাভাবেই আদানপ্রদান ছিল। দুর্গাপূজা উৎসবও ত্রিপুরাতে সমসাময়িক কাল থেকেই চলে আসছে। প্রতিমা তৈরী করে দুর্গাপূজা সব কালেই ব্যয়বহুল ব্যাপার ছিল এবং এটা রাজা উজীর ধনী ব্যক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। ত্রিপুরার রাজ পরিবার শিল্প সংস্কৃতির জগতে গোড়া থেকেই সর্বভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সে জন্য দুর্গাপূজার জৌলুষ ত্রিপুরা রাজ পরিবারে আরো সৌন্দর্য সুষমায় প্রকাশ পেল। ধর্ম সম্বন্ধে এরা চিরকালই উদার। রাজমালায় আছে— "হরিহব দুর্গাপ্রতি দৃঢ় ভক্তি যার/ত্রিপুর বংশেতে জন্ম নিশ্চয়ই তাঁহার" (ত্রিলোচন খন্ড, ২৬ পৃঃ,) ত্রিলোচন যে সব ধর্মকার্য অনুষ্ঠান করতেন রাজমালায় তার বিবরণ রয়েছে "দুর্গোৎসব, দোলোৎসব, জলোৎসব চৈত্রে/মাঘমাসে সূর্য পূজা করিল পবিত্রে (ত্রিলোচন খন্ড--৩৩ পৃঃ)।

অমরমাণিক্য খন্ড রাজমালার তৃতীয় লহরে আছে--"দুর্গোৎসব চন্ডী মাঠে এক দ্বিজবর/ছাগমাংস লৈয়া যায় আপনাব ঘব"। তখন শুধু বলিই হত না, নরবলিও হতো। এক জায়গায় অমরমাণিক্য চিঠির উত্তরে লিখছেন, — যেসব লিখিছ তুমি এই

তত্ত্বসার/দুর্গোৎসব নিকট হইল আইস পুনর্বার/তোমার যুদ্ধেতে পাইলে মগ ধরি আন/ভবানী পূজাতে তাকে দিব বলিদান"।।

রাজপরিবার প্রথমে ছিলেন শৈব, পরে হন বৈষ্ণব। তবু শিব ও শক্তির প্রতি তাদের চিরদিন সমান শ্রদ্ধা ছিল। দ্বার বঙ্গাধীশ্বর রামেশ্বর সিংহের প্রশ্নের উত্তরে রাধাকিশোর মাণিক্য বলেন "আমার কূল দেবতা চতুর্দশ দেবতার মধ্যে শক্তি, শৈব, বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা আছে--এদের অর্চনায় ছাগাদি বলি হয়--সিংহাসন পূজাতেও পাঁঠাবলি হয়।পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত শিব শক্তি ও বিষ্ণু বিগ্রহ আছে--এদের অর্চনা ত্রিপুরা রাজধর্ম মধ্যে পরিগণিত--তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি বৈষ্ণব। দ্বার বঙ্গাধীশ্বর বলেন, বড় প্রীত হলাম এটা সার্বভৌম সম্রাটের যোগ্য।

আগেই বলেছি শৈবধর্ম ত্রিপুরায় আদিধর্ম। এখানে বৈদিক ধর্ম প্রচারিত হয়নি। পৌরাণিক ব্রাহ্মণেরা কিরাতদের শৈব বলতেন। প্রাচীন ত্রিপুরা রাজাগণ যে শৈব ছিলেন রাজমালায় তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। শৈবধর্মের পর আগমোক্ত শাক্তধর্ম ত্রিপুরায় প্রচারিত হয়। কামরূপে তান্ত্রিকদের আড্ডা ছিল। কৈলাস সিংহের রাজমালার দ্বিতীয় খন্ডে বলা হয়েছে যে বৌদ্ধধর্মের প্রবল উন্নতির যুগে ব্রাহ্মণেরা আর্যাবর্ত্য ছেড়ে দুর্গম অনার্যভূমিতে সরে আসে। তিনি আরো বলেন যে, চট্টগ্রামের শিব এবং ত্রিপুরার ত্রিপুরাসুন্দরী খুব পুরনো না হলেও অমরপুর বিভাগের দেবতামুড়ায় উৎকীর্ণ দেবী ভগবতীর দশভুজা মহিষাসুর মর্দিনী মূর্তি অবশ্যই প্রাচীন। আর্যদের সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব ভাস্কর্যের বয়স দেড় হাজার বছরের কম নয়। কাজেই দেবীর সাধনা ও পূজা ত্রিপুরাতে বহুদিন থেকেই প্রচলিত রয়েছে। তবে সেটা খুব ব্যাপকভাবে ছিল না। দুর্গাপূজা যেমন তেমন করে করা চলতো না। এ পূজা করতে গেলে বহু নিয়মকানুন পবিত্রতা নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতো। কাজেই রাজবাড়ী বা ধনী পরিবার ছাড়া সাধারণ বাড়িতে দুর্গাপুজো হতো না। কুমার পুর্ণেন্দুকিশোর যাঁকে আগরতলায় আমরা ক্ষীরগোপাল কর্তা বলে বেশী জানি--তিনি বলেছেন যে তাদের বাড়িতে (বর্তমান আগরতলা উইমেন্স কলেজ) ১৯০৩ খ্রীঃ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত রীতিমত ঘটা করে প্রতিমা পূজা হয়েছে। আগরতলা শহরে প্রবীণদের দলে তিনি এখন পড়েন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে পুরানো দিনের খুব জীবন্ত চিত্র পাওয়া গেল।

বর্তমান আগরতলা শহর স্থাপনের আগে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল পুরান আগরতলায়। তখন পুরান হাবেলীতে রাজাদের পূজা হতো। নতুন হাবেলী বা আগরতলার প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকিশোরের আমল থেকে স্থানীয় দুর্গাবাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু হয়। বিশেষ করে জাঁকজমক শুরু হয় রাধাকিশোরমাণিক্যের কাল থেকে। মন্ডপ গৃহসজ্জা এবং প্রতিমার অলঙ্করণ তখন থেকেই লক্ষ্যণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

প্রত্যেকদিনই অসংখ্য পাঁঠা ছাগল বলি হতো। মহা অষ্টমীতে হতো মহিষ বলি। দুর্গা বাড়িতে পূজার সময় চন্ডী পাঠ করতেন অনন্ত ভট্টাচার্য মশাই। এরাই বংশাদিক্রমে

রাজ অন্তঃপুরে মঙ্গলচণ্ডী বিগ্রহের পূজাও করে আসছেন। বীরেন্দ্রকিশোরের বড় মহারাণী প্রভাবতী দেবীর মহলের সামনেই সেই মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির রয়েছে। অন্দরমহলে ঢুকতে গেলেই মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের সামনে দিয়ে ঢুকতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে অথবা মহারাণীরা অন্ততঃ পাঁচজন মিলে শোল মাছ বলি দিয়ে সেটা রান্না করে প্রসাদ নিতেন। মঙ্গলচণ্ডী পূজায় মহিষ বলিও হতো। আগে মন্দিরে সোনার ঘট ছিল--সেটাও চুরি হয়ে গেল। পরে রূপার ঘট হলো -- সেটাও চুরি হয়ে গেছে। দূর্গাপূজায় পুরোহিত ছিলেন বেণীমাধব ভট্টাচার্য, পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। মায়ের সামনে রূপোর থালায় আমিষ ভোগ হতো। মাছ মাংস পঞ্চ ব্যঞ্জন রান্না করে অন্ন ভোগের মাঝে ডিম দিয়ে সাজিয়ে দেয়া হতো। এই ভোগের থালার ক্রমবিন্যাসও খুব সুন্দর ও শৈল্পিক ছিল। যেমন সপ্তমীতে সাতটি, অষ্টমীতে আটটি, নবমীতে নয়টি এবং দশমীতে দশটি রূপোর থালায় ভোগ সাজানো হতো। রাজার নিজ তহবিল থেকে এসব বন্দোবস্ত করা হতো। কর্তাদের বাড়ির রাণী কুমারীরা এসে প্রতিমার অঙ্গসজ্জা এবং অন্যান্য পূজার দেখাশুনা করতেন।

দুর্গাবাড়ির প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দেবীর দশ হাত নয়--২ (দুই) হাত মাত্র। বাকি আটটি হাত পেছনে লুকানো আছে। এর পিছনেও একটি প্রচলিত গল্প রয়েছে--সেটি হচ্ছে ঃ একবার কোনও মহারাজা (নাম জানা যায় না) দেবীর দশভূজা মূর্তি দেখে হঠাৎ ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন, তিনি মায়ের এই দশপ্রহরণধারিণী মূর্তি সহ্য করতে না পেরে চোখ ঢেকে পালিয়ে যান। সেই থেকে ত্রিপুরার রাজকীয় দুর্গা পূজার মূর্তি পরিচিত সহাস্য কোমল মধুরা দ্বিভূজা মাতৃ মূর্তি যেন আমাদের ঘরের মা। কাঠামের পেছনে লুকানো আছে ছোট ছোট আকারের বাকি আটটি হাত নিয়ম রক্ষার জন্য, সেগুলো পরিদৃশ্যমান নয়। পুরান আগরতলায় কুমার সমরেন্দ্র চন্দ্র বা বড় ঠাকুর (বীরচন্দ্রমাণিক্যের পুত্র) আলাদা দুর্গাপূজা করতেন।

ত্রিপুরার মহারাজারা পূজা অর্চনার জন্য অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি রেখে গেছেন। সে সব আয় থেকেই বিভিন্ন পূজার খরচ হতো। প্যালেস সুপারিন্টেনডেন্ট পূজার সমস্ত বন্দোবস্ত করতেন। দান, দেবর্চনা বিভাগে এসব খরচপত্রের আলাদা রেজেষ্ট্রী ছিল। এসব কাজের পরিচালনা যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভগবান ঠাকুর কুমার বিপিনবিহারী দেববর্মনের (বীরচন্দ্রের পৌত্র) নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজবাড়ীর পূজা ছাড়া সেদিনকার দিনগুলিতে আগরতলায় যে সব উল্লেখযোগ্য পূজা হতো সেগুলি হচ্ছে মহারাজার প্রভু গোস্বামীদের বাড়ীর পূজা, কর্ণেল বাড়ী, ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণের বাড়ীর পূজা, উজীর বাড়ী, নাজীর বাড়ী, সুবার বাড়ী, রেবতী মোহন ঠাকুর, হৃদয় রঞ্জন ঠাকুরের বাড়ী, অসিত ডাক্তারের বাড়ী, পুরাণ গেষ্ট হাউসে গোবিন্দ কর্তাদের চার ভাইয়ের বাড়ী, লেবু কর্তার বাড়ী, সতীশ দেববর্মণের বাড়ী, সুরেন্দ্র কবিরাজের বাড়ী এবং অমর ভট্টাচার্যের (অমর সুধাভবন) বাড়ীর পূজা। সেসব দিনে দেড়শ থেকে হাজার টাকায় পূজা হয়ে যেত।

পরিবর্তনের স্রোতে বিশেষতঃ অর্থনৈতিক কারণে ১৯৫২-৫৩ সাল থেকেই

আগরতলার নাম করা বাড়ীগুলিতে পূজা হয় বন্ধ, নয় ঘট ইত্যাদি পূজায় পর্যবসিত হয়ে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের চালু হয়। দূর্গাপূজাকে ত্রিপুরা রাজ্যে সার্থক ভাবে রাজা প্রজার এক মিলনোৎসব বলে ধরা যেতে পারে। যদিও এতে শ্রেণী পদ মর্যাদার বিভাজন স্পষ্ট ছিল, তবু একটি দিন সাধারণ প্রজাকে রাজা ভোজ দিতেন, সেটাকে বলা হতো হসম ভোজন। সেদিন রাজা তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনতে একত্র হতেন। যদিও এটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার,--তবু একে ঘিরে সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে সাড়া পড়ে যেতো। এ বিবরণে পরে আসছি। কারণ এটা সাধারণতঃ পুজোর শেষ দিনে -- বিজয়া দশমীতে হতো। রাজবাড়ীর পূজাকে ঘিরে সাধারণ দর্শনার্থীর ভীড় হতো। বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোর এঁদের আমলে গান বাজনার মজলিস হতো--সবই উচ্চাঙ্গ মার্গের। ভারতবিখ্যাত গায়ক বাদকরা সবাই আসতেন আগরতলায় আলাউদ্দিন খাঁ, এনায়েত খাঁ, মুন্না খাঁ--এসে গেছেন গিরিজা বাঈ, কানিজা বাঈ, হীরা বাঈ বরোদাকার, তারা বাঈ আরো কতজন। বিল্বষষ্ঠী থেকে এসব চলতো। তবে পরবর্তীকালে লঘু চালের বাঈজী নাচ ইত্যাদিও হয়েছে। সে মহারাজ বীরবিক্রমের কালে। মহারাজ বীরবিক্রমের রাজবাড়ীর পিছনে নির্বাক সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা হতো। রাজ পরিবারের লোকজন বিশেষ ব্যবস্থায় এবং আম প্রজা সাধারণভাবে সে আনন্দ উপভোগ করতেন।

এরপর হলো সবাক সিনেমা--'দক্ষযজ্ঞ' ইত্যাদি। রাত ৯টার পর রাজা প্রজা সবাই সেই ছায়াছবি দেখতেন। হতো রাজবাড়ীর সামনের দিকে। মহারাজ দক্ষিণমুখী হয়ে বসতেন। রাজবাড়ীর অন্দরমহলে প্রবেশের সামনের পরিসরে ব্যবস্থা হতো। জনসাধারণের জন্যেও ছায়াছবির দর্শন উন্মুক্ত ছিল। পিছনে একটা মঞ্চ করে দেয়া হয়েছিল--সেখানে নাটকও হতো। যোগ দিতেন বহু মান্যগণ্য রাজপুরুষ ও নাগরিকগণ। দু-চারটি নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, অনিল সেন, সুখময় সেনগুপ্ত, সুধাংশু দত্ত, মেঘুবাবু ব্যাণার্জী, ব্রজলাল কর্তা, বলীন কর্তা। যন্ত্র সঙ্গীতে সবসময়ই থাকতেন লেবু কর্তার পরিবার--পরবর্তী কালে তাঁর পুত্রদ্বয় কুমার বিপিন বিহারী ও বঙ্কিম বিহারী দেববর্মন।

দশমী উপলক্ষে রাজ দরবার বসতো--এটা আমোদপ্রমোদমূলক দরবার থেকে পৃথক। একেবারেই আনুষ্ঠানিক এবং ভাবগম্ভীর। এতে রাজ পরিবারের পুরুষ এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীবৃন্দ দরবারের বিশেষ পোষাক --সাদা চোঁগা, দামী কাপড়ের আচকান, রঙীন পাগড়ি এবং কোমর বন্ধ কোমরে তলোয়ার নিয়ে দরবারে যেতেন। এটাও অতি আবশ্যিক পোষাক ছিল। সবারই পরতে হতো -- রেহাই নেই।

ছোটবেলায় বাবাকে দেখেছি দরবার বসার সময়গুলোতে বন্ধু-বান্ধবদের পাগড়ী বাঁধতে ব্যস্ত হতেন। সবাই যার যার পাগড়ী বগলে নিয়ে চলে আসতেন আমাদের বৈঠকখানায়। বলতেন ঠাকুর সাহেব পাগড়ীটা বেঁধে দিন। তখন খুব শ্রদ্ধা ও বিস্ময়পূর্ণ চোখে তাকিয়ে থাকতাম। এখন কিন্তু মনে হলেই কেমন হাসি পায়--এ যেন যাত্রা দলের রাজা সাজা! আমার মনে পড়ে জ্যেঠামশাই--হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চন্দ্র ভট্টাচার্য, নলিনী

মজুমদার আরো অনেকে আসতেন। ২০-২২ হাত লম্বা পাতলা রঙীন কাপড়, বাবা কি অবলীলাক্রমে কায়দা করে মাথায় পরতে পরতে জড়াতেন। উপরে একটা ঝুটির মত উঠতো পিছনে লম্বা কিছু কাপড় ঝুলতো--কান ঢাকা পাগড়ী বাধা হয়ে যেতো।

এ সব দরবারে তিন শ্রেণীর দরবারীর সমাবেশ হতো--খাস দরবারী--অর্থাৎ রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ, বিশেষ দরবারী, ঠাকুরলোক এবং উচ্চ কর্মচারীবৃন্দ এবং সাধারণ দরবারী--অন্যান্য কর্মচারী। এসব দরবার উপলক্ষ্যে রাজা--কর্মচারী ও দরবারীদের ইনাম, বকশিস, এবং খিলাত প্রদান করতেন। এসব বকশিসগুলো হতো টাকা, কোমরবন্ধ ইত্যাদি। প্রজারাও দরবারে নজর দিতেন।

এ প্রসঙ্গে একটি দরবারের বর্ণনা করা যেতে পারে। দববারটি বীরবিক্রমের আমলে বসেছিল--অবশ্য দশমীতে নয়, মহানবমীতে, সম্মান বিতরণ দরবার। স্থান ছিল উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ, খাস দরবার হলে। বৃহস্পতিবার ২৮শে আশ্বিন ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়।

দরবারে কে কোথায় বসবেন এবং মহারাজ কিভাবে দেহরক্ষী এবং শোভাযাত্রাকারী নিয়ে পাত্র-মিত্র সহ দরবারে আসবেন সেই পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সভা হচ্ছে। লিখিত নির্দেশনামায় ছিল--

১) শ্রী শ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর দরবার কক্ষে শুভাগমনের অর্ধঘন্টা পূর্বে দরবারীগণ স্ব স্ব আসন গ্রহন করিবেন। শ্রী শ্রীযুত মহারাজ কুমার ও কুমার বাহাদুরগণ ৭-১৫ মিনিটের সময় আসন গ্রহণ করিবেন।

২) শ্রী শ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর নিম্নোক্ত রূপ মিছিলে ৭-২০ মিনিটের সময় দরবার কক্ষে প্রবেশ করিবেন।

এরপর সেই নির্দেশনামায় যেভাবে মহারাজার শোভাযাত্রার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এরকম--প্রথমে দু সারিতে দু'জন-দু'জন চারজন বল্লমধারী, দুই সারিতে ছয়জন করে বারজন আস্রাবরদার।

এরপর মহারাজ কুমার বাহাদুরগণ তারপর বডিগার্ড জমাদার--দু'সারিতে চাবজন করে ৮জন বডিগার্ড, তারপর রাজমন্ত্রী,--এক সারিতে মিলিটারী সেক্রেটারী, অন্য সারিতে মিলিটারী কমান্ড্যান্ট--প্রথম সারিতে মিলিটারী সেক্রেটারীর পর প্রাইভেট সেক্রেটারী, অনারারী এ,ডি,সি, ক্যাপ্টেন রানা শ্রীযুত ঝাপট জং বাহাদুর, অন্য সারিতে চীফ সেক্রেটারী, এ,ডি,সি, এবং ক্যাপ্টেন কুমার শ্রী শ্রীযুত ব্রজলাল দেববর্মা বাহাদুর--এরপর মাঝে শ্রী শ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর--তার পেছনে দু-সারিতে ২ জন করে চারজন চামরধারী, ২ জন করে ৪ জন ময়ূর পুচ্ছধারী, মাঝে এডি কং, তার পিছনে খাস দরবারীগণ--দু'সারিতে একজন করে দু'জন অর্ডালি, তিনজন করে ছয়জন বডিগার্ড এবং সবশেষে এক সারিতে ছয়জন করে, আরেক সারিতে ছয়জন করে বারজন সোটা বরদার।

মহারাজ যেইমাত্র দরবারে প্রবেশ করবেন অমনি চোপদারগণ যথাস্থান থেকে আগমনবার্তা

ঘোষণা করবেন। দরবারীগণ শ্রীশ্রীযুতকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়াবেন। মহারাজ আসন গ্রহণ করার পর উপস্থিত পন্ডিতগণ বেদমন্ত্রে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করবেন। তারপর মান্যবর চীফ সেক্রেটারী বাহাদুর দরবার আরম্ভ করার অনুমতি নেবেন। মহারাজার পার্সোনাল ষ্টাফগণ খাস দরবারী ও দরবারীদের আতর ও পান দেবেন। এ সময়টায় দরবারীরা এগুলো নেয়ার জন্য দাঁড়াবেন। এরপর মহারাজের অনুমতি নিয়ে যারা উপাধি পদক ও সম্মানাদি পাবেন, তাদের পর্যায়ক্রমে তাদের নাম ঘোষণা করবেন তাঁরা আসবেন। চীফ সেক্রেটারী উপাধি, পদক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ঘোষণা করবেন তারা মহারাজের সামনে এসে একে একে সেগুলো তাঁর কাছ থেকে নেবেন। উপাধি প্রাপ্ত পদক বা খিলাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম চোপদার ঘোষণা করবেন।

এই উপরোক্ত বর্ণিত সভার প্রথমে খিলাত পেয়েছিলেন রাণা বোধজং বাহাদুর। খিলাতগুলো হচ্ছে--২০০ টাকার কিংখাপ আচকান, ৭৫ টাকার সফো, ১৫০ টাকার তরবারী, ৫০০০ টাকার কন্ঠহার। তিনি এগুলো নিয়ে কক্ষান্তরে যাবেন--পরিধান করে আবার সভায় আসার জন্য।

দ্বিতীয় প্রাপক ছিলেন ঠাকুর কমলকৃষ্ণ দেববর্ম্মা (উজীর)। তিনি পেয়েছিলেন জামা ১ দফা, শ্যামলা ১টি, কোমরবন্ধ ১টি। এরপর শ্রী মনীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা সেই একই উপহার। এরপর শ্রী জ্যোতিষ সেন পেলেন কর্মবীর স্বর্ণ পদক। কিছু করোনেশান মেডেল দেওয়া হলো--পেলেন শ্রীল শ্রীযুত দুর্জয় কিশোব, আদিত্য কিশোর দেববর্মা বাহাদুর, শ্রী সৌমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, কুমার কিরণচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর, শ্রী শ্রীযুত ব্রজলাল দেববর্মা বাহাদুর, রাণা ঝাপট জঙ্গ বাহাদুর, এরপর কুমার বঙ্কিম বিহারী দেববর্মা বাহাদুর এবং রাণা বির্লায়ের জঙ্গ বাহাদুর। প্রথম দুজন ছিলেন ক্যাপ্টেন, পরের জন সিনিয়ার নাথেন দেওয়ান, এর পরের তিনজনও ক্যাপ্টেন এবং পরের দুজন সেকেন্ড লেফ্‌টেন্যান্ট।
প্রথম খিলাত প্রাপক রাণা বোধজং বাহাদুর সেদিন আবার 'রাজা' উপাধিও পেলেন। এই সনদ স্বয়ং বড়লাট দিয়েছিলেন। সেটা দরবারে চীফ সেক্রেটারী পড়ে শোনালেন। প্রথমে মহারাজ নিজের কন্ঠহার তাকে পরিয়ে দিলেন এবং পরে তরবারী সহ সনদ দিলেন।

পোষাক পরে আসার পর কমলকৃষ্ণ ঠাকুরকে 'উজীর সাহেব' হুদ্দা দেয়ার সনদ চীফ সেক্রেটারী পড়ে শোনালেন। উজীর সাহেব যথারীতি মহারাজকে নজর প্রদান করে স্বস্থানে চলে গেলেন।

এরপর পোষাক পরিহিত মণীন্দ্র চন্দ্র এলে তাঁকে 'সুবা' হুদ্দা প্রদান করা হলো। তিনিও নজর দিয়ে নিজের জায়গায় চলে গেলেন। কুমার প্রফুল্ল চন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর যিনি শ্রীশ্রীযুতের মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলেন তিনি পেলেন কিংখাপ থান ১টি এবং নগদ ২২৬ টাকা, এরপর লেফ্‌টেন্যান্ট যোগেন্দ্র দেববর্মা পেলেন কিংখাপ থান ১টি নগদ ২০০ টাকা এবং নিয়োগপত্র (Commission)। এরপর চাকলার ডেপুটি ম্যানেজার প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য পেলেন কিংখাপ থান এবং নগদ ৬০১ টাকা, সদর কালেক্টার শশাঙ্কভূষণ রায় পেলেন

কিংখাপ থান এবং নগদ ২৫১ টাকা। হিসাব বিভাগের সেরেস্তাদার প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য পেলেন কিংখাপ থান, নগদ ২০১ টাকা। রাজস্ব বিভাগের ধর্মচন্দ্র তলাপাত্র পেলেন কিংখাপ থান এবং নগদ ১২৬ টাকা। চাকলা ডেপুটি ম্যানেজারের অফিসের সুমার নবীশ গোবিন্দলাল দেশমুখ্য পেলেন কিংখাপ থান এবং নগদ ৮৬ টাকা। সকলেই একে একে মহারাজকে নজর সহ অভিবাদন জানিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

এরপর কৈলাশহর রাধাকিশোর ইনষ্টিটিউশনের হেডমাষ্টার প্রহ্লাদ চন্দ্র বর্মণরায় পেলেন পারিতোষিক ১২০ টাকা। নজর দিয়ে তিনিও চলে গেলেন। এরপর এলেন দ্বারকানাথ আচার্য তিনি পেলেন 'ভিষকাচার্য' উপাধি সংসৃষ্ট সনদ। মহেন্দ্র চন্দ্র গণ পেলেন 'চৌধুরী' উপাধি সনদ।

এরপর মান্যবর চীফ সেক্রেটারী উদয়পুর বিভাগীয় পুর্তবত্ম কমিটির সদস্য এবং অন্যান্য বিভাগীয় নির্বাচিত সদস্যগণকে নিয়োগের জন্য শ্রী শ্রীযুত সাক্ষাতে উপনীত করলেন এবং কমিটি গঠন বিষয়ে নাম প্রচার করলেন।

এরপর চীফ সেক্রেটারী অনুমতি নিলেন সভা ভঙ্গের জন্য। আবার আগের মত মিছিল করে শ্রী শ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর দরবার গৃহ পরিত্যাগ করলেন।

এই হলো শারদীয়া দরবারের চিত্র। একবার বাবাও দরবারে কিংখাপ এবং ৫০০ টাকা পেয়েছিলেন। সেই লালা বেণারসী কিংখাপের কাপড়ে আমার বিয়ের ব্লাউজ হয়েছিল, তাই ব্যাপারটি বিশেষ করে মনে আছে। সেই ৫০০ টাকা দিয়ে বাবা বাধারঘাটে মস্ত জায়গা রাখলেন। সেখানে সুন্দর বাংলো এবং লেক কাটালেন। বাংলাদেশ থেকে নৌকা নিয়ে এলেন। সেখানেই এখন নিম্বার্ক আশ্রম এবং গভর্ণমেন্টের গ্লাস ফ্যাক্টরী রয়েছে। পরে সরকার অনেক জায়গায় অধিগ্রহণ করে নেন। এসবই স্মৃতিমাত্র।

প্রকাশ্য দরবারের কথা বলেছি। এরপর দুর্গাপূজা সংক্রান্ত আরেকটি গুহ্য অনুষ্ঠান রয়েছে সেটি সিংহাসন পূজা। রাজা জীবনে একবারই সিংহাসনে বসেন--সে তাঁর অভিষেকের সময়। এরপর সিংহাসন শ্রদ্ধা এবং সম্মানের স্থান হয়ে থাকে। তাতে তিনি আর বসেন না। বিজয়ার দিন এ পূজা হয়। সন্ধ্যায় রাজার তলোয়ার সিংহাসনে রাখা হয়--এ পূজা অত্যন্ত গোপনীয়। প্যালেসের নীচের ঘরে প্রদীপ জেলে স্বল্পান্ধকারে খুব আপন আত্মীয় স্বজন ও পার্শ্বচর দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত রাজা এ পূজা করেন।

রাজবাড়ীর পূজা ছাড়াও কিছু বিশিষ্ট কুমার ও ঠাকুর পরিবারে প্রতিমা করে পূজা হতো। পুরান আগরতলার কুমার সুরেন্দ্র চন্দ্র বা বড় ঠাকুর (বীরচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র আলাদা দুর্গাপূজা করতেন)। তবে এগুলো বিশেষভাবে পারিবারিক পূজা হতো তাতে পরিবারের সবাই কোন না কোনভাবে অংশ নিতেন। রাণীমা পরিবারের রাণী কুমারীদের সহ ভাগাভাগি করে প্রতিমার সাজসজ্জা করাতেন। প্রথমে ডাকের সাজ হতো পরে নানারকম শৈলী আসে। এ বিষয়ে মহারাজ কুমারী কমলপ্রভা দেবীর কথা উল্লেখ অবশ্য প্রয়োজনীয় তিনি তখনকার দিনে (যখন খুব প্রথাগত উপায়ে প্রতিমাকে সাজানো হতো।) প্রতিমার সাজসজ্জা হঠাৎ

বৈপ্লবিকভাবে করে ফেলতেন। একবার দুর্গাকে বাঘছালের পোষাক পরালেন। অসুরকেও অন্য ধরণের সাজালেন। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে ত্রিপুরায় বাঁশ দিয়ে নানা হস্তশিল্পের প্রথম উদ্ভাবনকারিণীও তিনিই। তারই ডিজাইন এখনো বেশীরভাগই বাজারে চলছে।

পূজা হতো অনেকেরে বাড়ীতেই। গেষ্ট হাউসে গোবিন্দ কর্তারা পাঁচ ভাই মিলে পূজা করতেন। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পূজা ছিল। তাদেরও পূজা হতো নরসিং কর্তার বাড়ীতে, উজীর বাড়ীতে অসিত ডাক্তারের বাড়ীতে। আমার ঠাকুরদা রেবতী মোহন ঠাকুর তার ভাই হৃদয়রঞ্জন ঠাকুরও প্রতিমা করে দুর্গাপূজা করতেন। আমার দাদু রেবতী ঠাকুর বীরবিক্রম মাণিক্যের সভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন। স্বাস্থ্য দপ্তর তাঁর হাতে ছিল, হৃদয়রঞ্জন ঠাকুর ছিলেন জজ।

আমার মনে পড়ে, ছোটদাদু ললিত ঠাকুরের মেয়েরা। সব পিসীরা এসে আমাদের প্রতিমা সাজাতেন। কি সুন্দর সেই সব অলঙ্করণ। বড় ছেলে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মারা গেলেন উকিল ছিলেন তিনি। তাই দাদু প্রতিমাপূজা বন্ধ করে দিলেন। পবে ঘটপূজা হতো আমাদের।

পূজার সময় কি কঠোর বিধি নিষেধ ছিল তখন। যিনি পূজার সব কাজকর্ম কবতেন, আমাদের তহশীলদার ভুবন মোহন দাস, পূজার আগে থেকে সংযমে থাকতেন। নিবামিষ খাওয়া, স্ত্রীসঙ্গ না করা সব মানতেন। পূজাব তিনদিন কত থালা যে ভোগ হতো, প্রতিদিন বেশ ক'জন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে প্রসাদের থালা যেত। আমরা নাবকেল কোবানোব পর, মালাটা নিয়ে খাওয়ার জন্য বসে থাকতাম, আর বেশী ধাবে কাছে গেলে ধমক খেতাম। বিকেলে শীতল ভোগ হতো। লুচি, সুজি, সন্দেশ এসব। প্রতিমাকে নাকি একা মন্ডপে ফেলে রাখা যায় না তাই সব সময় কেউ না কেউ পাহারায় থাকতো। সবদিন আমরা ঘুরতে বেরোইনি। আর সে দিনগুলোতে পূজা আরতি অঞ্জলির মধ্যেই গভীর আনন্দ পেতাম। সবচেয়ে ভালো লাগতো সাজি সাজি শেফালী ফুল কুড়োতে। বাগানে দু'পাশে সারি সারি স্থলপদ্ম গাছ লাগানো ছিল। কি মিষ্টি সুবাস যে এই ফুলগুলো থেকে বেরোত তা যারা সকালে উঠে ফুল তোলেনি তারা জানবে না।

আজকালকার মত দামী দামী উপহার আমরা পাইনি। যদিও বাড়ীতে অজস্র কাজেব লোক, তিনটে গাড়ি, গোয়াল ভর্তি গরু, বাগান ভর্তি তরকারী এবং পুকুর ভর্তি মাছ ছিল। মনে পড়ে বাবা লালপাড় কোরা শাড়ী এনে দিতেন। সেই নূতন শাড়ীর গন্ধ এখনো নাকে লেগে আছে। সেই আনন্দ রোমাঞ্চ শত শত টাকার দামী শাড়ীতেও আসে না। কারণ তখন মনে নিষ্ঠা, বিশ্বাস এবং গভীরতা তীব্র ছিল। অবশ্য এটা যুগের লক্ষণ। বিজয়ার দিন সকাল থেকে কেবল কান্না পেত। আর বিকেলে যখন কাসার ঘন্টা ঢাক ঢোলে আরতি করে প্রতিমা রাজবাড়ীর দিকে নিয়ে যাওয়া হতো তখন আমরা খুব কাঁদতাম । ছোটরাও এমন কি বড়রাও।

বিসর্জনের আগে সমস্ত প্রতিমা জড়ো হতো রাজবাড়ীর সামনে। সেখানে কিছুক্ষণ পর্দা দিয়ে জায়গাটা ঘিরে দেয়া হতো। রাণী কুমারীরা আসতেন মাকে ধান দূর্বা দিতে। তারপর প্রতিমার সামনে ধূপধুনো দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আরতি হতো। এসব আমাদের

শোনা কথা। কারণ আমরা সেখানে যেতাম না। আমরা চলে যেতাম হাওড়া নদীর তীরে। গাড়ী নিয়ে বাড়ীর লোকজন সহ অপেক্ষা করতাম বিসর্জনের মিছিল দেখার জন্য।

বিসর্জনের যাত্রা শুরু হতো। সেকি সাড়া জাগানো শোভাযাত্রা। ঝলমলে হাওয়ায়, গয়নায় সজ্জিত হাতীর দল, মিলিটারী ব্যান্ডপার্টি, আসাসোটা সহ আস্রাবরদারগণ, তারপর পাঞ্জা চামর এবং অন্যান্য রাজকীয় ধ্বজাবাহী বিনন্দিয়াগণ, পদাতিকগণ অভিজাতকগণ দুই প্লেটুন মিলিটারী প্রথমে প্রভু বাড়ীর প্রতিমা তারপর রাজবাড়ীর প্রতিমা, এরপর থেকে একে একে গুরুত্ব অনুসারে সকলের প্রতিমা। নদীর তীরে মা দুর্গাকে পুরো মিলিটারী কায়দায় আকাশে গুলি ছুঁড়ে সেলামী দেওয়া হতো। তারপর দশমীঘাটে নদীর জলে সমস্ত প্রতিমাকে বিসর্জন দেয়া হতো। এরপর হাতী দিয়ে সমস্ত প্রতিমাকে ভেঙে গুড়িয়ে নদীর জলে মিশিয়ে দেওয়া হতো। পিছনে ছিল একটাই দার্শনিক দৃষ্টি। অঙ্গহীন আরাধ্যা মায়ের প্রতিমা বা তার সাজসজ্জা যেন যেমন তেমনভাবে কারো হাতে পড়ে অসম্মানিত না হয়। প্রিয়জনের মৃত্যুর পর যেমন সসম্মানে তাকে দাহ করা হয়, ঠিক তেমনি। উত্তাল জল প্রবাহ উচ্ছ্বসিত কিন্তু সেদিন সে জনতাও ছিল সংযত সুন্দর সবটাই, উপভোগ্য। বিসর্জনের পর পুরোহিত শান্তির জল দিতেন প্রতি ঘরে ঘরে এবং পরিবারস্থ সকলের মাথায়। পরস্পর শ্রদ্ধা প্রীতি বিনিময় হতো। প্রণাম আলিঙ্গনের পালা চলতো দশমী রাত্রি থেকে শুরু করে বেশ ক'দিন।

তখন বা খুব বেশী পূজা হতো না। মনে হয় যা পূজা হতো তা নূতন হাভেলী বা আগরতলাতেই বেশী। তাই প্রজারা সবাই দুর্গাবাড়ীতে পূজা দেখতে আসতো চারদিক থেকে। তবে সাধারণ্যে পূজা নিয়ে খুব একটা মাতামাতি ছিল না এখনকার মতো।

বিজয়া দশমীতে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্টেট ডিনার দেয়া হতো সমস্ত পার্বত্য প্রজাদের নিয়ে। বিশেষতঃ বিভিন্ন সর্দারদেব এতে নিমন্ত্রণ করা হতো। তাই নবমী থেকে দলে দলে পাহাড়ী প্রজাদের আসা শুরু হতো। কয়েক হাজার অতিথি এসে হাজির হতেন। এটাকেই হসম ভোজ বলে। হালাম ভাষায় 'হসম' কথাটিব অর্থ সৈন্য। পরে অবশ্য এই শব্দ অপ্রচলিত হয়ে গেল। কিন্তু ভোজন পর্বের নাম হসম ভোজনই রয়ে গেল। বিভিন্ন দফার আদিবাসী সম্প্রদায় এতে যোগ দিতেন। সর্দারদেব দু 'বোতল মদ দিয়ে নিমন্ত্রণ করতে হতো। হালামদের প্রধান একজনকে ভাসান রাজা করা হতো। আসলে তিনি হতেন রাজ প্রতিনিধি। ভাসমান রাজার সুখ সুবিধা দেখার জন্য বিনন্দিয়াগণ সেদিন নিযুক্ত থাকতো সারাদিন।

তিনি প্রথম না আহার করলে নিমন্ত্রিতরা শুরু করতে পারতেন না। অন্ন গ্রহণ করার আগে নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভাসান রাজা জিজ্ঞেস করতেন, অনাদি অতীতকাল থেকে আপনারা আপ্যায়নে তুষ্ট হয়েছেন তো ? সম্মান ও গুরুত্ব অনুযায়ী নিমন্ত্রিতরা বিভিন্ন পংক্তিতে বসতেন। এ বিচারে অনেক সময় পিতা পুত্রকে আলাদা বসতে হতো। সারারাত অপর্যাপ্ত পান উৎসব চলতো। হাজার হাজার লোকের খেতে খেতে ভোর চারটে পাঁচটে বাজতো।

রাজকার্য পরিচালনায় উপজাতি পার্বত্য প্রজারা কর্তব্য দায়িত্ব অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণী বা হদায় বিভক্ত ছিলেন। এই হদার সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা হচ্ছেন ১। সুবে নারাণ--এরা দুর্গা পূজার কাজ এবং হসম ভোজনের মাংস কাটার কাজ করতেন। ২। দৈত্যসিং সুইসিং এরা হসম ভোজনের সময় মাংস কাটতেন। ৩। কুয়াই তুইয়া--এরা দরবারে যখন বিতরণ করা হতো, তখন বিভিন্ন জনকে ফুলের মালা দিতেন। সিংহাসন যেখানে থাকে সেখানে ধূপ ধুনো দিতেন বিশেষ বিশেষ পূজা উপলক্ষে সিংহাসন ধোয়ামোছা করতেন। ৪। সিউক শিকারী এরা মূলত রাজ পরিবারের আহারাদির জন্য পশু পাখি শিকার করতেন। দরবারে উপাধি বিতরণের সময় এরা চন্দনের পাত্র ধারণ করতেন। ৫। বাছাল--এরা ত্রিপুরেশ্বর কোন মিছিল নিয়ে বেরুলে সেই সময রাজমিছিলে রূপোব তৈরী পান ও পাঞ্জাবহন করতেন। এরা বাঁশ দিয়ে দেবদেবী ও বিয়ের বেদী, পূজার মন্ডপ তৈরী করতেন--পূজার জল এনে দিতেন। ভাসান রাজার নেতৃত্বে সবাই খাওয়াদাওযা করতেন। পরদিন রাজদর্শন প্রাপ্তি। মহারাজ স্বয়ং প্রজাদের মাঝে আসতেন ওদের সুখ দুঃখের কথা শুনতেন। তাদের নানা উপাধি ও ইনাম দেয়া হতো। এসব ব্যাপার দেখাশোনা করতেন হরচন্দ্র ঠাকুর। ধীর স্থির বিনয়ী মানুষ ছিলেন তিনি। বীবেন্দ্র কিশোরের পত্নী মহাবাণী প্রভাবতী দেবী, যাঁকে ত্রিপুরার সবাই বড় মহারাণী বলেন, তিনি মাঝে মাঝে দুর্গাবাড়ী আসতেন, পুজা ও প্রতিমা সজ্জা নিয়ে নানা উপদেশ দিতেন। পূজার সময় রাজবাড়ীতে কর্মীদের, আত্মীয় স্বজনদের কাপড়চোপড় গয়না বিতরণ করা হতো।

ক্ষীরগোপাল কর্তার বাড়ীতে পূজার জাঁকজমক হতো যথেষ্ট। কিন্তু পশু বলি হতো না। বলি হতো চালকুমড়ো। মনে হয় বৈষ্ণব বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রভাব পৌত্র ব্রজেন্দ্র কিশোরের উপর যথেষ্ট মাত্রায় ছিল। আমার ঠাকুরমা কুমুদিনী দেবী বীরচন্দ্রের তৃতীয় মহিষী মনোমোহিনীর দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর কাছে শুনেছিলাম তাবা ছোটবেলায় কোনদিন মাংস খাননি। বিয়ের পর রাজবাড়ীর বাইরে এসে মুরগী দেখেছেন। তার আগে মুরগী কেমন তা দেখেন নি।

ক্ষীরগোপাল কর্তার পিতা ব্রজেন্দ্রকিশোর ও তাঁর পত্নী -- মহালয়া থেকে শুরু করে নিরামিষ খেতেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর মহালয়া থেকে শুরু করে পনের দিন পিতৃপুরুষের তর্পণ করতেন। শারদীয় পূজাতে তাদেব বাড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। এটা ছিল সম্পূর্ণ পারিবারিক। দশমীর পরদিন ভাতিজা সমরেন্দ্র চন্দ্র, কাকা ব্রজেন্দ্র কিশোরের বাড়িতে তার বেহালা নিয়ে এসে বাজাতেন--কখনো হাস্যরসের কমিক অভিনয় হতো।

রাজবাড়ীতে পূজা উপলক্ষ্যে নাটক হতো, প্রতিযোগিতাও হতো। বীরচন্দ্র কিশোরের আমল থেকেই এটা খুব চলছিল। একবার *আত্মদর্শন* বলে একটা নাটক হয়। তাতে অনিল দাশগুপ্তের (উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা ছিলেন) পিতা শরৎ দাসকে দুর্ভিক্ষ পীড়িতের ভূমিকায় নামানো হয়। অনিল দাশগুপ্ত এবং ওর ছোট ভাই অজিত দাশগুপ্ত সত্যি খুব চোখে পড়ার মতো রোগা চেহারার ছিলেন। তাঁদের পিতাও নাকি রুগ্ন না হলেও কঙ্কালসার চেহারার

ছিলেন। বীরেন্দ্রকিশোরের পঞ্চম মহারাণীকে দেখতে বিখ্যাত চিকিৎসক বিধান রায়, নীলরতন সরকার এসেছিলেন। নাটক দেখে তারা এত অবাক হলেন যে সেই 'দুর্ভিক্ষপীড়িত' মানুষটিকে তাঁরা দেখতে চাইলেন পরদিন।

একবার কোন এক বিখ্যাত সেতারী--(নামটা জানা যায়নি) বীরচন্দ্রের আমলে এসেছিলেন । ভেবেছিলেন মহারাজার সম্মানে সেতারে একটা নূতন রাগ তৈরী করে বাজিয়ে শোনাবেন। প্যালেসে বসে তিনি সেটা তৈরী করছেন আড়াল থেকে (লেবুকর্তা — বীরচন্দ্রের ছেলে) শুনে শুনে মনে মনে তুলে নিয়ে অভ্যাস করলেন এবং পরদিন দরবারের প্রথমেই তিনি ঐটাই বাজিয়ে শুনিয়ে দিলেন। সেই সেতারী ওস্তাদ নাকি খুব রাগ করেছিলেন তাতে।

এমনি মজার গল্প শোনা যায় এক বাঈজী সম্পর্কেও। আগেই বলেছি পূজা উপলক্ষ্যে অনেক নামকরা বাঈজী আগরতলায় আসতেন। সিদ্ধেশ্বরী, কনিজা, গহরজান প্রমুখ। একবার গহরজান বাঈজী পায়ে নূপুর দিয়ে আসরে বসে গানের সঙ্গে ভাও করছেন। রাণী কুমারীরা দোতলায় চিকের আড়াল থেকে দেখে বলে পাঠালেন, আমাদের রাজ্যে রাণী কুমারীরা ছাড়া কেউ সোনার পায়জোব পায়ে দিতে পারে না। গহরজান মুচকি হেসে তসলীম্ জানিয়ে উঠে গেলেন আসর থেকে। নিজেদের তাঁবু থেকে এবার পরে এলেন হীরার পায়জোর। এবং সেটা পরে ঘাঘরা একটু পায়ের উপরে রেখে গুটিয়ে বসে ভাও শুরু করলেন। সবাই এবার হতবাক।

এমনি বহু স্মৃতির মণি-মুক্তো ছড়িয়ে আছে আমাদের অতীতের আনন্দ উৎসবে। এগুলোকে নিয়েই আমাদের 'সেকালের দুর্গোৎসব'।

অগ্নিগর্ভ উত্তর-পূর্বাঞ্চল — উগ্রবাদ সমস্যা এবং আমরা

স্বাধীনতার পর থেকে নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল, আসাম জুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রসারিত হয়ে চলেছে। ভারতীয় শাসনযন্ত্র থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরীর লক্ষ্যে এ. জেড. ফিজোর নেতৃত্বে নাগাল্যাণ্ডে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিলো, তা বারবার নতুন এলাকায় নতুন মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরই ফিজো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর কাছে দাবী করেছিলেন নাগাল্যাণ্ডের স্বতন্ত্রতা — নেহেরু সায় দেননি। ফিজোর ডাকে সাড়া দিয়ে নাগাপাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন। ফিজো গিয়েছে , তবু আন্দোলন থেমে থাকেনি। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভাঙার জন্য, তাকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এই অঞ্চলের উগ্রপন্থীবা বর্তমানে জোট বেঁধেছে। কেন্দ্রের শোষণ, বঞ্চনা, অবহেলা, সমস্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে এ অঞ্চলের যোগাযোগহীনতা, অপরিচয়ের বেদনা, অপমান — সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যবাসীর এক অভিযোগ। দিল্লীর ঔপনিবেশিক শাসনের কথা — মণিপুরী, নাগা, অসমীয়া সকলেরই মুখে মুখে। এই তথাকথিত শোষণ থেকে সমগ্র এলাকাকে মুক্ত করতে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলি একজোট হয়ে তৈরি করেছে ইন্দো-বার্মা-বিপ্লবী ফ্রন্ট । লক্ষ্য — ইন্দো-বার্মা স্বাধীন রাষ্ট্র। সম্প্রতি এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে ত্রিপুরাও।

সোজা কথায় সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল আজ অগ্নিগর্ভ — এবং খানে খানেই সে আগুন জ্বলেও উঠছে। এই সংগ্রামে চুক্তিমতো কাজ করছে অসমের সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী (আলফা-বোরো সিকিউরিটি ফোর্স)। নাগাল্যাণ্ড ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল (এন.এস.সি.এন) ও মণিপুরের সংযুক্ত জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট (ইউ.এন.এল.এফ)। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ত্রিপুরাও। একসময়ের টি.এন.ভি, বর্তমানের এন.এল.এফ.টি, টাইগার ফোর্স, এস.ডি.এফ.টি, টি.টি.ভি.এফ, পি.এল.এ, সেংক্রাক, মিলিশিয়া ফোর্স, এ.টি.ভি.এফ ইত্যাদি এগারটি বৈবী সংগঠন কাজ করছে। বলা হচ্ছে , এদের কাছে রয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি। পরিসংখ্যানে অনেকসময়েই তফাৎ থেকে যায়। তবু যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যাচ্ছে — ১৯৯৪ সালে এইসব উগ্রপন্থী গোষ্ঠীদের দ্বারা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ — মোট অপহৃত ২১৬ ফিরেছেন ১৮৭, নিহত ২২, পাওয়া যায়নি ৭। ১৯৯৫ সালে মোট অপহৃত ৩৬৭, ফিরেছে ৩২৩, নিহত ২১, পাওয়া যায়নি ২৩। ১৯৯৬-এর

২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট অপহৃত ২৪৫, ফিরেছে ১৮৮, নিহত ৮, পাওয়া যায়নি ৪৯, নিরাপত্তা রক্ষী নিহত ২৮। বৈরী-পুলিশে ১৯৯৫-'৯৬-এ গুলি বিনিময় হয়েছে ৮০ বার। তাতে ৪৪ জন বৈরী নিহত, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫৫জনকে। বৈরীদের কাছ থেকে একটি এ.কে ৫৬, একটি এস.এল.আর, চারটি স্টেনগান এবং বেশ কিছু দেশী বন্দুক উদ্ধার হয়েছে। বাংলাদেশ, বার্মা, থাইল্যাণ্ডে এদের ঘাঁটি রয়েছে। রয়েছে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ। বিদেশী ট্রেনিং, অর্থ, উন্নতমানের অস্ত্র এদের হাতে দেয়া হচ্ছে। এদের পেছনে সক্রিয় আমেরিকান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'সি.আই.এ', পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস.আই। এই ষড়যন্ত্র প্রথম ভারত সরকারের নজরে আসে ১৯৭৯ সালে 'অপারেশন ব্রহ্মপুত্র' নামে নীল নক্সার জানাজানি হয়ে যাবার পর। এই প্রকল্পের রচনার স্থান আমেরিকার ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্পেশাল অপারেশন রিসার্চ অফিস'। লক্ষ্য — উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে আলাদা করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা। ভারতভূমিকে খন্ডবিখন্ড করে একতা শক্তিকে বিপন্ন করা বিদেশী রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রশক্তির উদ্দেশ্য।

কিন্তু এখানে একটি ব্যাপারই বড় হয়ে দাঁড়ায় যে উপযুক্ত ভূমি না পেলে বীজ রোপিত হলেও ফসল ফলবে না। এক্ষেত্রে সেই জিনিসটাই আমাদের মনে বড় হয়ে দেখা দেয় যে বাইরের থেকে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি বা পার্শ্ববর্তী রাজ্য কিভাবে এই সুযোগ নিতে পারলো।

এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে বাইরের এজেন্সীগুলি চক্রান্তের জাল বিছিয়ে জাতিবিদ্বেষ জাগিয়ে তুলছে — বিচ্ছিন্নতাবাদকে উসকে দিচ্ছে। যাব ফলে আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা এবং সংহতির সামনে বিরাট এক চ্যালেঞ্জই শুধু দাঁড়ায়নি, এক অংশের মানুষের (এখানে বিশেষভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠীর) দ্বারা সংগঠিত সন্ত্রাসবাদ, বীভৎস এবং নিষ্করুণ হিংসা, হত্যালীলায় আরেক অংশের (এখানে বিশেষভাবে সংখ্যাগুরু বাঙালী এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর) মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর এবং দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে যে শুধু শারীরিক অস্তিত্বই নয়, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং মানবিক প্রীতিও অভাবিতভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে শেষোক্ত বিষয় আরো বিপজ্জনক। কারণ, ভূমিকম্প, বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ক্ষয়-ক্ষতি হলে মানুষ তা নানা সূত্রের সাহায্য সহযোগিতায় কালক্রমে কাটিয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে বহু জীবনহানিতে দুঃখ হলেও ততটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ভবিষ্যাতের জন্য তোলা থাকে না। কিন্তু এই মনুষ্যসৃষ্ট বীভৎস ব্যাপারে মানসিকভাবে যে ক্ষত বা ভেদ সৃষ্টি হয়, তা সহজে নিরাময়ের উপায় থাকে না। এখন ব্যাপার হচ্ছে, এই হানাহানিতে আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত কেউই লাভজনকস্থানে দাঁড়িয়ে নেই। আক্রান্ত মানুষ — দুর্গত মানুষ, ক্ষতিগ্রস্ত। মানবতা এখানে ভূলুণ্ঠিত। তবু সরাসরি তারা মানুষের সহযোগিতা সমর্থন পায়। কিন্তু আক্রমণকারী — যারা পথভ্রান্ত, দীর্ঘ শোষণ বঞ্চনার অপমানের জ্বালায় বদলা নিতে পাহাড়ে জঙ্গলে সহস্র অসুবিধায়, প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরছে, তারা লোকের চোখে ঘৃণ্য — নিন্দিত এবং এখানেই শেষ নয়, তাদের

অংশের সমস্ত জাতিগোষ্ঠীও তাদের কারণে বিব্রত লজ্জিত সমালোচিত এবং সর্বোপরি অত্যন্ত বিপন্ন। কারণ উপজাতি সমাজের প্রগতি ও শিক্ষাই শুধু স্তব্ধ হয়নি, উগ্রপন্থীদের চাপানো চাঁদার ধার্য হারেও তাদের পিঠ বেঁকে যাচ্ছে। অথচ এবিষয়ে বলারও তাদের উপায় নেই — কারণ, অস্তিত্বের সঙ্কট। তাদের কোথাও যাবাব পালাবার জায়গা নেই। এই অস্বস্তিকব অবস্থার অবসান হৃদয়বান মানবসমাজের স্বার্থেই ভীষণ প্রয়োজনীয়। এজন্য আজ সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সমবেত আন্তরিক প্রচেষ্টাব প্রয়োজন। কিন্তু এব্যাপারেও দেখা যাচ্ছে যে দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের স্তরে পাবস্পরিক ঘৃণা অভিযোগ ভুল বোঝাবুঝির চেয়ে শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত, সংস্কৃতিবান মানুষের মধ্যেই বিচার-বুদ্ধি বিবেকহীন মন্তব্য উক্তি বা তিক্ততা যা অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার সমাধানকে আরো জটিল করে তুলছে, তার মাত্রা বেশী। তবে এ সমস্যার সমাধানের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে গেলেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় এবং রাজ্য সরকার তার বাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক, সামবিক শক্তির বাইরে আমরা সাধারণ মানুষ কি করতে পারি, কতটুকু আমাদের করা সম্ভব। এবিষয়ে কিছু করতে গেলে কর্তব্য নির্দ্ধারণের আগে আমাদের দেখা উচিত, কি কববো, কেন কববো এবং কিভাবে করবো।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি, সমস্ত উত্তব-পূর্বাঞ্চলেব উপজাতি জনগোষ্ঠীব মনে একই অনুভব এবং বিশ্বাস যে তাদেব বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা -— বৈচিত্রপূর্ণ তথা বৃহত্তব ভারতেব কাছে প্রায় অচেনা। এরকম অপরিচিত জীবনযাত্রা নিয়ে তাবা যথেষ্ট পবিমাণে অবহেলিত, কোনঠাসা এবং অসম মর্যাদায় পড়ে আছে। স্বাধীনতাব পঞ্চাশ বছব পরেও তাদের প্রতি উপযুক্ত নজর দেয়া হয়নি।

গত ১৯৯৫ সালে গৌহাটিতে হোটেল ব্রহ্মপুত্রে (৩বা থেকে ৫ই জানুয়ারী) নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুবি নামে নাগাল্যাণ্ড গান্ধী আশ্রম আয়োজিত তিনদিনব্যাপী যে আলোচনা চক্র হয়েছিলো, তাতে এইসব সমস্যা খুব বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছিলো।

এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করতে এসে সুপ্রীম কোর্টেব ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রী পি.এন. ভগবতী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে অত্যন্ত বেদনাব সঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল আজো এত অবহেলিত — আজো এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য ট্রেন বা আকাশপথে সংযুক্ত নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি মানুষের জীবনেব উন্নতির প্রধান শর্ত। তাঁর বিলাপ শুনে মনে হলো এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না।

বিভিন্ন আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে উপজাতি জীবনের দৈন্য, জীবিকার অভাব, নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংসের ক্ষোভ, উগ্রপন্থা দমনের নামে সৈন্যদের হাতে সাধারণ মানুষের মানবাধিকারের লাঞ্ছনা ইত্যাদি। সারা ভারতের গুণীজ্ঞানী মানুষেরা এই সমাবেশে এসেছিলেন। প্ল্যানিং কমিশনেব জয়ন্ত পাতিল এসেছিলেন। প্রথাবদ্ধ চাষবাসের অসুবিধায় নানা মরশুমী ফলের বা অন্যান্য গাছপালা চাষের বিষয়ও আলোচিত হয়েছিলো সে

আলোচনাসভায়।

ভারতের বিভিন্ন মেট্রোপলিটন নগরীগুলি যে সময়ে পরিকল্পিতভাবে ঈর্ষণীয়রূপে সমৃদ্ধ, সজ্জিত ঝকঝকে হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময়ে — স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও একই ভারতভূমিতে সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখনো প্রায় ক্ষেত্রেই অভাবনীয়ভাবে আদিম জীবনযাত্রায় হিঁচড়ে আটকে আছে। এই আলোচনায় সেই লজ্জাকর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

অবশ্য এটাও ইতিহাসের এক অভ্রান্ত গতি যে যেখানেই বর্তমান স্বার্থপর সভ্যতার বিস্তার হয়েছে, সেখানেই ট্রাইবেল অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হয়েছে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এভাবেই মায়া, আজটেক, ইনকার মতো বিচিত্র উন্নত সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। এগুলো স্বাভাবিক কারণেই হয়। কারণ, বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতি মানেই আগ্রাসন নীতি — জোর যার মুলুক তার-এর লড়াই, সামাজিক ন্যায়নীতি সদাচারের বদলে, শঠতা প্রবঞ্চনা ভণ্ডামীর রাজত্ব।

ট্রাইবেল সভ্যতায় যে সারল্য রয়েছে তাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত উপার্জন বা পরধন লুণ্ঠন বা একে অপরকে ঠকিয়ে বড় হওয়াব মনোবৃত্তির অভাব রয়েছে। এটাকেই সাধারণ চক্ষে উৎসাহহীনতা আলস্য বা উদ্যমহীনতা বলে মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে উন্নততর সভ্যতার পাশাপাশি এলে পরে এদের পক্ষে এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চনা এবং শোষণের শিকার হতে হয়। আসামের অশোধিত তেল যখন সুদীর্ঘ পাইপ টেনে বারুণীতে সংশোধনের জন্য চলে যায়, তখন স্থানীয় বস্তু যুবক তার সম্ভাব্য প্রাপ্য জীবিকা, কাজকর্ম থেকে বঞ্চিতহয়। উপজাতি এলাকায় উন্নয়ণের নামে যখন কেন্দ্রীয অনুদান হিসেবে বিপুল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ হয় এবং সে কাজ যখন ঠিকমতো হয় না বা কিছুই হয় না, অথবা উপজাতিদের বছরের পর বছর যখন কোন সরকারী চাকরি-বাকরি জোটেনা (যদিও সাংবিধানিক অধিকারে কোটা ভিত্তিতে অগ্রাধিকার বিধিবদ্ধই ছিলো, কিন্তু সেগুলো স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বহু কারণেই কিছুই মানা হয় নি — বিশেষ যোগ্যতাভিত্তিক চাকরি দূরে থাক, পিয়ন কি রাঁধুনী বা জলবাহকের পদও দেয়া হয় নি) তখন তারা ব্যর্থতায়, অভাবে অনটনে পিছিয়ে পড়ে ক্ষুব্ধ অশান্ত হয — ঈর্ষাগ্রস্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঈর্ষা থেকে জমে ক্রোধ, তারপর সে ক্রোধাগ্নিতেই উগ্রপন্থী হয়।

এইসব সমস্যার যদি কেউ সত্য সমাধান চায়, তাহলে তাকে নির্ভীক, সত্যপ্রিয় এবং ন্যায়বাদী হতে হবে। কাউকে খুশী করাব জন্য মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করে সত্যকে একপাশে আড়ালে রেখে আলোচনার টেবিলে বসলে চলবে না। কারণ, এই সমস্যার ভিত্তি যতটা অর্থনৈতিক, ততটাই মনস্তাত্বিক — প্রক্ষোভভিত্তিক।

এপ্রসঙ্গে আগরতলায় আগত চিত্রাভিনেতা ভিক্টর ব্যানার্জীর আগরতলা মিউজিক কলেজে প্রদত্ত এক বক্তৃতাকে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি উগ্রপন্থী সমস্যার বিষয়ে বলেছিলেন — মানুষ কি চায়? নিঃসন্দেহে খাওয়া পরা বাসস্থান। কিন্তু তারো চেয়ে বড় — মানুষ আইডেন্টিটি চায়, চায় স্বীকৃতি। শিলং-এ উপজাতি যুবকদের সঙ্গে হৃদ্যতায় ও

গভীর বন্ধুত্বে বেড়ে ওঠা ভিক্টর বললেন, শিলঙে গণ্ডগোলের সময় ওঁরা বাড়ি ছেড়ে যান নি। অনেকেই সরে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের গভীর বিশ্বাস ছিলো কেউ তাঁদের কিছু করবে না। ওঁর বাবা লায়নস্ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তথাকথিত দাঙ্গাকারীরা তাঁদের জন্য খাবার রেখে গিয়েছিলেন। গভীর আবেগে তিনি বললেন — মানুষকে ভালোবাসুন। ভালোবাসার মতো সত্য কথা কিছু নেই। তার চেয়ে বড় কথাও কিছু নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের ভালোবাসা যে কিভাবে কোন পথে এগোবে, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থী সমস্যার মধ্যে স্থান ভেদে, দৃষ্টিকোণ ভেদে তারতম্য রয়েছে। ত্রিপুরায় এ সমস্যা অন্যান্য রাজ্য থেকে ভিন্ন ধরণের। সেটাকে আমাদের গভীরভাবে বুঝে নিতে হবে।

একদার অতিথিপরায়ণ, নম্র, সরল, হাসিখুশী জীবনোচ্ছল ত্রিপুরার উপজাতি সমাজ যারা সহজ জুম প্রথায় মোটামুটি খেয়ে পরে সুখে সাচ্ছন্দ্যে বেঁচে ছিলো, তারা কিভাবে উগ্র নারকীয় মানুষ হত্যাকারী খুনী গোষ্ঠীতে পরিচিত হলো, এটা সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার।

সাম্প্রতিককালে জারুলবাচাই, কল্যাণপুর, তৈদু এবং শেষ পর্যন্ত খোয়াইয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে যে অহেতুক ধ্বংসলীলা এবং নরমেধ যজ্ঞ ঘটে গেছে, তা অকল্পনীয় নিন্দনীয় এবং ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু এই সব ঘটনাই কি উগ্রপন্থীদের একক স্বতস্ফূর্ত হিংসাত্মক কার্যাবলী না তার পিছনে রয়েছে কোন বৃহত্তর বিচিত্র প্লট যার তুলি অন্য কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা সংস্থার হাতে? না তারা সেই রুক্ষ অভাবী অভিমানী সংবেদনশীল জমি যাদের প্রক্ষোভ এবং অভাবকে কাজে লাগিয়ে কেউ বীজ বপন করে যাচ্ছে বদ মতলব নিয়ে? এগুলো আমাদের বিচায।

একদিকে যেমন এইসব ঘৃণ্য দুঃখজনক ঘটনা ঘটে চলেছে, মানুষ উদ্বিগ্ন ভীত সন্ত্রস্ত এবং লক্ষ্যনীয়ভাবে বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ছে এদের প্রতি, এদের জাতিগোষ্ঠীর প্রতি — তেমনি আরেকদিকে অগণিত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, উদার হৃদয়, সমস্যার সমাধানে আন্তরিক আগ্রহী বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর মানবতাবাদী শিক্ষিত সম্প্রদায় নানাভাবে এগিয়ে এসেছেন কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার করে এ সমস্যার সঠিক আলোচনায়। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্ধারণ করা।

এখানেই আমাদের ভবিষ্যৎ শুভেচ্ছা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। চতুর্দিকেই আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খোলামেলা স্পষ্ট আলোচনা হচ্ছে। নিজেদের আত্মসমালোচনা হচ্ছে। দায়সারা গোছের 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের আলোচনার পাশাপাশি ভুল ভ্রান্তিকে জেনে নিয়ে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই।

মার্চে এমনি এক আলোচনা সভা হয়েছে প্রেসক্লাবে। অন্বেষক গোষ্ঠী এর উদ্যোক্তা ছিলেন। এতে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্নভাবে কোন রকম রাখঢাক না রেখে সমস্যাকে নানাভাবে আলোচনা করেছেন। বক্তব্য থেকে বেরিয়ে এসেছে — আমরা পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। স্বাধীনতার পর সত্য অর্থে সামাজিক ন্যায়বিচার মোটেই পালিত হয়নি। ভাষাতাত্ত্বিক রাজনীতিবিদ প্রফেসর কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতার পর পরিকল্পিতভাবে ট্রাইবেলদের

সংখ্যাগুরু বসতি ভেঙে দিয়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করা হয়েছে। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহের আদেশক্রমে শ্রী এ. কে. লোধ পুলিশ প্রশাসন সামনে রেখে এসব কাজ সম্পন্ন করেছেন, যা মানবতার দিক দিয়ে বেদনাদায়ক। তিনি বলেন যে, আপনারা ভাবতে পারেন যে, একটি জাতিগোষ্ঠী যারা প্রথম থেকেই উদ্বাস্তু দরদী, তাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহনশীল ছিলো, তারা স্বভূমিতে অন্যায়ভাবে সর্বত্র ছিন্নভিন্ন সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। ভোটের রাজনীতিতে স্বপ্রাধান্য রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি সজ্ঞানে পরিকল্পিতভাবে উদ্বাস্তুদের আগমনকে বাস্তবায়িত করেছেন। পশ্চাদপদ উপজাতি সমাজের বিকাশ, স্বার্থ, তাদের প্রক্ষোভের কথা কিছুমাত্রও চিন্তা করেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা এই পুনর্বাসনের পাশাপাশি যথাযথ আন্তরিকতায় তাদের অর্থনৈতিক জাগতিক উন্নতিকে নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, তাদের প্রতি কোন মানবিক দায়িত্বই পালন করা হয় নি। তিনি বলেন যে, ১৯৬৪ সালে ঢেবর কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিলো যে ত্রিপুরায় আর পুনর্বাসন সম্ভব নয়। পুনর্বাসনের মাত্রা সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

কিন্তু এই রিপোর্ট সত্ত্বেও ত্রিপুরায় শাসক সম্প্রদায় বৃহত্তর মানবিক কল্যাণ, পারস্পরিক মৈত্রী প্রীতির সম্পর্ক, সহজ সুস্থ বাতাবরণকে জলাঞ্জলি দিয়ে পাঁচ বছরের গদী দখলের ক্ষুদ্র স্বার্থে ক্রমাগতই অবৈজ্ঞানিকভাবে বহিরাগত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দিয়ে গেছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুখের ভাষা, জীবন জীবিকা প্রতিষ্ঠার কথা কেউ গুরুত্ব দিয়ে ভাবেন নি। এই অন্যায় কাজের ফলে চাপা ক্ষোভ উগ্রপন্থায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮০ সালে দাঙ্গার পর তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দীনেশ সিংহ কমিটি দাঙ্গাদীর্ণ ত্রিপুরা পরিদর্শন করে এক রিপোর্ট পেশ করেন। তাতে রাজ্যের শাসক এবং প্রশাসনের প্রতি কিছু নির্দেশনামা ছিলো। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং স্থায়ী শান্তির জন্য কিছু প্রস্তাব রাখা ছিলো। এগুলোর প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিয়ে কার্য রূপায়ণ না করে এগুলোকে হিমঘরে ফেলে রাখা হয়েছে বলে ডঃ কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী ক্ষোভ জানান।

আরেক জন বক্তা বলেন যে, স্বাধীনতার পর থেকেই সংহতির নামে আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের উপর কিছু একপেশে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। উপযুক্ত এবং ক্রমবিকাশশীল জাতিগোষ্ঠীর বিকাশের ধারায় তাদের মানসিকতা আশা আকাঙ্ক্ষা বৈচিত্র্যকে সম্মান দেয়া উচিত ছিলো। উচিত ছিলো তাদের আত্মবিকাশের ধারায় তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা — অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করা এবং অবশ্য গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত করা।

পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী বৃহৎ শাসক গোষ্ঠীর অংশীভূত না হয়েও বাইরে থেকে বন্ধুত্বভাবাপন্ন হতে পারে। এটা তাদের চিন্তনীয় বিষয় এবং স্বাধীনতার ব্যাপার।

এভাবে বেশীরভাগ বক্তাই উপজাতি অংশের মানুষের প্রতি অবহেলা, বঞ্চনা এবং কর্তব্যে অবহেলাকে উগ্রপন্থার প্রাথমিক কারণ বলে অভিহিত করে আই.এস.আই. এবং সি.আই. এর ষড়যন্ত্রমূলক উস্কানীকে দ্বিতীয় কারণ বলে বর্ণনা করেন। তৃতীয় কারণ হিসাবে

রাজনৈতিক দল এবং সহযোগী পত্রিকা গোষ্ঠীর উস্কানীকেও তারা কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

এখন আমাদের ভাবতে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আমাদের সাধারণ মানুষের বিশেষতঃ মানব কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থাগুলির কী করণীয়, কতটা তারা করতে পারেন।

এসব ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে অবশ্যই সারা দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পরবর্তী ধাপে রাজ্য সরকারের সক্রিয় ভূমিকা রয়ে গেছে। এইসব দায়দায়িত্ব পালনে রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন হস্তক্ষেপে ঘটনার জটিলতা দায়িত্বপালনে বাধা সৃষ্টি করে আরোই জটিলতা বাড়ায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে মানবিকতা থাকা অবশ্যই উচিত বলে আমরা গণ্য করলেও, বাস্তবে তা ঘটে না। মানবিকতা বিসর্জন দিয়েই ক্ষুদ্র স্বার্থে মানব কল্যাণকে তুচ্ছ করে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলে।

এক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত করা দরকার। কোনটা মিথ্যা, কোনটা বাস্তব, সত্য তথ্য কি তা বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে আবিষ্কার করে চিনে নেয়া দরকার। তাহলে সেক্ষেত্রে গুজব মিথ্যা প্রচার মানুষকে বিভ্রান্ত উত্তেজিত করে অযথা দাঙ্গামুখী করতে পারে না।

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের বিভিন্ন অবস্থা ভেদে বিভিন্ন মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করা রয়েছে। তপশীলি জাতি এবং উপজাতিদের পশ্চাদপদতার জন্য শিক্ষা এবং জীবিকার ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে। এগুলি যত তাড়াতাড়ি উঠে যায় তত ভাল। তবু যতদিন না সকল শ্রেণীর মধ্যে সঠিক সমতা আসে, ততদিন একে তুলে নেয়া মানবিক বা বুদ্ধির কাজ হবে না। কাজেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। সংরক্ষণ কেন কি কারণে এবং সেটা জেনে নিয়ে জনসাধারণকে সংরক্ষণ বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার কথা বলতে হবে।

ইদানীংকালে পত্রপত্রিকায় সংরক্ষণ কোটা সিস্টেম ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য দেয়া হচ্ছে না। এস.সি, এস.টি-রা সব চাকরি নিয়ে যাচ্ছে বা স্পেশাল ডাইভে তাদের প্রমোশন হয়ে যাচ্ছে — একথা সঠিক নয়। প্রচুর সংরক্ষিত পদ পড়ে থেকে যোগ্য প্রার্থীর অভাবে অসংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। কারণ উপযুক্ত সাহায্য সহযোগিতার অভাবে পিছিয়ে পড়া অংশ উপযুক্ত হয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। ফলে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা খুব কম অংশেই নিতে পারছে।

এসব বিষয়ে বিস্তৃত পরিসংখ্যান মেলে না। এগুলোর জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কাজ করতে পারে। এখন পর্যন্ত উপজাতি সমাজের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা পরিসংখ্যান লভ্য নয়।

এদের জন্য শিক্ষা, পুনর্বাসন (যেমন ডুম্বুর প্রজেক্টে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের) ইত্যাদির চেষ্টা করতে হবে। প্রকৃত অভাবী বা সাহায্য সহযোগিতার উপযুক্ত ব্যক্তিরা যেন সেটা ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ তাহলে দুটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক

স্বাভাবিক হয়ে আসবে। দীর্ঘকাল সাংবিধানিক অধিকারসমূহকে একপাশে ফেলে রাখার মতো ভুলভ্রান্তিতেই একটি শ্রেণীকে বিভ্রান্তি ও উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এগুলো মিলিটারী শাসনে, দমন-পীড়নে থামবে না। এদের জন্য একমাত্র স্নেহ মমতা সহযোগিতার হাত এবং সুস্থ স-সম্মান আলাপ আলোচনাতেই সঠিক পথে আনা যাবে।

একই সঙ্গে উগ্রপন্থার প্রতি নিন্দা ও ভর্ৎসনাকেও আন্দোলনের স্তরে নিয়ে গিয়ে তাদের গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। ফলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজ হবে জনমতকে যুক্তিবাদী, সংবেদনশীল করে তোলা এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে এই হিংসা উগ্রবাদকে জনবিচ্ছিন্ন করে রোখা।

কিছুদিন আগে কল্যাণপুর অঞ্চলে সাদা পোষাকে দু'জন সি.আর.পি.এফ-এর একটি গাড়িকে দাঁড় করানোর চেষ্টা এবং নির্দেশ অমান্য করায় আগ্নেয়াস্ত্র বার করে গাড়িটি দাঁড় করানোর ঘটনাকে 'কারফিউ'-র মধ্যেও উগ্রবাদীদের আক্রমণ বলে ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এসব ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করে সম্ভাব্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা রুখতে পারে।

নিরপেক্ষ একটি পত্রিকা বের করে প্রকৃত ঘটনাকে জনসমক্ষে বিচারের জন্য তুলে ধরতে পারে। ১৯৮০ সালে 'আগামী' পত্রিকার বলিষ্ঠ ভূমিকা এবিষয়ে উল্লেখ্য।

এইসব উগ্রবাদের পিছনে রাজনৈতিক মদত, বিদেশী হস্তক্ষেপ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উস্কানী রয়েছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী আলজিরিয়ার ঘটনাব সঙ্গে কল্যাণপুর ঘটনার একান্ত মিল রয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৫০ জনের দল একটি গ্রামে প্রথমে ঘিরে ফেলে ঘরে ঘরে আগুন দিয়ে পরে লোকগুলিকে নৃশংসভাবে গুলি করে, ছুরি মারে।

এইসব উগ্রবাদীদের চিহ্নিত করে তাদের বিচার ব্যবস্থার হাতে তুলে দিতে জনমতের চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

এইসব উগ্রবাদীরা এখন নাকি ভুটানে ঘাঁটি গাড়তে চাইছে। আলাদা রাজ্য গড়ার জন্য আরো শক্তিশালী দল এমনকি নারী বাহিনীও গড়ার জন্য চেষ্টা নিচ্ছে। এইসব ধ্বংসাত্মক পথে কোনদিনও আলাদা রাষ্ট্র গড়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসীর বিচ্ছিন্ন প্রগতি উন্নতি আসবে না। কারণ আজ আমরা সবাই আলাদা রাজ্য নয়, এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছি এবং সেটা খুব বাস্তবসঙ্গত কারণে। কাজেই এধরণের কাঁচা অস্তিত্বের বিভ্রান্তি — শুধু আত্মধ্বংসের পথ প্রশস্ত করবে। এসব পথ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

অনেকেই বলেন, উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা হোক, মিলিটারী শাসন হোক, রাষ্ট্রপতি শাসন হোক। কিন্তু এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না এবং এগুলো কোন সুস্থ নিয়ম নয়। এগুলোতে সুবিধার চাইতে অসুবিধার মাত্রা আরো বাড়ে। মানবাধিকার ভূলুন্ঠিত হয়। সাধারণ নিরীহ মানুষ বিপর্যস্ত হয়। এতে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। এ নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো জনমত গড়ে তুলতে পারে।

পিছিয়ে পড়া জাতি উপজাতিদের আর্থিক স্বয়ম্ভরতার জন্য কার্যকরী কার্যপদ্ধতি নেয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো বিশেষ জোর দিতে পারে। তবে সবচেয়ে যেটা বেশী জরুরী সেটা হচ্ছে, মানসিক প্রক্ষোভগুলি দূর করে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে উদ্ধার করা এবং তা স্থায়ী করার জন্য নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচী, আলাপ আলোচনা, সভা, উপজাতি সমাজের ভাষা শিক্ষা এবং সেটা চর্চার প্রসারে উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসা।

একে অপরের প্রতি অশ্রদ্ধা ঘৃণার উক্তি করা — তুলনায় অন্য কাউকে ঘৃণাভাব প্রদর্শন করা, এসব ক্ষতিকর পদক্ষেপ অশিক্ষিত এমনকি শিক্ষিত সমাজেও দেখা যাচ্ছে। এসব বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি জনশিক্ষার ভূমিকা নিতে পারে।

শেষ কথা এটাই যে উগ্রপন্থা, হিংসাবাদকে শুধুমাত্র বাইরে থেকে বিচার না করে তার নাড়ির গতিকে বুঝে নিতে হবে এবং এ বিষয়ে নির্ভীকতার সঙ্গে সমস্যায় আঘাত করতে হবে। এড়িয়ে গেলে বোধহয় চলবে না।

নব উদ্যোগে মহিলা সংযুক্তি ঃ প্রেক্ষিত ত্রিপুরা

স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই, বলা চলে ভারতের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই প্রাকৃতিক দুর্গমতা, যোগাযোগহীনতা, ভাষার দুর্বোধ্যতা এবং জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার দরুণ সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাকি ভারতবর্ষের কাছে প্রায় অজ্ঞাত এবং অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের সময় কিছু কিছু সমীক্ষা, কিছু ভ্রমণ এবং মিশনারীদের প্রচেষ্টায় তাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য বৃহত্তর জগতের কাছে পৌঁছতে পেরেছিল।

রামধনুর মত সাতটি বৈচিত্র্যপূর্ণ রঙে রঙীন, উজ্জ্বল সাতটি পার্বত্য রাজ্য নিয়ে গঠিত উত্তর পূর্বাঞ্চল আমাদের দেশে এক অমূল্য সম্পদ এবং গর্বের বিষয়। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক এবং জীব জগতের এত সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে যা প্রকৃতিপ্রেমী এবং ভ্রমণপিপাসু মানুষের কাছে দুর্বার আকর্ষণ হতে পারে। অসাধারণ অরণ্য সম্পদেও এ অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

তবু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও দেশের নেতা এবং শাসকগণ সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথা দরদ দিয়ে ভাবেন নি। বরং তাদের সম্পদ নির্বিচারে শোষণ করা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। আসামের পেট্রোলিয়াম আসামে শোধন না করে সুদীর্ঘ পাইপ লাইনে বহুদূরে বিহারের বারুণীতে নিয়ে শোধন করা হয়েছে। এইসব অঞ্চলের মানুষের জন্য চাকরী, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পরিকল্পনামাফিক ভেবে নিয়ে সেটা কার্যকরী করা হয়নি। দিনে দিনে এ অঞ্চলের মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর, শ্রীহীন, নিজস্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে বঞ্চিত, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

এভাবে সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল অগ্নিগর্ভ হয়ে আজ বৃহত্তর শান্তি ও প্রগতির পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে রুষ্ট যুবগোষ্ঠী নিজেদের জীবন শুধু নয়, সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে শান্তি সম্প্রীতিকে বিপন্ন করেছে।

এই পরিস্থিতির শুরুতেই যদি সরকার সময়োচিত ব্যবস্থা নিতেন তবে অবস্থা এত গুরুতর হতো না। এ ব্যাপারে প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলো হাল্কা এবং বাস্তববিমুখ ছিল। একেবারে উপরের তলার নেতা, প্রশাসক, পরিচালক উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভ্রমণে খুব কমই এসেছেন।

অনেকেই আসবেন এ ঘোষণা দিয়ে পরবর্তীকালে আসেন নি। যদি কেউ এসেছেন কখনো তবে তা প্রায়ই আনুষ্ঠানিক বা প্রমোদ ভ্রমণের মত আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠানে শেষ হয়েছে। কোন সমস্যা সমাধানে বিশেষ তৎপরতা বা আন্তরিকতা দেখানো হয়নি। বহু প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন পরবর্তীকালে বাস্তবে রূপায়িত হয় নি, হলেও তা সুদীর্ঘ সময়ে চলতে থাকায় গুরুত্ব নষ্ট হয়ে গেছে।

১৯৯৫ সালে গৌহাটিতে 'North-East India and 21st Century' সেমিনারে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি পি.এন. ভগবতী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বিস্ময় এবং দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে এখনো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজধানীগুলো পর্যন্ত ভালো মোটরগাড়ি চলাচলের রাস্তা বা এরোপ্লেনের উড়ান ব্যবস্থায় একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য বিভিন্ন উন্নতির ক্ষেত্রে এরা এত পিছনে যে ভাবা যায় না।

আসলে কোথায় ত্রিপুরা, কোথায় নাগাল্যান্ড, কোথায় অরুণাচল, কার কি ভাষা কি পোষাক কি খাদ্য এসব আমরা বা বৃহত্তর ভারতবাসী প্রায় কিছুই জানি না। ত্রিপুরা কি আসামে? বহু দিল্লী বা বোম্বেবাসী এমন প্রশ্ন করে থাকেন।

এই করুণ অবস্থায় হঠাৎ আমাদের আকাশে সৌভাগ্যের নূতন সূর্যোদয় ঘটলো। ভারতের একজন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী এইচ. ডি. দেবগৌড়া ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে প্রথমবার সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং গুরুত্বের সঙ্গে ভ্রমণ করে তার অভাব অভিযোগ, তার প্রগতির পথে বাধা এবং জনসাধারণের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝবার জন্য প্রায় সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলে খুঁটিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। এজন্য তিনি বিস্তৃত ভ্রমণ করেছেন।

২৭শে অক্টোবর তিনি লিখিত আকারে তাঁর বক্তব্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষ নূতন উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আমি খোলা মনে এসেছিলাম এ অঞ্চলের লোকজন, তাঁদের মানসিকতাকে বুঝতে এবং আমি ফিরে যাচ্ছি খুব সুন্দর স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, আমি স্থির নিশ্চিত যে আমরা সবাই একযোগে কাজ করে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারলে সব সমস্যার সমাধান করা যাবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষত আসামের বিরাট অর্থনৈতিক উন্নতিব সম্ভাবনা ও তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে, বর্তমানের অশান্ত পরিবেশের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে বাইরে থেকে অর্থলগ্নী করা যাচ্ছে না। এখন সমস্ত রাজ্যেই সরকারী চাকুরী প্রধান হয়ে আছে। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন চলবে না, তাই নানাভাবে আর্থিক উন্নতির সুযোগ দেখতে হবে। শান্তি এবং প্রগতির জন্য আমরা চেষ্টা চালাবো এবং এ অঞ্চলের আদিবাসীদের নিজস্ব পরিচিতি বিলুপ্তির যে ভয় আছে তাকেও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চল থেকে দূর করা হবে। সে সঙ্গে তিনি যে উগ্রপন্থা এবং হিংসা চলছে তাকে দূর করতে কঠোর হাতে দমন করবেন, তা ঘোষণা দেন।

বহুদিনের পুরনো পড়ে থাকা কাজকর্মকে ত্বরান্বিত করতে এবং ন্যূনতম পরিষেবা ব্যবস্থা কার্যকরী করার পথে কি কি অন্তরায় আছে তা খতিয়ে দেখতে তিনি একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করে দেন।

চেয়ারম্যানের নামানুসারে সে কমিশন শুক্লা কমিশন নামে পরিচিত হয়েছে। শিক্ষিত বেকারদের চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ কমিটি গঠনের কথাও ঘোষিত হয়েছে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রককে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য তাদের বাজেটের শতকরা ১০ শতাংশ ভাগ বরাদ্দ করতে তিনি বলেছেন।

তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হচ্ছে — কেন্দ্রের মন্ত্রী, সেক্রেটরী বিশেষভাবে যাঁরা রেলওয়ে পেট্রোলিয়াম, বিমান পরিষেবা, পর্যটন, জলসম্পদ ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত তাঁরা নিয়মিত এসে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচীব রূপায়ণ ব্যবস্থাকে সমীক্ষা করে ও সংশোধন করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কার্যকরী করবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব পরিকল্পনার কাজ চলছে, যেমন রেলওয়ে, বিদ্যুৎ — এগুলোকে কেন্দ্র থেকেই পূর্ণ আর্থিক অনুদানে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কেন্দ্রীয় বিভাগ মন্ত্রক. প্ল্যানিং কমিশন এবং ক্যাবিনেট, সেক্রেটারিয়েট নিয়মিত খোঁজখবব এবং পরিদর্শন কববেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যারোধে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া, জলসম্পদের ব্যবহার, জলপথে যোগাযোগ এবং বাণিজ্যের সম্প্রসাবণেব কথাও বলা হয়েছে। নূতন শিল্পনীতি এবং জনগণকে জড়িত করে কাজকর্ম ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকবণের কথাও বলা হয়েছে। পর্যটন শিল্পের উন্নতি এ অঞ্চলের জন্য আরেকটি ঘোষণা। সীমান্ত সড়ক এবং সীমান্ত উন্নয়ন, টেলিকম্যুনিকেশান, ইলেকট্রনিক মিডিযার প্রসারণ (যাতে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, অরুণাচলের পরিকল্পনাতেই পুরো অন্তর্ভূক্তি হয়). সহজ ঋণদানের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বিশেষ সেল খুলে একজন ডেপুটি গভর্নরের নিযুক্তি এ অঞ্চলের জন্য, বিশেষ রপ্তানী নীতির জন্য কমার্স মিনিস্ট্রিকে নির্দেশ. রেলওয়ে সার্ভিসের উন্নতি এবং ড্রাগস বা নেশা বন্ধের জন্য উপযুক্ত উদ্যোগ — উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একগুচ্ছ আর্থিক প্রকল্পের ঘোষণা দিয়ে শুক্লা কমিশনকে এগুলির বাস্তব রূপায়ণের দিক খতিযে দেখতে বলেন।

দেবগোড়াজীর ঘোষণায় প্রত্যেকটি রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদাভাবে এবং রাজ্যগুলির প্রয়োজনানুসারে উন্নয়ন-প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। অন্য রাজ্যগুলির কথায় আমাদের এই মুহূর্তে আলোচনার অবকাশ নেই। আমাদের ত্রিপুরার জন্য যেসব প্রস্তাব রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) কুমারঘাট থেকে আগরতলা রেলওয়ে লাইন স্থাপন -- আনুমানিক বায় ৫২ কোটি টাকা। নবম পরিকল্পনায় প্রত্যেক বছরে এজন্য টাকা দেয়া হবে এবং নবম পরিকল্পনাতেই একাজ শেষ হবে বলে আশা করা হয়েছে।

(২) ২ ব্যাটেলিয়ান ইন্ডিয়া রিজার্ভ ফোর্স নিয়োগ — আনুমানিক ব্যয় ১০ কোটি টাকা।

(৩) আগরতলা বিমানবন্দরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। আনুমানিক ব্যয় ৩৪ কোটি টাকা।

(৪) একটি এল.পি.জি. গ্যাস বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন — আনুমানিক ব্যয় ১৫ কোটি টাকা। (মন্তব্য — ত্রিপুরায় এ কাজ হয়ে গেছে)

(৫) একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেক্টর স্থাপন — কেন্দ্রের ভর্তুকী ১০ কোটি টাকা। (সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী খয়েরপুরে এর উদ্বোধন করেছেন)।

(৬) আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উন্নতি। আনুমানিক ব্যয় ৬০ কোটি টাকা।

এগুলোর রূপায়ণের বিষয়ে খতিয়ে দেখতেই শুক্লা কমিশন তৈরী হয়েছে। "Transforming the North-East tackling back log in basic minimum service and Infrastructural Needs" নামে শুক্লা কমিশনের প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিচারে ২৭টি ক্ষেত্রে ১৭৩টি সুপারিশ বিস্তৃতভাবে বিরাট এক বইয়ে রাখা হয়েছে।

দেবগোড়াজীর গুচ্ছ প্রকল্পের সঙ্গে এই ১৭৩টি সুপারিশ মিলিয়ে একে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শুভ উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের জন্যই এতে নানা প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এইসব উন্নতিতে প্রাথমিকভাবে রেলওয়ে লাইন, রাস্তাঘাট, জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ বা উন্নতি, এয়ারপোর্টের নবীকরণ, এল.পি.জি. বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন, শান্তি রক্ষার জন্য অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সবকিছু সমর্থিত হয়েছে।

এছাড়াও ক্ষেত্র ভেদে বিভিন্ন রাজ্যে খেলাধূলার উন্নতি, হাইড্রোইলেকট্রিক প্রোজেক্ট, হাসপাতাল পয়ঃপ্রণালী, মেডিক্যাল কলেজের উন্নতি, বায়োডাইভার্সিটি সমীক্ষা শিক্ষাকেন্দ্র এবং কোথাও অ্যাসেম্বলি হল স্থাপনের কথা ঘোষিত হয়েছিল।

এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরায় ইতিমধ্যেই রেলওয়ে লাইনের জন্য সমীক্ষা চলছে এবং গ্যাস বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়ে গেছে।

এই ধরনের উন্নতির ঘোষণা কিছু কিছু অতীতেও হয়েছে কিন্তু এখানে মস্ত বড় পার্থক্য এই যে এবার এইসব কাজের জন্য সরেজমিন তদন্ত, অগ্রগতি, নিয়মিত পরীক্ষা, সমীক্ষা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের তদন্ত, পর্যবেক্ষণ এগুলো অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে। এগুলি বহুদিনের অবহেলিত, বঞ্চিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের জীবনে নূতন আশার আলো জ্বেলেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এতসব উৎসাহ উদ্দীপনামূলক ঘোষণাবলীর মধ্যে এ অঞ্চলের বৃহত্তর মহিলা সমাজের (সাতটি রাজ্যেরই) উন্নতি বা জীবিকার জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থার

ঘোষণা দেওয়া হয়নি। অথচ সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কমবেশী মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় পুষ্ট উপজাতি জীবনে মহিলাদের অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ। এইসব উপজাতিজীবনে জুমচাষ প্রথা একদিন তাদের জীবনস্বরূপ ছিল। গান, বাজনা, নাচ, প্রেম, প্রীতি সবই জুমকে কেন্দ্র করেই উপজাতি জীবনে আবর্তিত হয়েছে।

আর এই জুম প্রথার প্রাথমিক পর্যায় জঙ্গল পরিষ্কার ছাড়া সবই মেয়েদের যত্ন এবং পরিশ্রমে গড়ে ওঠে। এছাড়াও হাটে মাঠে ধান রোযা, বাছা, ফসল কাটা, ঝাড়াই, মাড়াই সব পর্যায়েই মেয়েরা খুব বেশী সংশ্লিষ্ট থাকে। সাংসারিক কাজকর্ম যেমন রান্নার কাঠ যোগাড় জল তোলা, তরি-তরকারি উৎপাদন করা সবকিছুতেই মেয়েদের ভূমিকা প্রধান।

উপজাতি জীবনের আরেকটি বড় অধ্যায় বস্ত্র বয়ন। সে বিষয়েও মেয়েদেরই প্রাধান্য। প্রতিটি মেয়েকে প্রায় আবশ্যিকভাবে বস্ত্রবয়ন জানতে হয়। কাজেই উপজাতি সমাজে মেয়েদের উন্নতি বা অগ্রগতিকে বাদ দিয়ে কোন সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্ভব নয়।

এছাড়া স্ত্রীপুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসেই সামাজিক জীবন বয়ে চলেছে। সর্বভারতে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা আজ ৯৩২। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এ হার বেশী। ত্রিপুরাতে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৪৫। সর্বভারতের হারের তুলনায় এ হার খুবই সন্তোষজনক। তবু আমাদের এই ছোট্ট পার্বতী ত্রিপুরায়, যেখানে আমরা ভারতের এক প্রান্তে পড়ে রয়েছি, যার তিনদিকে বিদেশ বা বাংলাদেশ, অন্য দিক আসামের এক অংশের মাধ্যমে যুক্ত রয়েছি ভারতের সাথে। যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে খুবই ব্যয়সাধ্য এবং অসুবিধাজনক। আকারে আয়তনে আমাদের জায়গা মাত্র দশ হাজার চারশো একানব্বই বর্গ কিমি যা পশ্চিম বাংলার অনেক জেলার চাইতেও ছোট। দেশ বিভাগের ফলস্বরূপ। যেখানে রয়েছে জনসংখ্যাধিক্য, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা সেখানে শিক্ষা সাক্ষরতার হার সর্বভারতীয় হারে একটু বেশী হলেও, নারী-পুরুষের গড় হার সন্তোষজনক হলেও এখানে রয়েছে অনেক সমস্যা, যার সমাধানের উপর নির্ভর করছে আমাদের সঠিক উন্নয়ন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে আমাদের গুরুত্ব অন্যরকম। এখানে রয়েছে আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির জীবনধারা, উপজাতি অনুপজাতির বাসভূমি। যেখানে উনিশটি উপজাতি তাদের ভাষা, সংস্কৃতির বিভিন্নতা নিয়ে বাস করছে উন্নততর শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতির পাশাপাশি।

এখানে উপজাতির মত অনুপজাতির মহিলাদেরও রয়েছে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা স্বাস্থ্যের সমস্যা শিক্ষার সমস্যা। তাদের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পটভূমি নেই কলকারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নেই বলে এ রাজ্য সরকারী চাকুরিই আর্থিক সমস্যার ক্ষেত্রে একমাত্র ভরসাস্বরূপ। বত্রিশ লক্ষ মানুষের বাসভূমি ত্রিপুরায় রয়েছে প্রায় দুই লক্ষ কর্মচারী। অর্থাৎ জনসংখ্যার বিচারে প্রতি ২৪ জন মানুষে ১ জন কর্মচারী। বিধিবদ্ধ বেকারের

সংখ্যা এ রাজ্যে ৩ লক্ষ, তার মধ্যে মহিলা বেকারের সংখ্যা ৮০ হাজারের মত। ক্রমশ সরকারি চাকরির সুযোগ সুবিধা আজ এত সীমাবদ্ধ হয়ে উঠেছে যে তা থেকে সমস্যার সমাধান সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ পরিবহন ব্যবস্থার বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে প্রাথমিক বিচারে সংখ্যার হিসাবে এইসব পরিষেবা ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। কিন্তু গুণগত মানের বিচারে এইসব ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই বহু ত্রুটি যুক্ত। সেখানে যেমন সংশোধনের জন্য বাড়তি অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন তেমনি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে প্রতিটি পরিষেবা ব্যবস্থাতেই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

শিক্ষার ব্যাপারটা আলোচনা করলে আমরা দেখবো যে ত্রিপুরার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব কম না হলেও উপজাতি জনগণের মধ্যে সাক্ষরতার হার তুলনামূলকভাবে খুবই কম। এর মধ্যে উপজাতি মেয়েদের শিক্ষার হার ২৭ শতাংশ। শতকরা ৭৩ শতাংশই নিরক্ষর। শিক্ষার হার কোন কোন অঞ্চলে শতকরা ১২ শতাংশ। তবে সার্বিকভাবে শিক্ষার হার বিচার করলে, কেরালা (৮৯.৮১%)-র পর মিজোরাম (৮২.২৭%) এবং ত্রিপুরা (৬০.৪৪%)। এরাজ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৭৩.৫৮ %, মেয়েদের ৪৯.৬৫%। ভারতীয় চিত্রপটে এজন্য আমরা গর্ববোধ করলেও বিরাট সংখ্যক ড্রপ আউট বা স্কুল-ছুটের সমস্যার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন।

সারা ভারতে স্কুল-ছুটের হার ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া প্রতি ১০০ ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৩৫ জন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত টিকতে পারে। ৬৬ শতাংশ অনেক আগেই অর্থনৈতিক বা অন্য কারণে লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়। আমাদের ত্রিপুরাতেও এই হার সব চেয়ে উদ্বেগজনক। (৯০ শতাংশ) উপজাতী ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে। বিশেষ করে ১৯৯৬ সালে ত্রিপুরার প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০২৬, উচ্চ বুনিয়াদী ৪৩৭, উচ্চবিদ্যালয় ৩৫০ এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ১৬৮। ড্রপআউট বা স্কুল-ছুট সংখ্যা ত্রিপুরায় প্রাথমিক স্তরে ৫৫.৫১ শতাংশ এবং মাধ্যমিক স্তরে ৭৪.৩৪। উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে এই হার সর্বস্তরেই বেশী। তবে সার্বিকভাবে স্কুল-ছুটের হারে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী।

এ বিষয়ে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন হাজিরাকে নিশ্চিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৮ দিন উপস্থিত থাকলে ছাত্র-প্রতি মাসে ৫ কেজি চাউল দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বইপুস্তকের জন্য সাহায্য, স্কুলের পোষাক (ছাত্রীদের জন্য) ইত্যাদি বাবদ উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। তা সত্ত্বেও মাধ্যমিক পর্যন্ত গিয়ে তাদের ক্ষেত্রে স্কুল-ছুটের সংখ্যা ৯০-৯১ শতাংশ হয়ে যাচ্ছে।

এই স্কুল-ছুট হওয়া এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার হারের পিছনে রয়েছে প্রাথমিকভাবে আর্থিক সমস্যা, দ্বিতীয় কারণ ভাষা সমস্যা, স্টাইপেন্ড ইত্যাদি নিয়মিত মাসে মাসে সঠিক সময়ে পেলে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হত। ককবরক ভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের অন্য ভাষায় পড়তে গেলে মনোযোগ উৎসাহ ঠিকমতো হয়না, সেজন্যও তারা পড়া ছেড়ে

দেয়। বাড়িঘরে তাদের পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করার মতো লোক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নেই বলে ব্যাপারটা আরো সমস্যাপূর্ণ হয়ে যায়।

অ-উপজাতি মেয়েদের ক্ষেত্রে একমাত্র ভাষা সমস্যা ছাড়া অন্যান্য সব সমস্যাই এক। দরিদ্র নিম্নবর্ণের শ্রেণীতে আর্থিক সমস্যার দরুণ এবং বাড়িঘরে সাংসারিক কাজে সাহায্য সহযোগিতা দেয়ার প্রয়োজনীয়তায় মেয়েরা প্রথম অনিয়মিত হয়ে পড়েএবং পরে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব, স্কুলে টয়লেটের জায়গার অভাবও মেয়েদের আরেকটি অসুবিধার কারণ। প্রাকৃতিক কারণেই মেয়েদের প্রতি মাসে যে অসুবিধা দেখা দেয় সেজন্যও স্কুলে যথাযোগ্য বন্দোবস্ত থাকা দরকার। দরকার পানীয় জল এবং টয়লেটের ঘরে জল থাকা। এসব অসুবিধাগুলি সামান্য মনে হলেও এগুলোও খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং সংশোধনযোগ্য।

একশো বছর আগে যেখানে মেয়েদের সাক্ষরতার হার সারা ভারতবর্ষে ছিল মাত্র ০.৬৯ শতাংশ, সমস্ত দেশে স্কুল-কলেজের সংখ্যা হাতে গোণা যেত, সেখানে ১৮৯৪ সালের ৯ এপ্রিল ত্রিপুরাব মহারাণী তুলসী বতী একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন যা প্রথমে পাঠশালা (১৯০১), পরে হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত হয়েছে। ১৯৩১ সালে যে কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু হয় সেগুলো হচ্ছে উমাকান্ত একাডেমী, বোধজং স্কুল, তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়।

১৯৪১ সালে তুলসীবতী হাইস্কুলে প্রথম ম্যাট্রিক পবীক্ষা হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৯৫২ সালে হয় বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। এত কথা উল্লেখ করতে হলো এজন্য যে, ত্রিপুরায় মেয়েদের শিক্ষা সাক্ষরতার হার যে বেশী তার পিছনে রয়েছে এই বিদ্যালয়ের অবদান।

কাজেই ত্রিপুরাকে উন্নত করতে গেলে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করে শান্তি. সম্প্রীতি, সংহতির পথে যেতে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে এবং এজন্য মাথা পিছু বেশী অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

এ বিষয়ে দুটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা বক্তব্যকে একটু জোরালো করতে পারে। আমেরিকার একটি মহিলা পত্রিকা Godays Ladies পত্রিকার সম্পাদিকা লিখেছেন, "To ensure good mothers there must be the means of a good education provided for young girls. Better leave the boy of generation without learning than the girls -- if one sex must be doomed to ingorance"-অর্থাৎ আদর্শ মার ভূমিকা নিশ্চিত করতে গেলে কিশোরী মেয়েদের আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যদি কোন এক শ্রেণীকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখতে হয় তবে এক পুরুষ (generation) বরং মেয়েদের চাইতে ছেলেদের অশিক্ষিত রাখা শ্রেয়।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, "The education of women is even more important than the education of men because each educated women influence the young generation and society in a very special way"- অর্থাৎ

ছেলেদের শিক্ষার চাইতেও মেয়েদের শিক্ষা বেশী দরকারি কারণ, প্রত্যেকটি শিক্ষিতা মহিলা তাঁর তরুণ প্রজন্ম এবং সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন।

কাজেই সাক্ষরতার হার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটু বেশী হলেও ত্রিপুরার মেয়েদের আদর্শ শিক্ষার জন্য এখনো চেষ্টা করতে হবে। কারণ, সমাজ উন্নয়নের চাবিকাঠি মেয়েদের হাতে এবং শিক্ষা তার হাতিয়ার।

এ রাজ্যে বর্তমানে বালোয়ারীর সংখ্যা ১.২২৪, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ২৪১৪, জুনিয়র বেসিক স্কুল ২,০৬৮, সিনিয়ার বেসিক স্কুল ৪৪২, হাইস্কুল ৩৫৩, হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল ১৬৮, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ২৫টি। সাধারণ মেধাবী তপশীলি জাতি, উপজাতি সব ধরণের ছাত্র-ছাত্রীরাই প্রাপ্য অনুসারে স্টাইপেন্ড পাচ্ছে। ১৯৯৫ ৯৬ সালে ৫,৪৭,৯৮৮ ছাত্রছাত্রী (সব শ্রেণীর) সরকারী স্টাইপেন্ড পেয়েছে। সাধারণ কলেজ রয়েছে ১৮টি, প্রফেশনাল বা বৃত্তিমুখী রয়েছে ১৩টি। একটি বিশ্ব বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তবু এরই পাশাপাশি রয়েছে পণপ্রথার অত্যাচার, বধূহত্যা, ধর্ষণ এবং খুন, রয়েছে ডাইনী সন্দেহে আদিবাসী সম্প্রদায়ে মহিলা হত্যা। কাজেই সঠিক চিন্তা চেতনা বিকাশের জন্য মেয়েদেব আরো সচেতন হতে হবে। আরো সংগঠিত আন্দোলন প্রয়োজন।

এ রাজ্যে স্কুল-ছুটের সংখ্যা কমাতে হবে বিশেষভাবে আদিবাসী মেয়েদেব জন্য উপযুক্ত প্রকল্প রচনা করতে হবে, শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। সরকারী ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এসব বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। স্কুল-ছুট মেয়েদের নিয়ে স্থানীয় আদিবাসী মহিলা সমিতির কনডেন্সড কোর্স পরিচালনায় সাফল্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মাধ্যমিকে তাদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল -ছুটদের সাফল্যের হার শতকরা ৭০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ হচ্ছে। এইসব প্রকল্পের জন্য নূতন কর্মকান্ডে বেশীভাবে বরাদ্দ রাখার জন্য মেয়েদের আবেদন রাখতে হবে।

স্বাস্থ্য

মহিলাদের হীন স্বাস্থ্য ও অপুষ্টির জন্য সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে ভর্ৎসনা করেছে। বলেছেন এশিয়াতে মেয়েদের একই হাল। এ অঞ্চলে মেয়েরা অনেক বেশী নিগৃহীত হন। কন্যা ভ্রূণ হত্যার হার বেশী। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উপর অনেক কম নজর দেয়া হয়। মেয়েদের বাড়-বাড়ন্ত কম। রক্তাল্পতায় ৭০ শতাংশ মেয়ে ভোগে। ৯২ শতাংশ নানা স্ত্রী রোগে ভোগেন। তিনজন মহিলা পিছু মাত্র একজন যত্ন পান। যৌন রোগের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে।

ত্রিপুরাতেও মেয়েদের হীন স্বাস্থ্য বিশেষভাবে নজরে পড়ে। এবিষয়ে কেউ বলতে পারেন যে পুরুষদেরই আর কত ভাল স্বাস্থ্য। এ বিষয়ে সাধারণভাবে দারিদ্র্যকে দায়ী করে উত্তর দিলেও তবু বিশেষভাবে বলতে হবে যে সন্তান ধারণ, পালন রক্ষণের কাজটা কিন্তু মেয়েদেরই করতে হয়। ভাবী সুনাগরিকের জননীর তাই স্বাস্থ্যবতী হওয়া প্রয়োজন। শুধু

যে অভাব দারিদ্র্যই এজন্য দায়ী, অনেক ক্ষেত্রে তা নয়। রোগ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে অজ্ঞানতা, পুষ্টি, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রা সম্পর্কে অজ্ঞতা মেয়েদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। সরকারেব দেয়া স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার সুফলকে গ্রহণ করার জন্যও সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

এরই পাশাপাশি সরকারী ব্যবস্থাতেও মেয়েদের জন্য পরিবার-পরিকল্পনা, শিশুর জন্য টিকা প্রকল্পগুলিকে যথাসম্ভব মেয়েদের ঘরেব দরজায় পৌঁছে দিতে হবে। স্বাস্থ্য মানুষের অস্তিত্বের প্রথম শর্ত। তাই শিক্ষাকে এ বিষয়ে এ উদ্দেশ্যেব অনুযায়ী হতে হবে।

ত্রিপুরার বর্তমানে উপজাতি সমাজে মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতা খুব চোখে পড়ে। এবিষয়ে শিক্ষার অভাব যেমন দায়ী তেমনি আর্থিক অনটন এবং কাজকর্ম এবং জুমের তরিতরকারী ফলমূলের অভাবে চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাসে ঘাটতি হওযাও অন্যান্য কাবণ। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জুমচাষের জমি কমে যাওয়ায় জুম চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। ত্রিপুরায় সমতল যোগ্য জমিও কম। মোট জমির এক-চতুর্থাংশ অংশে ভালভাবে চাষ সম্ভব। নদী নালা পর্যাপ্ত পবিমানে নেই বলে জল সেচের যেমন প্রচণ্ড অভাব তেমনি অভাব পানযোগ্য জলের। এখন পর্যন্ত মাত্র ১৩ শতাংশ জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এই ব্যবস্থাও তেমন ভালো নয়। সাবের ব্যাপাবেও ত্রিপুবায় প্রচণ্ড অভাব বয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সবকার ভর্তুকীতে সার দিচ্ছেন। সেটা খুবই সামান্য। জাতীয় কৃষিক্ষেত্রে যেখানে প্রতি হেক্টব জমিতে ৭০ কিলোগ্রাম সার ব্যবহৃত হয় সেখানে ত্রিপুবায মাত্র ২৬ কিলোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুবাতে ভালো বীজেব অভাব রয়েছে। যোগাযোগেব প্রচণ্ড অসুবিধাব জন্য উন্নতমানের বীজ এখানে আনা সর্বদা সম্ভব হয না। বলা হচ্ছে, আগামী নবম পবিকল্পনায় আরো ২০ শতাংশ জমিকে সেচেব আওতায় আনা হবে।

এই অবস্থায় যাবা টিলা এবং অনুর্বব ভূমিতে বসবাস কবছেন সেই উপজাতি সমাজেব শস্যোৎপাদন কবা খুবই কষ্টকব এবং ব্যযসাধ্য ব্যাপাব। জঙ্গল দ্রুত সাফ হয়ে যাওয়ায় তারা আজ আর তাদেব চিরকালীন প্রিয় খাদ্য বাঁশেব কড়ুল বা বনেব অন্যান্য শাক কচু লতাপাতা ও জোগাড় করতে পারছে না। তাছাড়া তাদেব খাদ্যাভ্যাসে অনেক পরিবর্তন এলেও এখনো তারা দুধ, দই বা ঘি খেতে অভ্যস্ত নয়। গৃহপালিত পশু পাখিদেব জন্য আহার্য জোগাড় করাও বেশীর ভাগের পক্ষেই আর্থিক দিক থেকে সহজ সাধ্য নয় বলে হাঁস, মুরগি, শুয়োর পালন কমে যাচ্ছে। সব মিলিযে উপজাতি সমাজে আগেব মত স্বাভাবিক তাজা খাঁটি খাদ্য মিলছে না। এজন্য সামগ্রিকভাবে তাদের স্বাস্থ্যেব অবনতি ঘটছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মেয়েদের স্বাস্থ্যের অবনতি খুবই চোখে পড়ে। ১৫ই আগষ্টে বা ২৬শে জানুয়ারীতে অতীতে আদিবাসী নৃত্য -প্রদর্শনে মেয়েদের সুস্বাস্থ্য, সৌন্দর্য একদিন চোখে পড়ার মত ছিল। আজ হীন স্বাস্থ্যের হাড়-গোড় বের করা মেয়েদের নৃত্য প্রদর্শনী দুঃখ জাগায়।

অশিক্ষা, অজ্ঞানতা এবং অভাব এখনো উপজাতি মেয়েদের প্রাথিত প্রগতির পথ

থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্যসম্মত চলাফেরা সন্তানধারণ এবং সন্তান পালনে বিজ্ঞান ভিত্তিক নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাবে আজ এরা নানা রোগের শিকার হচ্ছেন। খোস পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি চর্মরোগে অধিকাংশ লোক ভোগেন। এরই সঙ্গে রয়েছে কৃমিজনিত রোগ সমস্যা। উন্মুক্ত প্রান্তরে মল ত্যাগ করার ফলে. খালি পায়ে চলাচল করায়, বেশীব ভাগই হুকওয়ার্মে ভোগেন। অত্যন্ত পরিশ্রমী সমাজ বলে এখনো সভ্য সমাজের ডায়াবেটিস বা হার্টের রোগে না ভুগলেও অন্যান্য নিরাময়যোগ্য অসুখগুলিতে এরা এদের জীবনীশক্তি হাবাচ্ছেন।

এইসব কথাগুলি সমতলবাসী অ-উপজাতি মা বোনেদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। নিজেদের শরীরের দেহযন্ত্র তার কার্যকলাপ, মাসিক ঋতুচক্রের ব্যাপাব, গর্ভাধান বা প্রসবের ব্যাপার কোন কিছুতেই এদের ৮০-৯০ শতাংশ মেয়েরই কোন জ্ঞান নেই। সাহস করে এ বিষয়ে বলা চলে যে স্কুল কলেজেব মেয়েদেরও এ বিষয়ে কিছু সঠিক জ্ঞান নেই। এ বিষয়ে এখনো সংস্কার রয়ে গেছে।

অথচ একটি জাতি যদি সুস্বাস্থ্যে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হতে না পাবে তবে তাব পক্ষে অন্যান্য উন্নতিব বিষয়গুলিতে জোব দেয়া সম্ভব হয় না। আর স্বাস্থ্য শব্দটার শুরুই মাতৃগর্ভ থেকে জীবনব্যাপী। কাজেই মায়েদের রক্তাল্পতা ও অন্যান্য বিষয়ে লক্ষ্য দিতে হবে। কম ওজনেব শিশু জন্মের কারণেও শিশু মৃত্যু এবং শিশু পরবর্তীকালে নানা বোগ-শোকেব শিকার হয়ে থাকে। উপজাতি সমাজে যৌবনে বিয়ে দিলেও অ-উপজাতি সমাজে আজও ছোট ছোট নাবালিকা মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে। এজন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সামাজিক অবস্থান

পরিবারে এবং সমাজে মেয়েদের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করাব জন্য মা প্রথম অগ্রণী হবেন। এভাবে তাকে গুরুত্ব দিলে তার আত্মমর্যাদা এবং শক্তি বাড়বে। বিয়ের জন্য কনে তৈরীর লক্ষ্যকে দূরে সরিয়ে তাকে প্রথম মানুষ হিসাবে তৈরী করতে হবে। পরিবারের নানা বিষয়ে তার মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। কোন ভাবেই তাচ্ছিল্যপূর্ণ কথা বা আচরণ তার প্রতি করা ঠিক নয়।

মেয়ের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পণের প্রলোভনে বিয়ের ব্যাপারটিকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আজ বর্জন করা প্রয়োজন। মানুষের চোখে নিজেদের ঐশ্বর্য জাহির করার জন্য উপহারের প্রদর্শনী না দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী মেয়েকে অন্যভাবে সাহায্য বা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এতে একদিকে সমাজে উদগ্র অর্থের লালসা এবং নির্লজ্জ প্রদর্শনীর মনোভাব ক্রমশই কমে আসবে।

একদিন আদিবাসী সমাজে পণপ্রথা ছিল না। থাকলেও সেটা পাত্রপক্ষের দিক থেকে

সহজ এবং সাধ্যের মধ্যে দেয়া হতো কন্যা সন্তানের সম্মান স্বরূপ। এখন এ সমাজেও সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির জন্য লোভ এবং চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে যাদের এসব দেয়ার সাধ্য নেই তাদের মেয়েদের বিয়েতে সমস্যা হচ্ছে। সুস্থ সামাজিক জীবনে এই বিষয়টি ক্যান্সার রোগের মত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ছোট্ট ত্রিপুরায় পণের বলি হয়েছে বহু মেয়ে। সেই সঙ্গে আছে স্ত্রী পরিত্যাগ, নেশার বাড়াবাড়ি, স্ত্রী প্রহার। যার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহিলা কমিশন। মহিলা কমিশনকে যথার্থ শক্তিশালী করে তোলার জন্য আজ মেয়েদেরই চেষ্টা করতে হবে। সে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনে মেয়েদের সম্মান নিরাপত্তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। মেয়েদের জন্য মহিলা থানা, মহিলা পুলিশ-পোষ্ট স্থাপন করতে হবে। উগ্রপন্থী দমনের নামে সরাসরি মেয়েদের উপর অসম্মান অত্যাচারকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় ধরে নিয়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।

অপসংস্কৃতি ইভটিজিং

বর্তমান সিনেমাগুলির অশালীন দৃশ্য, চটুল গানের কলি সমস্ত শহরে গ্রামে ভদ্র সাংস্কৃতিক পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে। জাতীয় জীবনে যুব প্রজন্মের উপযুক্ত মানসিকতা না গড়ে উঠলে দেশ এগোতে পারেনা। এসবের ফলে মেয়েদের প্রতি পণ্য বা ভোগ্য মনোভাব গড়ে উঠছে যার ফল ইভটিজিং। পথ চলতি মেয়েদের উপর অশালীন মন্তব্য, ব্যবহার, কখনো অপহরণ, জোর করে বিয়ের অনুষ্ঠানের পর হস্তান্তর করে পতিতালয়ে প্রেরণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এসবের পিছনে রয়েছে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর নিন্দনীয় ভূমিকা। যারা নীলছবি (Blue film) তৈরী করে, ড্রাগস্ বিক্রী করে এবং ছেলেদের পাচারের কাজে লাগায়। এভাবে পরিবারের সুখ শান্তি, দেশের শৃঙ্খলা নষ্ট করে সমস্ত জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সংবিধান

এর সম্পূর্ণ কুফল ভোগ করছেন মেয়েরা। এসব কারণে আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলের মেয়েরা একজোট হয়ে প্রতিকার আন্দোলনে নামছেন। এখন তারা চাইছেন উৎপাদনের কাজে, চাকরি-বাকরিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও রাজনীতিতে মেয়েদের সার্থক ভূমিকা শোচনীয়। মিটিং-এ, মিছিলে, গঠনাত্মক ভূমিকায় মেয়েদের উপস্থিতি যতই অগ্রগণ্য হোক আসল ক্ষমতার ব্যাপারে তাদের সুযোগ সুবিধা, অবস্থান অনুল্লেখ্য। এব্যাপারে সমস্ত রাজনৈতিক দলের ভূমিকাই কমবেশী একরকম। এতদিন পরেও লোকসভাতে মেয়েদের সংখ্যা মাত্র ৭ শতাংশ, বিধানসভা গুলিতেও মেয়েদের উপস্থিতি খুবই কম। নির্বাচনের সময় তাদের সুযোগ সঠিকভাবে দেয়া হয় না। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাষ্ট্রযন্ত্রে তাদের ভূমিকা নগন্য। অথচ তাদের সংগঠনী শক্তি আন্তরিকতার যোগ্যতা মোটেই কম নয়। তবু সকল দলই নির্বাচনে মেয়েদের মনোনয়ন

কম দেন। জিতলে তাদের অ-প্রধান দপ্তর দেয়া হয়। ১৯৫২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত লোকসভায় নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সংখ্যা দেয়া হল।

সাল	আসন সংখ্যা	মনোনীত মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা	হার
১৯৫২	৪৯৯	২২	৪.৪%
১৯৫৭	৫০০	২৭	৫.৪%
১৯৬২	৫০৪	৩৮	৬.৭%
১৯৬৭	৫২৩	৩১	৫.৩%
১৯৭১	৫২১	২২	৪.২%
১৯৭৭	৫২৪	১৯	৩.৪%
১৯৮০	৫৪২	২৮	৫.১%
১৯৮৪	৫৪২	৪২	৭.৭%
১৯৮৯	৫৪৩	২৭	৪.৯%
১৯৯১	৫৪৩	৩৯	৭.১%

এভাবে বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ও লিঙ্গ বৈষম্যের পরিচায়ক। সুতরাং পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মহিলাদের নিজস্ব কথা আশা আকাঙ্খা পারিবারিক স্বার্থ সমৃদ্ধির বিকাশ ব্যহত হচ্ছে। সেজন্যই সংরক্ষণ প্রয়োজন। পঞ্চায়েত স্তরে মেয়েদের শতকরা ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ চালু হওয়ার সময়ও সমাজে বিদ্রূপ, উপহাস, বিপরীত মন্তব্য চালু ছিল। কিন্তু আজ নির্বাচিত মেয়েরা তাদের আন্তরিকতা এবং যোগ্যতায় প্রমাণিত করেছে যে তাদের জন্য এ সংরক্ষণ কতটা উপযোগী ছিল। এখন পঞ্চায়েত স্তরে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাওয়ায় বহু মহিলা নেত্রী তৈরী হয়েছেন। এছাড়া সাধারণ ভাবে নারী সমাজে উদ্যম তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। সঙ্কোচ দুর্বলতা সরিয়ে মেয়েরা আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। সমাজ পরিবারে মেয়েদের এ গুণ বিকশিত হলে পরের প্রজন্ম অবশ্যই উপকৃত হবে।

মেয়েদের বিভিন্ন অধিকার আইনকানুন

সাধারণভাবে মেয়েদের জন্য সংবিধানের মৌলিক অধিকার থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন আইন কানুন দেশে প্রচলিত রয়েছে। অবশ্য প্রতিটি আইনকেই বাস্তবায়িত করার পিছনে রয়েছে মেয়েদের সম্মিলিত আন্দোলন প্রচেষ্টা। বহু অপমান অসম্মান দুঃখ ভোগের পর মেয়েরা একে একে বহু বিবাহ বন্ধ করে এক বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আইন (হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৫) উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৬ (পিতার বা স্বামী সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার) ভরণ পোষণের অধিকার (ক্রিমিনাল প্রসিডিওর ১৯৭৩) দত্তকের

অধিকার আইন, পণপ্রথা নিবারণী আইন ১৯৬১, সমান মজুরী আইন ১৯৭৬, পণপ্রথা নিবারণী সংশোধন অর্ডিন্যান্স ১৯৮৬ ইত্যাদির সুযোগ পেয়েছেন। তাছাড়া সংবিধানের ১৫(১) ধারায় এবং ১৬(২০) ধারায় সকলের সঙ্গে সব বিষয়ে সমান সুযোগ পাবার অধিকার তাদের রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আরো আইন যা মেয়েদের স্বার্থ রক্ষার্থী। এখন কথা হচ্ছে সমাজ যদি এ বিষয়ে জামিনদার না হয় তবে আইন পাশ করানোতেই কিছু হবে না। এজন্য আবার মেয়েদের আন্দোলন দরকার।

এসব বিষয়ে উপজাতি মেয়েদের অবস্থা খুবই করুণ। হাটে মাঠে ঘাটে পুরুষের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে চলে আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীনতা এবং সাম্যের একটা সুন্দর নিদর্শন রাখলেও তাদের কাস্টমারী ল অনুযায়ী মেয়েদের পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে কোন অধিকার নেই। ইচ্ছে করে দিয়ে না গেলে উত্তরাধিকারী হিসাবে মেয়েদের দাবীর কোন অধিকার নেই। মিজোরামের মত উচ্চশিক্ষা সাক্ষরতা সম্পন্ন রাজ্যেও মেয়েরা এখনো বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের উপর নির্ভরশীল বোঝা। খুব সহজেই স্বামী তাদের বিচ্ছেদ দিতে পারেন। বিচ্ছেদের পর তার সম্পত্তিতে এমনকি কোন সন্তানেও একেবারেই অধিকার থাকে না। এ সব বিষয়ে দ্রুত আইন পাশ করার জন্য উপজাতি অর্ধ-উপজাতি মহিলাদের যুগ্ম আন্দোলন এবং জনসাধারণের, প্রশাসনের এবং আইন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব এবং উৎসাহ দেয়া যেমন একটি সামাজিক ন্যায় বিচার তেমনি মেয়েদের জন্য সামাজিক ক্ষেত্রে এসব আইনকে বাস্তবায়িত করা এবং যেখানে বঞ্চনা বা অসাম্য রয়েছে সেখানে এক এবং অভিন্ন আইনবিধি প্রনয়ণ এবং রূপায়ন করা তেমনই সামাজিক ন্যায় বিচার।

এই আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাখা যেতে পারে ঃ

শিক্ষা

মেয়েদের জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাকে ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে। স্কুল ছুটের সংখ্যা কমাতে তথা বন্ধ করতে বিশেষ ধরণের উৎসাহ (প্রতি মেয়ের জন্য অভিভাবককে মাসে ২০/৩০ টাকা) দিতে হবে। ছাত্রীর অভিভাবক শিক্ষকের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। বিশেষভাবে উপজাতি এবং পিছিয়ে পড়া নিম্নবর্গের মেয়েদের জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে। ছাত্রীদের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ বা অন্য সাহায্য যাতে সময়মত তারা পায় তার জন্য বিলি ব্যবস্থা ক্রটিশূন্য করতে হবে। স্কুলে কলেজে এবং হোস্টেলে প্রয়োজন অনুযায়ী সিটের ব্যবস্থা রাখতে হবে। একটি ছেলে যে কোন জায়গায় বা অন্য বাড়িতে পয়সা দিয়ে থাকতে পারে। বর্তমান সামাজিক অবস্থায় মেয়েদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। উপজাতি মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থা করতে হবে। বৃত্তি

শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (সেলাই/উলবোনা/চর্মশিল্প/মৃৎ শিল্প/টাইপ/স্টেনোগ্রাফী/কম্প্যুটার/বিউটিশিয়ান/নার্সিং/গৃহসজ্জা প্রভৃতি খুলতে হবে)

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-অবস্থা

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মেয়েদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের মত বিধান সভায়/লোকসভাতে মেয়েদের প্রতিনিধিত্বের চেষ্টা করতে হবে। কারণ নীতি নির্ধারণকারী সংস্থায় মেয়েদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব না থাকলে তাদের জন্য তাদের হয়ে কেউ কথা বলবে এটা বৃথা আশা। সংবিধানের আইনের বিভিন্ন অধিকারগুলি যাতে মেয়েদের প্রতি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হতে পারে এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচীতে মেয়েদের জন্য কর্মসূচীগুলি যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হতে পারে তার জন্য মহিলা এম.এল.এ. পঞ্চায়েত সদস্যাদের নিয়ে বিশেষ তত্বাবধায়ক কমিটি গঠন করতে হবে। মেয়েদের আর্থিক প্রতিষ্ঠার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপারে পরামর্শ দানের বা নির্দেশনার জন্য কাউনসেলিং সেন্টার থাকতে হবে। মেয়েদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী আই.টি.আই. প্রতি জেলায় রাখতে হবে। উপজাতি ও তপশীলি মেয়েদের জন্য এসব শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ সংরক্ষণ রাখতে হবে।

কৃষিক্ষেত্রে পশুপাখী পালন-শুকর পালন

মেয়েদের জন্য সহজ কৃষি ঋণ পাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। স্থানীয় শস্য তরি তরকারী ফল উৎপাদনের জন্য প্রতি এলাকার মেয়েদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিতে হবে। চাষযোগ্য ভূমির অভাবে আজকাল মেয়েরা, বিশেষত উপজাতি মেয়েরা পরের জমিতে কৃষি শ্রমিক হিসাবে দিনমজুরী করে। এরা কখনোই পুরুষের সাথে সমান মজুরী পায় না। এদের জন্য সমান মজুরীর ব্যবস্থা বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। কৃষিজাত দ্রব্যের বিপণন ব্যবস্থার জন্য পশুপাখী পালন, ডিম, মাংস উৎপাদন ব্যবসার জন্য সমবায় পদ্ধতির সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

হস্ততাঁত শিল্প

উপজাতি সমাজের মেয়েরা বস্ত্র বয়নে অভ্যস্ত। তাদের জন্য সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় সূতা ও তাঁতযন্ত্রের ব্যবস্থা করলে এরা আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেই সঙ্গে তাদের উৎপাদিত বস্ত্র বাজারজাত করার জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বস্ত্রবয়নের জন্য তাঁদের সূতার ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে হবে।

স্বাস্থ্য

পরিবার-মঙ্গল ও পরিবার-পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে গ্রামীণভাবে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত সার্থকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের অবশ্যই স্থানীয় ভাষা জানতে হবে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য পরিসেবা যথা, ছোট শিশুদের টিকা ইত্যাদি যাতে এক সঙ্গে দেয়া হয়ে যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, পুষ্টি শিক্ষা মেয়েদের দিতে হবে। হঠাৎ করে নয়, নিয়মিতভাবে মেলা ও নানা প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি শিক্ষা, টিকা ইত্যাদির গুরুত্ব বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে যেতে হবে। তাহলে সরাসরি মেয়েরা এ বিষয়ে জানতে পারবে। বেশী সংখ্যায় লেডি ডাক্তার নিযুক্ত করতে হবে।

সামাজিক অমঙ্গলে

পণপ্রথা/ডাইনী সন্দেহে পুড়িয়ে মারা, স্ত্রীকে প্রহার বা বাড়ির পুরুষেরা মদ্য পান করে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার প্রভৃতির জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। অবিশ্রান্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই সব সামাজিক অমঙ্গলকে দূর করতে হবে। এজন্য সরকার প্রশাসনগুলিকে খুব বেশী তৎপর আদর্শপূর্ণ এবং সহযোগী হয়ে উঠতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই এসব সামাজিক অমঙ্গল ঘটে, সেজন্য শিক্ষার প্রসার করতে হবে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য নূতন উদ্যমে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্পে সাত হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষিত হয়েছে।

জনসংখ্যার অর্ধাংশ মহিলারা তাদের উন্নয়ণে খুব সঙ্গত কারণেই এর উপযুক্ত অংশ তাদের কল্যাণে ব্যয়িত হওয়ার দাবী রাখতে পারেন।

এ বিষয়ে গত ৭-৮ নভেম্বর'৯৭, শিলঙে দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে শুক্লা কমিশনের প্রতিবেদনের বিভিন্ন সুপারিশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিচারে ২৭টি ক্ষেত্রে ১৭৩টি সুপারিশের উপর "Few Initiatives for the North-East Implications for women" নামে এক আলোচনাচক্র হয়ে গেল। এতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মহিলারা যোগদান করে "North-East Womens' Economic Forum" তৈরী করে বেশ কিছু সুপারিশ রেখেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে যথাযথ ব্যয়িত হয় সেজন্যে তারা এ ব্যাপারে পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তার রূপায়ণ এব তত্ত্বাবধান এবং উপযুক্ত দায় দায়িত্বের সঙ্গে এতে জড়িত হতে চেয়েছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য পর্যটন, ইউরেনিয়াম খনন, বনায়ন নীতি সবকিছুর আরো বিস্তৃত পর্যালেচনার পর পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণ হোক এটা তাঁরা চাইছেন। তাঁরা চাইছেন পর্যটন শিল্প অর্থকরী হিসাবে প্রার্থিত হলেও এটা যেন প্রাকৃতিক ভারসাম্য অক্ষুন্ন রেখে পরিচালিত হয় এবং এটা মেয়েদের সম্মান স্বার্থের জন্য ক্ষতিকারক (যৌন পর্যটন যা গোয়া বা ইন্দোনেশিয়াতে হচ্ছে) না হয়ে মেয়েদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়। তাঁরা আরো চেয়েছেন, মেয়েদের জন্য সমবায় আন্দোলন নূতনভাবে জোরদার করা হোক। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা পরিসেবার উপর গুরুত্ব দেয়া হোক্ যোগাযোগের এবং রেলওয়ের উন্নতি হোক। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য ছোট খাটো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠুক। স্থানীয় লোকের জীবনযাত্রা স্বার্থ রক্ষা করে এ সব প্রকল্পের স্থান নির্ধারিত হোক। সম্পত্তিতে মেয়েরা যেন

ছেলেদের মত সব রাজ্যে জমির সমান অংশীদার হয়। কারণ জমিজমার অভাবে মেয়েরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায় না। এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের নিয়মাবলীকে একটু শিথিল করার জন্যও তাঁরা সুপারিশ করেছেন। সমবায় গঠনের ব্যাপারেও সেইভাবেই তারা মেয়েদের জন্য নিয়মনীতিকে কিছুটা শিথিল করার জন্য বলেছেন।

North East Development Council-এ নীতি নির্ধারণকারী বিভিন্ন সাব-কমিটিগুলিতে মহিলা ফোরাম উত্তর পূর্বাঞ্চলের মহিলাদের জন্য শতকরা ২৫ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব চেয়েছেন। সেইসঙ্গে ওঁরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের জন্য সংবিধানের ৭৩ নং সংশোধনীর প্রস্তাব করেছেন।

সংবিধানের ৮৩ তম বিলের সংশোধনী প্রস্তাবটি এ কারনেই শীতকালীন অধিবেশনে (৯৭-৯৮), উত্থাপনের জন্য দিল্লীতে ৩১ দিন একের পর এক অনশন ধর্মঘট করবেন বলেও তাঁরা স্থির করেছেন।

এইসব দাবী এবং সুপারিশের মধ্যে রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যে ন্যূনতম পরিষেবা হিসাবে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে গুরুত্ব নিয়ে ব্যবস্থা করা। স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে এ বিষয়ে জোর দেয়া এবং একে তাঁদের হাতের আঁওতায় নিয়ে আসা, মেয়েদের জন্য আরো বেশী লেডি ডাক্তার নিয়োগ করা ইত্যাদি।

দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের সম্পর্কে চর্চা গবেষণা করার জন্য U.G.C.-র কাছে সুপারিশ করবেন বলে ফোরাম স্থির করেছেন। মেয়েদের একটানা গার্হস্থ্যকর্মের পরিশ্রম লাঘব করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জিনিষপত্র (ধোঁয়াহীন চুল্লী ইত্যাদি) তৈরীর প্রযুক্তির উন্নতি ও উদ্ভাবনের জন্য একটি বিশেষ সেল (Cell) স্থাপনের জন্যও ফোরাম সুপারিশ করেছে।

তৃণমূলস্তরের মহিলাদের আন্ত:রাজ্যগুলির মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব, বিরোধগুলি যত শীঘ্র সম্ভব মিটিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য এরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সুপারিশ করেছেন তাদের মতে উগ্রপন্থা এবং আন্তঃরাজ্য বিরোধগুলি না মেটালে কোন উন্নয়নমূলক কাজ এ অঞ্চলে সম্ভব নয়।

সম্মেলনে উপস্থিত মহিলারা এই বলে সিদ্ধান্ত নেন যে, সকল রকম পার্থক্য, অশান্তি মিটিয়ে এক রাজ্যের সঙ্গে আরেক রাজ্যের সংযোগ স্থাপনে তারা দৃঢ় চিত্তে কাজ করে যাবেন।

মোট কথা সব রাজ্যের প্রতিনিধিরাই চাইছেন যে এই কর্মকান্ডে মেয়েদের মতামতকে যেন অবহেলা না করা হয়। যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং বরাদ্দকৃত অর্থের যেন অপ-প্রয়োগ বা নয়ছয় না হয়।

নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে নিজেদের সব বিষয়ে প্রস্তুত করে উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে উগ্রপন্থা অশান্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই আজ মেয়েদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতবাং অন্যান্য বাজ্যের প্রতিনিধিদের মতো আমাদের নিজেদের মধ্যেও ঐক্য সচেতনতা দৃঢবদ্ধ প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়েব জন্য দাবী, সুপারিশ, মতামত রাখতে হবে।

বি বি ধ

কর্মক্ষেত্রে নারী সমস্যা ও প্রতিকার

পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় শুধু এদেশে নয় বলা চলে সমস্ত পৃথিবীতেই সমাজ গঠনে মেয়েদের অবদান, তাদের কর্মস্বীকৃতি সঠিক এবং বাস্তবিক সত্য নয়। খুব নিষ্ঠুরভাবেই মেয়েদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম সমাজের উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে হয় লঘু করে দেখে সে ভাবে দেখানো হয় নয়তো তাদের শ্রমের কথা বেমালুম অস্বীকার করে শ্রমজীবী মহিলা হিসাবে তাদের অনেককেই অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। শুধু সাম্যবাদী কবির নীতিবাদী দৃষ্টিতে 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নয়' এ সত্য ধরা পড়ে। তাই তিনি দেখেন এবং প্রীতি ও শ্রদ্ধায় হৃদয়ঙ্গম করেন 'এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল ফলিয়াছে কত ফল/নারী দিল তাকে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল'/'শস্যক্ষেত্র উর্বর হল পুরুষ চালাক হল/নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল'।

কবির এই কথা শুধু কাব্য নয়, এ জীবনসত্য। আর জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যই কবিতা যা বাস্তব জীবনের নির্যাস। মানুষের সমাজ অন্যান্য প্রাণী থেকে ভিন্ন। প্রকৃতির সঙ্গে নারী পুরষের পারস্পরিক প্রক্রিয়া তাদের জীবনধারনের সামগ্রীর উৎপাদন, সেই উৎপাদনের ইতিহাস-আদিপর্ব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই উৎপাদনের সম্পর্ককাল চলে আসছে।

কিন্তু প্রতিটি উৎপাদন সম্পর্ক পর্যায়েই নারীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের আদিপর্বে নারীই ছিল খাদ্যের প্রধান যোগানদার। বিভিন্ন গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে শিকার আহরণের সমাজে সংগ্রহের মাধ্যমে ৮০ শতাংশ খাবারের যেগান দিয়েছে নারী। সেখানে পুরুষ দিয়েছে ২০ শতাংশ।

অস্ট্রেলিয়ার টুই নারীরা একই সঙ্গে শিকারী এবং সংগ্রাহক। তারা সংগ্রহের মাধ্যমে ৩০ শতাংশ, শিকারের মাধ্যমে ৩০ শতাংশ এবং মাছ ধরাব মাধ্যমে ২০ শতাংশ খাবার যোগান দিয়েছে। গোষ্ঠীর জন্য খাবারের যোগানদাতা নারীই পরবর্তী উৎপাদন সম্পর্কের পর্যায়ে কৃষক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী ধাপে ক্রমেই নারী-পুরুষের বৈষম্যের সূত্রপাত। পশুপালন যাযাবর গোষ্ঠী থেকে যখন পুরুষ তার উৎপাদন শক্তিকে আবিষ্কার

করলো কৃষি কাজের মাধ্যমে, সংগ্রাহক নারীর ভূমিকা হয়ে গেলো গৌণ তখন সরাসরি উৎপাদনশীল অর্থনীতিতে পুরুষ প্রধান হয়ে উঠতে লাগলো। নারীর প্রধান পরিচয় হলো সন্তানের বিশেষভাবে পুত্রের জন্মদাত্রী জননী হিসাবে।

তবু এরই মধ্যে জাগতিক সত্য — নারীই কৃষিকাজের উদ্ভাবক। যদিও লাঙল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ হয়ে গেলো প্রভু, নারী অধস্তন জীব। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সুস্থির রাখার জন্য এবং সঠিক উত্তরাধিকারী নিশ্চয়ের জন্য বিবাহ্ প্রথার জন্ম, এর ফলে নারী এবং জমি দুয়ের উপরই পুরুষ প্রাধান্য এসে গেলো। সেই যে উৎপাদক নারীর ভূমিকার অবনতি তা আজো চলছে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন, জল ও জ্বালানী সংগ্রহ্ ও শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে নারীর বিরাট অবদান থাকা সত্বেও তাদের প্রকৃত ভূমিকা আজো স্বীকৃতিহীন।

রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী মেয়েরা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ কাজ করে অথচ আয় করে এক দশমাংশ। খাদ্য উৎপাদকের কাজে মেয়েদের কাছ থেকে উৎপাদন আসে ৫০ শতাংশ। মেয়েরা খুব কমই কৃষি-ঋণ পায়। পৃথিবীর মোট সম্পত্তির এক শতাংশ মেয়েদের অধিকারে রয়েছে।

এই নারীদের বেশীরভাগই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। সারা বিশ্বের পরিবারগুলোকে বাঁচিয়ে বাখার ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এদের মধ্যে ৫০ কোটি নারী দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে।

আফ্রিকার সাহারা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের নারীরা তাদের জনগোষ্ঠীর মূল খাদ্যের ৬০-৮০ শতাংশের যোগানদাতা। নারী-প্রধান জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশ পরিবারে মোট জনল জ্বালানীর ৯০ শতাংশ যোগান দেয় নারী। শিল্পোন্নত দেশ সমূহে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষিকাজ সম্পাদন করে নারী।এশিয়ার নারীরা খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশের যোগানদাতা।

ভারতে মোট শ্রমশক্তির ৭৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। মোট ৩১৫ মিলিয়ন শ্রমশক্তির মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলাই কাজ করে কৃষিকাজে। একমাত্র হাল চালানো ছাড়া কৃষিকাজের প্রত্যেকটি ধাপে এবং এরপর ঝাড়াই, মাড়াই থেকে সব কিছু নির্ভর করে মূলত মেয়েদের ওপর। অথচ জমির মালিকানা নেই বলে সরকারী কৃষি ইত্যাদি ঋণের স্বাধীনতা তাদের নেই। তবে কিছু বেসরকারী ব্যাঙ্ক বা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা ঋণ পাচ্ছেন। সরকারী হিসাব অনুযায়ী এই ধরনের উৎপাদককে 'কৃষক' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় না।

কৃষিতে উন্নত কৃৎকৌশলের পরিবর্তনে নারীরা আজ বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্থ। ধানের কল বসাতে তাদের ঢেঁকিতে ধান ভানা ক্ষতিগ্রস্থ্ হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদান সঠিকভাবে তুলে ধরা এবং উৎপাদক নারীকে সমর্থন প্রদানের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। যেমন কৃষিক্ষেত্রে নারীর অবদান চিহ্নিত করে সেই প্রেক্ষিতে সঠিক পদক্ষেপ

নিতে হলে জেন্ডারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা — সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের এ বিষয়ে পরিকল্পনা নীতি গ্রহন করে অধিদপ্তর সমূহের মাধ্যমে এগুলো রূপায়িত করা-নারীদের কৃষক নয় উৎপাদক হিসাবে অভিহিত করা-তাদের শ্রেণীগত অবস্থান মনে রাখা। পুরুষ কৃষকদের মত তাদেরও ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক এভাবে ভাগ করতে হবে। এছাড়াও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে নারীদের উপর কাঠামোগত পূনর্বিন্যাস নীতির প্রভাব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা এবং জমির মালিকানায় নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আজ মেয়েদের নিজেদের আত্মবিশ্বাসের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং পরিবারের অর্থনীতিতে সহায়তার জন্য রোজগারের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। এজন্য তাদের রোজগারের কৌশল ক্ষমতা বৃদ্ধির দরকার হয়ে পড়েছে। কৃষিক্ষেত্রে পশু পালনে আমরা যদি মেয়েদের অবদানের কথা বিচার করি তবে দেখতে পাই কৃষিক্ষেত্রে, পশুপালনে হাল চাষ বাদে মেয়েরা বিশেষভাবে আদিবাসী সমাজে বোয়া, বাছা, ফসল কাটা ঝাড়াই মাড়াই তরি-তরকারী উৎপাদন, হাসমুরগী গরু শুকব পালনে তাদের ভূমিকাই পুরুষদের চাইতে কোন অংশে কম নয় বরং অগ্রগণ্য। বস্ত্র বয়নেও তাদের কর্মসূচী বিস্তৃত যা পারিবারিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যা খাদ্য উৎপাদন হয় তার ৫০ শতাংশ নারী-শ্রম নির্ভর। ভারতে ধান চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে, চারা রোপণ আগাছা নিড়ানোব কাজে ৭৫ শতাংশ মেয়েরা, ধান কাটার কাজে ৬০ শতাংশ, মাড়াইয়ের কাজে ৩৩ শতাংশ মেয়েরা রয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গায় মেয়েরা পুরুষের তুলনায় বছরে কম দিন কাজ পায়। সমান ঘন্টা কাজ করলেও মজুরী কম পায়। তাদের উৎপাদিত দ্রব্যেব বিপণন ব্যবস্থা নেই।

সংগঠিত ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা পেলেও অসংগঠিত শিল্পে নায্য মজুরী ও অন্যান্য, সুযোগ সুবিধা নেই। মেয়েরা বেশীরভাগই বিড়ি শিল্পে, ঘড়ি, বৈদ্যুতিক সামগ্রীর যন্ত্রাংশ জোড়ার কাজে, চিংড়ী মাছ শিল্পে, ধুপকাঠি ও পাপড় তৈরীতে, পাথর পালিশে (হাজার হাজার মেয়ে) কাগজের ঠোঙা, পোষাক, তালা, বোতাম তৈরীতে, মোরদাবাদ পিতলের বাসন শিল্পে, জম্মু-কাশ্মীর গালিচা তৈরীতে, বারাণসীতে জরির নক্সায় কাজ করে।

মেক্সিকো এবং ভারতে কাপড়, জুতো এবং চিংড়ীমাছ বাছাই কারখানাতে মেয়েরা লক্ষ্যনীয়ভাবে কাজ করে। ঠিকা ঝি'র কাজে এক বিরাট অংশের মেয়েরা নিযুক্ত আছে, যাদের শ্রমদানের উপযুক্ত মূল্য, সুযোগ সুবিধা, মানবিক ব্যবহার এরা পায় না। বরং আর্থিকভাবে এবং যৌন নিপীড়নে এরা অত্যাচারিত। এইসব নারী কর্মপীদের দক্ষতা বাড়ানোর উপায় নেই। এরা ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত নয় ফলে এদের সুযোগ-সুবিধাও কম।

মেয়েরা নানাভাবেই কাজ করে পারিবারিক এবং জাতীয় আয় বাড়ায়। কিন্তু সেই আয় বা তাদের অবদান জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্যবান হয় না। পলজি হফম্যান বলেছেন

"মেয়েদের মর্যাদার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতির বলিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে — যতদিন দেশ মেয়েদের কমদামী মনে করবে ততদিন উন্নতি হবে শ্লথ এবং বেদনাদায়ক।"

বহু শিল্পেই যেমন পোষাক তৈরীর অপ্রধান প্রক্রিয়াগুলোতে ছোট ঠিকাদার বা বাইরের শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হয়। এরা সকলেই নারী শ্রমিক। ভারতে পোষাক শিল্পে সংগঠিত ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক প্রযুক্তির আধুনিক কারখানার সমাবেশে-দক্ষ শ্রমিকদের এবং যারা ভাল মাইনের দরজী তারা সবাই পুরুষ। সাধারণ শ্রমিকদের বিপুল অংশ অদক্ষ মহিলা এবং পুরুষ যারা ঘরে বসে পোষাকের অংশবিশেষ সেলাই করে, বোতাম লাগায়। তেমনি ভারতে লেস প্রস্তুতকারী শ্রমিকরা মূলত ঘরোয়া শ্রমিক কিন্তু লেস প্রস্তুতের শেষ অংশগুলি করে ব্যবসায়ীদের অবস্থাভাজন স্থায়ী শ্রমিকেরা।

ভারতে হাল্কা ভোগ্য পণ্য তৈরীর ক্ষেত্রেও বাইরের নারী শ্রমিকরা নিয়োজিত। এদের শ্রম সস্তা। আবার বিপরীতে বড় কারখানায় (কোয়েম্বাটোরে বিদ্যুৎ চালিত তাঁত) নারী শ্রমিকদের সংখ্যা মোট শ্রমিকের চার শতাংশের বেশী নয় এবং সেখানে তাদের অংশগ্রহণ প্রতিনিয়ত কমছে। মূল স্রোতের ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত ঠিকা শ্রমিকদের প্রশ্নটি বিবেচ্য বিষয় করে আন্দোলন তুলতে পারে নি। মেয়েরা দর কষাকষির জন্য ইউনিয়নের উপর খুব কম নির্ভর করতে পারে। বর্তমানে রপ্তানীভিত্তিক উৎপাদন কারখানাগুলিতে মেয়েদের নিয়োগের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী সময় খেটেও শতকরা পঁচিশ শতাংশ কম রোজগার করেন। মেয়েরা আজ খুব বেশী সংখ্যায় অর্থ রোজগারে আসছেন এবং এবিষয়ে তারা আগের মত শুধু মেয়েলী কাজের ক্ষেত্রে নয় পুরুষদের বলে চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলিতেও দখল নিতে শুরু করেছেন। তবু কিন্তু তারা অর্থ রোজগারের দিক দিয়ে এখনো দরিদ্র শ্রমিকদের সংখ্যাকেই স্ফীত করছেন। এটা ইন্টারন্যাশন্যাল লেবার অর্গানাইজেসানের মতামত।

মেয়েরা পৃথিবীর দরিদ্র সমাজের ৭০ শতাংশ এবং নিরক্ষরদের ৬৫ শতাংশ। মোট শ্রমশক্তির (শহরাঞ্চলে) ৯.৭৩ শতাংশ এবং (গ্রামাঞ্চলে) ২৭.৫৬ শতাংশ। অধিকাংশ নারী কর্মীই গ্রামাঞ্চলের এবং এদের শতকরা ৮৭ ভাগই কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত।

শহরাঞ্চলে নারী শ্রমিকদের শতকরা ৮০ ভাগই ক্ষুদ্র ব্যবসা বা শিল্পের বিভাগে, দালান বাড়ী ইত্যাদি নির্মাণকার্যে নিযুক্ত। সংগঠিত শ্রম ক্ষেত্রগুলিতে নারী শ্রমিকরা মোটামুটি ১০ শতাংশ ফ্যাক্টরীগুলিতে, খনিতে এবং ৫১ শতাংশ চা বাগানগুলিতে আছেন। এছাড়া শহরাঞ্চলের শ্রমশক্তিতে মেয়েরা নার্স, মিডয়াইভস, হেলথ ভিজিটার্স, কেরানী, স্টেনোগ্রাফার, শিক্ষিকা, ফ্যাক্টরী কর্মী, পুলিশ কর্মী হিসাবে আছেন। এক বিরাট অংশের নারী সমাজ এসব ছাড়া অসংগঠিত বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমদান করছেন। এগুলো হচ্ছে খুচরো ব্যবসাদার। দোকানদার, রাস্তায় ঠেলা ব্যবসায়ী, রেস্টুরেন্ট বা হোটেল মালিক, গৃহ পরিচারিকা, সুইপারস্, ক্লীনার, ইস্ত্রি ব্যবসায়ী, লন্ড্রি মালিক, ধোবী, পশু পালনকারী, হাঁস-মুরগী ব্যবসায়ী, উল-শিল্পী, খাদ্য সংরক্ষন যেমন আচার, জেলী ইত্যাদি প্রস্তুতকারিনী, বিড়ি তৈরীর শিল্পী, দরজি,

বস্ত্রাদিতে এমব্রডারী ইত্যাদি কাজের শিল্পী, মৃৎশিল্পী, রাবার এবং প্লাস্টিকের জিনিষ তৈরীর কাজে নিযুক্ত কর্মী কাগজ এবং পাম্প থেকে নানা জিনিষ তৈরীর কাজে, বাঁশ বেত দিয়ে ঝুড়ি ইত্যাদি বোনার কাজ, তাঁত শিল্পে, নানা ধরনের প্যাকিং এর কাজে, পোশাক তৈরীর ব্যবসা, বিউটি পার্লার ইত্যাদিও চালাচ্ছেন। এছাড়া মেয়েরা নানা ধরনের, বিশেষ কৃষি কাজেও অংশ নিচ্ছেন। যেমন মাশরুম চাষ, নানা ঔষধের গাছ চাষ, আপেল, আলুর চাষ ইত্যাদি।

গ্রামাঞ্চলে ডেয়ারী, অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রী, মাছ চাষ, মাছ সংরক্ষন এবং জাল তৈরীতেও মেয়েরা অংশ নিচ্ছেন। এইসব কাজ নানা ধরনের এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা হস্তশিল্প মেয়েদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের মাত্রা ক্রমশই বাড়ছে। ১৯৮১ সালে শতকরা ১২ শতাংশ থেকে ১৯৯১ এ ১৪ শতাংশ হয়েছে। এখন এইসব কাজ করতে গিয়ে আজ মেয়েদের কি কি বঞ্চনা, কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা ভাবার বিষয়। বিশ্ব জুড়েই এ বিষয়ে বিরাট বঞ্চনা এবং অন্যায় ব্যবহার চলছে। অথচ অন্য দেশের কথা বাদ দিয়েও ভারতে মেয়েদের জন্য যেসব সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা ন্যায়নীতি সম্মানের ব্যবস্থা রয়েছে তাতে এধরনের অন্যায় অবিচার মেয়েদের জন্য সমাজে চালু থাকা সম্ভবই নয়।

শ্রমিক কল্যাণে সংবিধানের আর্টিকেল ৪১, ৪২ ৪৩ ধারায় শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, সহায়তা, কর্মের সুযোগ, কাজের জায়গায় মানবিক এবং ন্যায় পরিবেশ রক্ষা করা, উপযুক্ত বিশ্রামের সুযোগ দেযা, মাতৃত্বকালীন ছুটির বন্দোবস্ত করার কথা উল্লিখিত আছে। ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে সমান কাজে সমান মজুরীর কথাও ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু যে মানসিকতায় শিশু কন্যাকে অপহরন করে ব্যবসার উদ্দেশ্যে হাত বদলে অন্যত্র বিক্রী করে দেয়া হচ্ছে সেই ধরনের মানসিকতাতেই নারী শ্রমিককে তার প্রাপ্য মজুরী থেকে ঠকানো হচ্ছে, এমনকি কর্মক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহও করা হচ্ছে।

ফলে কম মজুরী, স্বল্প উৎপাদন, কর্মস্থলে নীচুমানের পরিবেশ, কর্মীর নিম্ন সম্মান, চাকুরীতে অস্থায়ীত্বের ঝুঁকি নিরাপত্তার অভাব উন্নতির সুযোগ সুবিধা এবং পর্যাপ্ত ক্ষেত্রের অভাব সর্বদাই লক্ষিত হচ্ছে।

মহিলাদের শ্রমদানের আরেকটি ক্ষেত্র যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ অত্যন্ত অস্বীকৃত, সে হচ্ছে গৃহকর্ম। এই কাজ প্রায় অদৃশ্য, অনায়াস এবং সহজলভ্য বলে তা নিয়ে কোনদিন কেউ মাথা ঘামায় নি। এ বিষয়ে পরিমাপ করা হয়েছে যে ভারতের জাতীয় আয়ের (G.M.P.) ১/৩ অংশ গৃহিনীর শ্রমের অবদানে গড়ে উঠেছে। পরিবার মহিলাদের শ্রমের অর্থনৈতিক মূল্যে স্বীকৃতি নেই বলে একে কোন নিয়োগ বা চাকুরীর মর্যাদা দেয়া হয় না। নিজের পরিবারের জন্য কোন জিনিষ তৈরী ইত্যাদিও জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় না। বাজারজাত করার উপযুক্ত কিছু অর্থনৈতিক কাজকর্ম গৃহবধুরা করলেও তা অনিয়মিত, গৃহকর্মের ফাঁকে মাঝে মধ্যে হয় বলে তাকে অর্থনৈতিক হিসাবে ধরা হয় না।

এজন্য মেয়েদের এ সব অবদানের যথার্থ মূল্য বিচার হয় না। পুরুষ অর্থকরী

রোজগারী ভূমিকার পাশাপাশি একে স্বীকার করে নেয়ার বিষয়টা এখনো অবহেলিত রয়েছে। অথচ মেয়েরা নিয়মিতভাবে সংসারে ৫-৬ ঘন্টা থেকে ১২-১৪ ঘন্টা কাজ করে যান এবং এই সব কাজের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শিশু থেকে বৃদ্ধের যত্ন, বাড়ির তত্ত্বাবধানে রান্না ও অন্যান্য কাজে তাদের শ্রমশক্তির সিংহভাগ খরচ হয়ে যায় এরপর বাইরে পুরুষের পাশাপাশি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নৈতিক কাজে অংশগ্রহণ খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে।

সেজন্য পারিবারিক দায়দায়িত্ব, কাজের চাপ তাদের চাকুরীর ব্যাপারে অনেক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। গুরুত্বের দিক থেকে চাকরী বা অর্থোপার্জন তাদের পক্ষে দ্বিতীয় মর্যাদা পায় ফলে প্রমোশন নেয়া, কোন ট্রেনিংয়ে যোগদান করা মেয়েদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। যা হোক সব কিছু বিচার করে দেখা যায় পুরুষ ঘাম ফেলে রোজগার করছে এটা দৃশ্যত এবং স্বীকৃত সত্য কিন্তু এটা আরো সত্য যে মেয়েরা পরিবারের বিকাশের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মজুরীহীন কাজ প্রচ্ছন্নভাবে সমস্ত অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রন করছে। সংসার সন্তান, যাবতীয় গৃহস্থালী কাজ (রাঁধুনী নার্স, থেকে বিভিন্ন ভূমিকা) নিয়ে প্রথাগত ব্যবসা বাণিজ্যে এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসাবাণিজ্য অংশগ্রহন করছে। অথচ হীন স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কারের শিকার হয়ে এরা নিরাপত্তাহীন, অর্থনৈতিক স্বীকৃতিহীন এবং শিক্ষা বা প্রশিক্ষকের সুযোগহীনতায় বঞ্চিত শোষিত হচ্ছে। I.L.O. (International Labour Organisation) এর মতে হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে ৬৭ কোটি ৬০ লক্ষ নারী শ্রমিক রয়েছে। ২০০০ সালে এ সংখ্যা ৮৭ কোটি ৭০ লক্ষ হবে। এ সংখ্যার ২৮ শতাংশ যন্ত্র নারী শ্রমিক হিসাবে গণ্য। তাই মেয়েদের শ্রমের বিচারে তার সঠিক অর্থমূল্য নির্ধারণ করতে গেলে নূতন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

মেয়েদের মেধাবুদ্ধি শ্রম-প্রতিভা কম নয়। শ্রমের জগতে অন্যায় অবিচার জারী থাকার ফলে মেয়েদের সঠিক ভাবমূর্তিও আত্মসম্মান প্রস্ফুটিত হচ্ছে না। সেটাই বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সরকারী বিচারে আমাদের দেশে মোট কর্মীর মধ্যে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ১৪.৪৪ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ৫১.২৩ শতাংশ। এই দুইয়ের মধ্যে সমতা আনতে গেলে নারী কর্মীর সংখ্যা ৩৭ শতাংশ বাড়াতে হবে।

প্রকৃত বিচারে নারী কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশী। এরা ডাবল শিফ্‌টে কাজ করে। একটি অর্থকরী দৃশ্য কাজ আরেকটি অর্থশূন্য অদৃশ্য কাজ (ঘর গৃহস্থালী)। এই ব্যাপারে মেয়েদের অবস্থান বিশ্বজোড়া বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরে। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য খাদ্য উৎপাদনে পোষাক নির্মাণে মেয়েরা যে কাজ করে তাই প্রকৃত মূল্যবান অর্থকরী এবং উন্নতির সহায়ক কাজ। প্রতিটি দেশের বিরাট সংখ্যক মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় বিরাট শ্রমশক্তি নিয়োগ করে। ফাইল চালাচলি করে শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখা দরকারী হলেও এর চেয়ে অধিক মূল্যবান নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ একুশ শতকে এসেও মেয়েদের সঠিক মূল্যায়ন

হচ্ছে না। যতই তারা বাইরে ঘরে কাজ করুক আত্মস্বাতন্ত্র্য, আত্মসম্মান, মানসিক স্বাধীনতা তাদের বাড়ছে না।

তাদের চেয়ে কম বুদ্ধি মেধা, প্রতিভা নিয়েও বহু পুরুষ প্রতিষ্ঠিত। এইসব অবস্থার উন্নতিকল্পে মেয়েদের কাজকে বহুগুণিত করে দেখতে হবে এবং মর্যাদা দিতে হবে। মেয়েরা শিক্ষিত সচেতন না হলে দেশে সামাজিক অর্থনৈতিক কোন পরিকল্পনাই সার্থক হবে না। তাদের অর্থনৈতিক অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদেব জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিতে হবে। কেনিয়ার মত ত্রিপুরাতেও আদিবাসী মহিলাদের জমি সংক্রান্ত উত্তারাধীকারের মর্যাদা অনেক নীচে। এর পরিবর্তন করে মেয়েদের দাবীকে তুলে ধবতে হবে।

মেয়েদের অর্থ রোজগারের বিষয়ে কর্মস্থলে কতগুলো অসুবিধা নিরাপত্তার অভাব, যাতায়াতের অসুবিধার সমস্যা রয়েছে এগুলো নানা উন্নয়ন পরিকল্পনায় জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার।

এইসব বিষয়ের মধ্যে কর্মস্থলে যৌন নিগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার। মেয়ে হলেই তাকে ভোগবাদী দৃষ্টি ভঙ্গিদিয়ে দেখার অভ্যাস আছে। মেয়েও যে একজন মানুষ এবং বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তা চেতনা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন মানুষ তা ভুলে যাওয়া হয়। ফলে শুধু নিম্নস্তরে নয় খুব উচ্চ কোটিতেও এই অসম্মানের পরিস্থিতি এসে যায়। ভারত সরকারের উচ্চ পদস্থ আই. এ. এস অফিসার.... বাজাজের সেনাধ্যক্ষ কে.পি.এস. গিলের হাতে অসম্মানিত হওয়া এবং দীর্ঘ দিন মামলা চলা ও অবশেযে শাস্তি বিধানের ঘটনা দেশে সবাই জানেন।

এছাড়াও নানা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইন্ডিয়ান কমার্শিয়াল পাইলট অ্যাসেসিয়েশনের এক মহিলা কো-পাইলটকে পাইলটের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগের তদন্ত শুরুর আগেই মহিলাটির বিষয়ে নোটিশ জারী করেন-- অন্য কোন পাইলট যেন তার সঙ্গে কাজ না করেন। পরিসংখ্যানের বিচারে কর্মরত মহিলাদের উপর ৮০ শতাংশ যৌন নিপীড়ন হয়ে থাকে। ৬২ শতাংশ ক্ষেত্রে আপত্তিমূলক মন্তব্য এবং কটাক্ষ করা হয়। এ কারনে ৫৫ শতাংশ মহিলা নির্যাতন এবং অত্যাচার সায়ত্ত আইন আদালতের সাহায্য নিতে দ্বিধা করে না। ৬০ শতাংশ মেয়ে নাকি উকিল এবং বিচারকদের হাতে হেনস্থা হন।

শুধু এদেশে নয় বিদেশে এ বিষয়ে নারীদের উপর অন্যায় অত্যাচার চলছে এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় প্রশাসনিক উদাসীনতার দৃষ্টান্তও চরম। তবু এরই মধ্যে সাহসিকতা এবং সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন নারী কোথাও এগোচ্ছে। যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তোলায় বরখাস্ত হবার পর আইনী লড়াই চালিয়ে পুর্নবহাল হয়েছেন সৌদি এয়ারলাইন্সের শাহনাজ মুড় ভাটকল। স্টেশান অফিসার আব্দুল আল্লা বাহরনির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুললে তাকে এ বিষয়ে চেপে যেতে বলা হয়। কিন্তু তিনি লেবার কোর্টে যান এবং ১৯৯৬ সালে দীর্ঘ ১১ বছরের বাকী বকেয়া বেতন সহ চাকরীতে বহাল হন।

আমাদের দেশে লজ্জায় সঙ্কোচে মেয়েরা প্রায়ই এসব নিগ্রহ মুখ বুজে সয়ে যায়।

আইনী আশ্রয় নিতে ক'জনে যান বম্বের একটি স্টীলেজ ইন্ড্রাস্ট্রি লিমিটেডের টাইপিস্ট পারভিন ... যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় আদালত ৪০,০০০ টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে বলেন। সেই সঙ্গে অভিযুক্ত জেনারেল ম্যানেজার এ.আর.ওজরকে দশহাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়েছিল।

সুপ্রীম কোর্ট বলেছেন যৌন নির্যাতন মানবাধিকার হরণের সামিল। এজন্য কর্মক্ষেত্রে নারী নিগ্রহ নিষিদ্ধ। রাজস্থানের এক মহিলা সমাজসেবী....দেবীর সমাজে বাল্য বিবাহ রোধের চেষ্টায় ধর্ষিতা হবার ঘটনায় বিচারপতিরা এ রায় দেন। তাঁরা বলেন জীবন, স্বাধীনতা এবং নারী পুরুষের সাম্যের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। সব আদালতের উচিত এই অধিকারকে রক্ষা করা।

সেজন্য সুপ্রীম কোর্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্দিষ্ট আচরনবিধি প্রণয়নের কথা বলেছেন। এতে যৌন নিগ্রহ খুব কঠিনভাবে দমন করার কথা বলা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকলে কঠোরভাবে শাস্তির সুপারিশ করেছেন। দেশে মহিলাদের শারিরিকভাবে হেনস্থা হওয়ার ক্রম বর্ধমান ঘটনায় আদালত বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যৌন নিপীড়নের সুস্পষ্ট সংজ্ঞাও দিয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। মহিলাদের শরীর স্পর্শ করা, যৌন উদ্দীপক কথাবার্তা বা আচরণ করা, অশ্লীল ছবি বা বই পড়তে দেয়াকে এর তালিকায় রাখা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে যে আইন রয়েছে তা মহিলাদের রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় আদালতকে সামাজিক ন্যায় রক্ষার স্বার্থে এগিয়ে আসতে হয়েছে।

এই অত্যাচারের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোর্ট, হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ গ্রহণের কমিটি হয়েছে। প্রতিটি কলেজে নারী সেল গঠনের প্রস্তাব এসেছে। এ বিষয়ে আইনজ্ঞ প্রিয়া হিঙ্গোরানীর মত কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী শুধু আইন করে দিলে বন্ধ হবে না। তার পরামর্শ-আইনের নামকরনে শুধু Prevention বা নিবারন নয়-Punishment বা শাস্তি বিধান কথাটাও থাকা দরকার। আইনের সঙ্গে সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় নিয়মাবলীও তৈরী করতে হবে। তা না হলে আইন কার্যকরী হবে না।

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী আমাদের দেশের মোট শ্রমশক্তির ১৩ শতাংশ নারী ।এদের ৯২ শতাংশ অর্থাৎ ৬ কোটি কাজ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এরা অত্যন্ত বিপন্ন। এদের ব্যাপারে যৌন হয়রানী বন্ধ করা এবং অন্যান্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন।

নারী প্রগতিতে আইন ও সাক্ষরতা

আমরা জানি All are equal in the eyes of Law – আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ভারতীয় সংবিধান এদেশে নারী সমাজকে তার উন্নতি ও বিকাশের জন্য দিয়েছে সম অধিকার। Article 15 (1) 16 (2)-তে রয়েছে 'The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion caste, sex place of birth or any of them'-- এবং 'There shall be equality or opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment under any office under state'.

স্বাধীনতার পূর্বে যেসব সুযোগ-সুবিধা ছিল তারই পথ ধরে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে মেয়েদের স্বার্থ সম্মান নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অজস্র আইন তৈরী হয়েছে। কিন্তু ক'জন একথা জানেন? এতসব আইনী রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রে আজও মেয়েদের অবস্থান ও সম্মান মোটেই সুখের নয়। এখনো সমাজে কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষা বেশী বলে লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষার সাহায্যে মাতৃগর্ভ থেকে কন্যা সন্তান বহু ক্ষেত্রেই পৃথিবীতে আসতে পারে না। যারা জন্মায় তারাও অনাদরে, অবহেলায়, নিরক্ষরতায়, স্বাস্থ্যহীনতায়, যৌন অত্যাচারে, নির্যাতনে, বাল্য বিবাহের কুপ্রথায়, পণপ্রথার অভিশাপে হয় মৃত্যুবরণ করে নয়তো অর্ধমৃত হয়ে দিন কাটায়।

এই দুরবস্থার থেকে তাঁদের বাঁচার জন্য একটিই সার্থক অস্ত্র রয়েছে। সেটি হচ্ছে শিক্ষা, সাক্ষরতা। এত দুর্গতির মধ্যেও দেখা যায় যে যেখানে স্ত্রী শিক্ষার হারও সাক্ষরতার হার বেশী সেখানেই মেয়েদের স্বাস্থ্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক সুখ সম্পদ বেশী। বিশেষভাবে সন্তানের জন্ম হার, মৃত্যু হার কম। যেখানে নারী সাক্ষরতার হার বেশী যেমন মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং কেরালাতে মেয়েদের জীবনযাত্রার মান উঁচু। আবার রাজস্থান, বিহার উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর এবং আসামে মেয়েদের শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার কম বলে তাদের উন্নতি তুলনামূলক ভাবে কম।

শিক্ষা সাক্ষরতার হার কম বলেই মেয়েরা হয় লুটের মাল, পাচারের পণ্য, নির্যাতনের সামগ্রী। সমস্ত এশিয়ায় ভারত সহ ৮টি দেশে শিশু পতিতার সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী। এ সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে কারণ আজ একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে এইড্‌স

রোগ থেকে মুক্তির জন্য শিশু পতিতা বাঞ্ছনীয়। এই ক্রমবর্ধমান শিশু পতিতার সংখ্যা--যাদের অনেকের মধ্যেই যৌনবোধও জাগ্রত হয়নি--আমাদের শুভ বুদ্ধি ও বিবেককে আহত করে।

অথচ এগুলো সবই আইন বিগর্হিত ব্যাপার। মেয়েদের নিরাপত্তা সুখ সম্মান প্রগতির জন্য এক এক করে যেসব আইন চালু হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে--১) বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন (The child marriage restriction Act 1929) এই আইনে বিয়ের বয়স ছেলেদের জন্য ১৮ এবং মেয়েদের জন্য ১৫ নির্ধারিত হয়। ২) হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫ (Hindu marriage Act 1955) এতে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারী এবং ভরণপোষণের দাবীদার হন। ভরণপোষণের অধিকারের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৫ ধারা অনুসারে খোরপোষ দাবী করতে পারেন। বিবাহিত জীবনের বিবাদ সংঘাত নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে Family Court Act 1984.

পণ প্রথা মেয়েদের জীবনে এক অশেষ অভিশাপ। এই ঘৃণ্য প্রথাকে বন্ধ করতে প্রথমে হলো পণ প্রথা নিরোধক আইন (Dowry prohibition Act 1961) এতে পণ দেয়া নেয়া নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে স্থির হলো। এতেও এই কুপ্রথা বন্ধ না হওয়ায় এবং বধু নির্যাতন বাড়তে থাকায় আরো জোরদার আইন এলো (Dowry prohibition Act 1986) এই আইনে পণ দেয়া নেয়ার ব্যাপার ছাড়াও অন্য কেউ অভিযোগ করলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সশ্রম কারাদন্ডও অর্থদন্ড হবে বলা হয়েছে। তবু বধু হত্যার ব্যাপক ঘটনায় ১৯৮৬ সালে ভারতীয় দন্ডবিধিতে নূতন ধারা সংযোজন করে বলা হলো বিয়ের তিন বছরের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে এবং তা পণের জন্য নিপীড়ন প্রমাণিত হলে Dowry Death বলে ধরা হবে এবং স্বামী বা দোষী আত্মীয় স্বজনের কমপক্ষে সাত বছর ঊর্ধ্বে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে।

এছাড়া মেয়েদের জন্য রয়েছে সমান পারিশ্রমিক আইন (The equal Remuneration Act 1976)। এই আইন অনুসারে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমান কাজে সমান মজুরীর অধিকার পেলেন। কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রেও কোন বৈষম্য বে-আইনী বলে বলা হলো। মেয়েদের যাতে কু-পথে নিয়ে যাওয়া বন্ধ হয় সেজন্য চালু হলো The Suppression of immoral trattic in women and Girls Act 1956. একে জোরদার করতে ১৯৭৮ সালে, আবার ১৯৮৬ সালে সংশোধনী আনা হয়।

এছাড়া নারীর শ্লীলতা হানি বা অপমান করার জন্যও আইনী শাস্তি রয়েছে (ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৫৪ ধারা বলে)। এতে দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা দুটিই একসঙ্গে হতে পারে। ৩৫১ ধারা মতে কেউ যদি ইচ্ছা করে ভাবভঙ্গি প্রকাশ করে মেয়েদের ভয় প্রদর্শন করে বা শ্লীলতাহানির ভাব করে তাতেও সেটা তার অপরাধ বলে গণ্য হবে। এছাড়া মেয়েদের রয়েছে ভরণপোষণ পাবার অধিকার, স্বামীর কাছ থেকে — ছেলের কাছ থেকে। রয়েছে দত্তক নেবার অধিকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত অধিকারে সজ্জিতা হয়েও

মেয়েদের অবস্থা সমাজে সমস্ত দেশে আজো অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। নানা আইনের উপস্থিতি সত্ত্বেও কার্যত এসব আইনের কোন সুফল মেয়েরা ভোগ করেন না বরং গত এক দশকে নানা ধরণের নীতিহীনতা, চোরাচালান, ড্রাগস, মাদকাসক্তির সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে দ্বিগুণ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় প্রতি ৪৭ মিনিটে দেশে একজন অপহৃতা হন। এ সময়েই স্বামীর বা নিকট আত্মীয়ের হাতে লাঞ্ছিতা হন একজন মহিলা। প্রতিদিন অন্তত ১৭টি পণ প্রথাজনিত মৃত্যু ঘটে। ১৯৯৩ সালে দেশে মোট ৮২ হাজাব ঘটনা নথীভুক্ত হয়েছিল। সর্ব ভারতীয় বিচারে এই সংখ্যা প্রতি লাখ মহিলা পিছু ৯.১। এখন কথা হচ্ছে, দেশের জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশ মহিলা। যদি মহিলাদের সমানভাবে উন্নতি প্রগতি সম্মান নিরাপত্তা নিশ্চিত না হয় তবে দেশের উন্নতি হতে পারে না। এজন্যই ১৯৬৪ সালের ১৪ই জুন স্থাপিত হয়েছিল Department of social security ।পরে সেটাই ১৯৬৬ সালে হলো Department of social welfare এবং ১৯৭৮ সালে এটিকে আলাদা মন্ত্রকের গুরুত্ব এবং সম্মান দিলেন ভারত সরকার।

১৯৫৩ সালে দেশে মহিলা এবং শিশুদের যারা সমাজে সবচেয়ে দুর্বল, শোষিত, অবহেলিত এবং বঞ্চিত তাদেব উন্নতি এবং বিকাশের জন্য স্থাপিত হলো Central Social Welfare Advisory Board বা কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ। অজস্র স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে এবং প্রতি রাজ্যে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের রাজ্য শাখা সংস্থার মাধ্যমে নারীর উন্নতির জন্য, নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য কাজ চলেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে দুর্ভাবনার বিষয় হচ্ছে যে হাবে ভারতীয় নারী এবং শিশুদের উপর একক বা সংঘবদ্ধভাবে অত্যাচার অবিচাবের মাত্রা বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিরোধমূলক বা প্রগতিমূলক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এজন্য তীক্ষ্ণ সচেতনা, উপযুক্ত শিক্ষা সাক্ষরতা এবং বলিষ্ঠ প্রতিবাদ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আজ এক জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বড কথা হচ্ছে আইন তৈরী করে বা চালু করে সমাজে পবিবর্তন বা উন্নতি আনা সম্ভব নয়। সমাজকে এজন্য গ্যারান্টি দিতে হবে, সমাজকে গ্যারান্টার বা আইনের রক্ষক হতে হবে। কারণ দেশে ক্রমশ স্ত্রী প্রহার, বলাৎকার, স্ত্রীদের পুড়িয়ে মারা, পণ প্রথাজনিত বধূ অত্যাচার, বধূ হত্যা বাড়ছে। বিবাহোত্তর জটিল পারিবারিক সমস্যাও উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এতদিন পরেও দেখা যাচ্ছে কোথাও সতীপ্রথার মতো কুপ্রথা বা ডাইনী বলে চিহ্নিত করে যৌন জিঘাংসা বা সম্পত্তিতে বঞ্চিত করার কু-মতলব মেটানোর প্রচেষ্টায় মহিলাদের অশ্লীলভাবে অপমাণিত করা বা পিটিয়ে মেরে ফেলা। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার কোন পুরুষ কোনখানে কখনোই 'পুরুষ' ডাইন বলে চিহ্নিত হয় না। সবটাই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের ঘটনা।

দুঃখ হয় যখন দেখা যায় ১৯৭৫ সালের আন্তর্জাতিক মহিলা বৎসরে গৃহীত সমান কাজে সমান মজুরী আইন চালুর পরও দেশে চলছে মহিলাদের জন্য অসম মজুরী। মাঠের

কাজে পুরুষের তুলনায় মেয়েরা বা দালান-কোঠা তৈরীতে পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় মেয়েরা এখনো কম মজুরী পাচ্ছেন। ওপরের মহলেও নিত্যদিন চলছে মেয়েদের উপর মানসিক নির্যাতন, কাজের জায়গায় অপমান লাঞ্ছনা, যৌন নিপীড়ন বা প্রায়ই মুখ খুলে বলা যায় না, সবাই বলতে পারেন না, বিশেষভাবে ভয়ে লজ্জায়।

সেদিন স্থানীয় 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় ইন্দ্রগুপ্তের লেখা দিল্লীর চিঠিতে দেখা গেল বিকৃত যৌনকামীদের শিশু কন্যার উপর বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার। এসব বিষয়ের পেছনে রয়েছে মহিলাদের সম্পর্কে উপযুক্ত সম্মান ও মূল্যায়ণের অভাব, আইনেব শিথিলতা। এবং এটা সম্ভব হচ্ছে মেয়েদের তেমন ব্যাপক শিক্ষা দীক্ষা এখনো সম্ভব হয়নি বলে। এ বিষয়ে পুলিশী নিস্ক্রিয়তা এবং রক্ষক ভক্ষকের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। গত জানুয়ারী ১৯৯৫-এ রানাঘাটে রেল পুলিশের সংঘবদ্ধভাবে আশ্রয় প্রার্থী স্কুল বালিকার উপর অত্যাচার (যুগান্তব, ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৯৫) এ সমস্ত জঘন্য ঘটনার এক ভগ্নাংশের নিদর্শন মাত্র।

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ মেয়েদের উপর অত্যাচারের বিষয়গুলো সম্বন্ধে উপযুক্ত সচেতনতা গড়ে তুলতে এবং সামাজিক প্রতিবোধের মানসিকতা সৃষ্টি করতে ১৯৮২ সালে Voluntary action bureau গড়ে তোলেন। এরপর ক্রমশ প্রতি রাজ্যেই এর শাখা স্থাপিত হয়।

এ প্রকল্পের কর্মসূচী ও তার পরিধি প্রতিরোধ থেকে পুনর্বাসন পর্যন্ত বিস্তৃত। মহিলাদেব বিবাহোত্তর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, সুপরামর্শ দান, বিনা পযসায় আইনী সহায়তা, বিচার প্রার্থনা করে কোর্টে কেস লড়া, স্বামীর কাছ থেকে খোরপোয আদায়ে সাহায্য, আপৎকালীন সময়ে অল্প কিছু দিনের জন্য থাকার ব্যবস্থা (Short stay home) বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেব পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠাব ব্যবস্থা করা এ সবই Voluntary action bureau করে থাকেন।

কিন্তু এ ব্যাপারেও শিক্ষা সচেতনতাও সাক্ষরতার প্রয়োজন। কারণ ভুক্তভোগী পক্ষ এগিয়ে না এলে এই সেবা ব্যবস্থায়ও সাফল্য আসে না।

ত্রিপুবাতে এ উদ্দেশ্যে সাতটি পারিবারিক সহায়তা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এগুলো প্রাথমিকভাবে ত্রিপুরা সমাজ কল্যাণ পর্ষদ অফিসে, জনকল্যাণ সমিতি এ.বি.টিলা, অরুন্ধতী নগর, পরিচালিত কেন্দ্রে, ভাটি অভয়নগরে ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ পরিচালিত কেন্দ্রে, অরুন্ধতীনগর পুলিশ প্রধান কার্যালয়ে আর বাকী তিনটি ধর্মনগরে, মনুতলা জেলরোডে ব্লাইন্ড এন্ড হ্যান্ডিক্যাপ্ট এসোসিয়েশনের পরিচালনায় বিলোনীয়াতে কালীবাড়ি রোডে ইবাজিয়া মহিলা সমিতির পরিচালনায় এবং উদয়পুর মধ্যপাড়ায় আদিম জাতি সেবক সংঘের পরিচালনায় চলবে।

এই প্রকল্পে পারিশ্রমিক সহ কয়েক জন পরামর্শ দাতা যেমন আছেন তেমনি আছেন বিনা পারিশ্রমিকে সাহায্যকর্মী ডাক্তার, আইনজীবী সাংবাদিক এবং পরিচালক স্বেচ্ছাসেবী

সংস্থার সদস্য সদস্যারা। এই প্রকল্পকে জানবার, এ থেকে সাহায্য নেবার জন্যও মেয়েদের সাক্ষরতা সচেতনতার খুবই দরকার।

আজ নারী তার অধিকারকে সুযোগ সুবিধাকে বুঝে নিতে হবে। নারীকে সুযোগ দিতে ১৯৪২ সালের খনি আইন, ১৯৬১ সালের প্রসূতি ভাড়া আইন এবং ১৯৬৬ সালের সমান মজুরী আইন রয়েছে। ১৯৪৮ সালের কারগালা আইন তো আগে থেকেই বলবৎ আছে।

এই সব আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েদের কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষা করা, কাজ করতে গিয়ে যাতে মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনে অসুবিধা না দেখা দেয় তার ব্যবস্থা করা। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য কিছু সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। এই আইনের বলে সন্তান পালনের আগে পরে শ্রমিক কর্মচারী মায়েদের ছয় সপ্তাহ সবেতন ছুটি দিতে হবে। একটা প্রসূতি ভাতাও মায়েরা পাবেন তেমনি ছোট বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্যও ছুটি দিতে হবে। কর্মস্থলে ছয় বৎসর পর্যন্ত বয়সী বাচ্চাদের জন্য ক্রেশের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।আলো হাওয়া যুক্ত বড় ঘরে শিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী, বাচ্চাদের দুধ জল ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৬ থেকে ১২ বছরের বাচ্চাদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই। নারী শ্রমিকদের সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কাজ করানো নিষিদ্ধ। তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য কতকগুলো বিধি রয়েছে। এগুলো দেখার জন্য পরিদর্শকের ব্যবস্থা রাখাও আইনত প্রয়োজনীয়। এভাবে বিভিন্ন শ্রম আইনে মহিলাদের নানা ধরণের সুখ সুবিধা নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। কোন বিপদজনক কাজ বা রাত্রে শিফটে অথবা সন্ধ্যার পরে তাদের কাজে নিয়োজিত করার নিয়ম নেই।

মেয়েদের কাজে নিযুক্তির ব্যাপারেও কোন তারতম্য করা চলবে না। এই আইনে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। এই উপদেষ্টা কমিটি একটি শিল্প সংস্থায় কতজন নারী শ্রমিক আছেন সেখানকার কাজের প্রকৃতি সময় সময় নারীদের পক্ষে তার উপযুক্ততা, নারীদের জন্য বেশী সময় সুযোগ করে দেয়া আংশিক কাজের ব্যবস্থা করা যায় কিনা এসব বিচার করে দেখবেন। সংশ্লিষ্ট সরকার এই উপদেষ্টা কমিটির উপদেশ অনুসরণ করে মেয়েদের কাজের বিষয়ে এই সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। নিয়ম হলো উপদেষ্টা কমিটিতে কমপক্ষে ১০ জন সদস্য থাকবেন। তাছাড়া কারখানাতে কোন শিল্প সংস্থার কাজে নিযুক্ত কোনও শ্রমিক কোন দুর্ঘটনার দরুণ মারা গেলে তার জন্য মালিক যে ক্ষতিপূরণ দেয় তা তার উপর নির্ভরশীল বিধবা স্ত্রী মা ও মেয়ে ইত্যাদি পাবেন।

এভাবে মেয়েদের স্বার্থ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য রয়েছে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৩। এই আইনে মেয়েরা তাদের বাবা মার সম্পত্তি ওয়ারিশ সূত্রে ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে পাবেন। এ বিষয়ে অনেক ধারা উপধারা আছে। সকলেই নারী জাতির স্বার্থে রচিত। ১০ম ধারা অনুযায়ী মেয়েরা সমান উত্তরাধিকারিণী যেমন হতে পারবেন তেমনই ১৮ (১) ধারা অনুযায়ী হিন্দু স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে যাবজ্জীবন ভরণপোষণ লাভ

করবেন। ১৮ (২) ধারা অনুযায়ী হিন্দু স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদাভাবে থাকলেও ভরণপোষণের অধিকার হারাবেন না যদি কোন স্বামী বিনা কারণে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা পূর্ব স্ত্রী জীবিত থাকে, ঘরে রক্ষিতাকে স্থান দেন, অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হন, যথাযোগ্য কারণে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহবাসে অক্ষমল হন এছাড়া রয়েছে ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন। হিন্দু মহিলাদের জন্য এই আইন যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। এই আইন যারা বিশেষ বিবাহ আইনে (Special marriage act) বিবাহিত তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হিন্দু বিবাহ আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিয়ের প্রমাণে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য এটা নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

আসলে প্রতিটি বিয়েই পরে রেজেস্ট্রী করিয়ে নেয়া বাঞ্ছনীয়। হিন্দু বিবাহ আইনে বিয়ের জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। নিষিদ্ধ সম্পর্কগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ না করে দ্বিতীয় বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। অথচ আজকাল দু'একটি সন্তানসহ বিবাহিতা স্ত্রীকে ফেলে দিয়ে বিয়ে করা বা ছেড়ে যাওয়া সর্বদা ঘটছে। অসুবিধার ক্ষেত্রে বিয়ে নাকচ করারও সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এছাড়া স্ত্রীকে প্রহার করা আঘাত করাও আইনত দন্ডনীয়। ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ৩১৯ নং ধারা মতে স্ত্রী প্রহার অপরাধ। যখন শারীরিক ক্ষতি বা গুরুতর ক্ষতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে করা হয় তখন ভারতীয় ফৌজদাবী আইনের ৩২৩ নং ধারা মতে স্বামীর এক বৎসরের জেল অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুই-ই হতে পারে। মুসলিম মহিলা আইন ১৯৮৬ তে বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ক ৩টি ধারা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহম্মদ আমেদখান বনাম শাহবানু বেগম ও অন্যান্য মামলায় (এ আই আর ১৯৮৫ এ, সি ৯৪৫) সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন তা নিয়ে দেশে তোলপাড় হয়েছিল। মুসলিম আইনে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেয়ার জন্য স্বামীর দায়িত্ব ইদ্দতকাল (বিচ্ছেদের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে সন্তান জন্ম পর্যন্ত সময়ই ইদ্দতকাল) পর্যন্ত সীমায়িত। সুপ্রীম কোর্ট স্বামীর এই দায়িত্বকে ১৯৭৩ এর কোড ক্রিমিনাল প্রসিডিও ব এর ১২৫ ধারা মতে প্রসারিত করে বলেন যে ইদ্দতপর্বের পরও সামর্থ্য না থাকলে স্ত্রী সি আর পি, সি ১২৫ ধারার সাহায্য নিয়ে ভরপোষণ পেতে পারেন। এই মামলার বিতর্ক দেশবাসীর সকলেরই জানা আছে।

এভাবে নারীর জন্য বহুবিধ আইনের উপস্থিতি সত্ত্বেও তাদের অসহনীয় দুর্গতির কথা আজ কারো অজানা হয়। নারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা আর্থিক স্বয়ম্ভরতা এবং শিক্ষা আজ এজন্যই এ জরুরী বলে অনুভব করা হচ্ছে। কারণ এছাড়া আর উপায় নেই। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা না বাড়ালে তাদের উপর অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধের বিকল্প পথ আজ খোলা নেই। অবশ্য সামগ্রিক উন্নতি আনতে হলে একযোগে সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং প্রতিটি দায়িত্বশীল সচেতন হৃদয়বান পুরুষ নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে দেশের উন্নতি ও প্রগতির স্বার্থে।

জীবন যেখানে দিগন্ত প্রসারিত

নজরুল জন্ম শতবর্ষে আজ কবি নজরুলের প্রতিভা এবং ব্যক্তি পরিচয়ের বিভিন্ন দিক অপার শ্রদ্ধা এবং প্রীতিতে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখ হয় যখন তার এই পরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রেক্ষিতে তাঁকেমুলত 'বিদ্রোহী কবি' বা 'সঙ্গীতেব বুলবুল ' গোছের অভিধায় তুলে ধরা হয়। বহুদিনের এই বাঁধাধরা পরিচয়ে তিনি বাংলদেশে প্রশংসা পেযে আসছেন। ইদানীং কেউ কখনো সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কবি বলেও তাঁকে আলোচনা করছেন। কিন্তু এইসব পরিচয় তাঁর খন্ডিত পরিচয়, সমগ্র সত্য নয়। তিনি ধর্ম, সম্প্রদায় এবং ভেদাভেদের শুধুমাত্র বিরোধী নন - তিনি এসবের অনেক ঊর্ধ্বে।

মনস্বীতায মহত্তম মানবতায় উত্তীর্ণ নজরুল কি নিছক বিদ্রোহী? জীবনের সবদিক জুড়ে তাঁর পদচারণা। তাই আজও জনমানসে তাঁর নিরন্তর উপস্থিতি প্রমাণ করে এ প্রশ্নের উত্তর নঙর্থক। তিনি বিদ্রোহী কবি নন তিনি একজন বিপ্লবী কবি। আব এই বিপ্লব শুধু সাময়িকভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনে বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বাঁধভাঙ্গা প্রতিবাদ বা তাৎক্ষণিক ভাবাবেগে বিদ্রোহ নয়, 'কারার ঐ লৌহকপাট' ভেঙ্গে পরাধীন ভাবতে স্বাধীনতা আনার জনা জনশক্তিকে জাগ্রত করা নয়, তাঁর দুর্দমনীয় অজেয় পৌরুষ এবং মনুষ্যত্ব প্রকাশ পেয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ ন্যায়ধর্মী যুক্তিবাদী মানবিক চিন্তা চেতনার স্বাধীন স্ফুরণে দুঃসাহসিক বিপ্লবে। সেদিন সমস্ত ভারবর্ষে স্বাধীনতা স্পৃহা দেশমাতৃকাব শৃঙ্খলা মুক্তির প্রচেষ্টা নানা জাতি ধর্মনিরপেক্ষ স্রোতে একত্র হয়ে প্রকাশিত হয়েছে সত্যি কিন্তু তা অনৈক্য ভুলে নয় তাকে সঙ্গে নিয়েই। তখনও পাশাপাশি তীব্র জাতপাত ভেদাভেদ নিম্নবর্ণের প্রতি আকণ্ঠ ঘৃণা সেই মান্ধাতার আমল থেকে বয়ে আসা চেহারারই প্রকাশ পেয়েছে। জনসাধারণ্যে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমানের প্রতি অমানবিক ঘৃণা, অবহেলা বর্ণনাতীত ছিল।

সেসময় কোন বড় নেতা মাঠ ঘাটের স্বাধীনতা সংগ্রামী কর্মী কেউই এই আচার আচরণ বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠানে একটি খড় কুটোতেও হাত দেননি -- বা দিতে সাহস করেন নি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বারবার তাঁর কাব্য কবিতায় জাতীয় চেতনার গোড়ায় আঘাত দিয়েছেন। বলেছেন ঘৃণা অবহেলায় অপমানিত করে যাদের পিছনের সারিতে রাখতে চাইছো অপমানে একদিন তাদেরকেই সমান হতে হবে। এই ভবিষ্যৎ বাণীও অন্যায়কারীদের

জন্য খুবই মৃদু চেতাবনী।

আমরা আবেগপ্রাণ শিক্ষিত জনসাধারণ তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি — মুখস্থ করেছি, সভায় আসরে আবৃত্তি করে হাততালি কুড়িয়েছি। সে সময় এত পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল না। আজ গাদা গাদা পুরস্কারও মিলছে। কিন্তু সেদিন আমরা এই ভাবধারাকে কর্মে অনুদিত করতে প্রয়াসী হইনি বা সক্ষম হই নি। আসলে শতাব্দীবাহিত এই অচলায়তনের গায়ে হাত দিতে সাহসই করি নি।

কিন্তু সেখানে আজ থেকে কত বৎসর আগে নজরুল জাতপাত ভেদাভেদের এই মানবতা বিরোধী চিন্তা চেতনা, এই প্রথার বিরুদ্ধে কি অসম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তা ভাবা যায় না। আজ-কালকার দিনে এমনভাবে বাস্তবকর্মে লেখায় ঝাঁপিয়ে পড়লে যে কোন সম্প্রদায় থেকে তিনি হয়তো খুন হয়ে যেতেন।

সাম্যবাদী অনেকেই হতে পারি কিন্তু ধর্মে আঘাত? নৈব নৈব চ। নজরুল সিংহ গর্জনে সোচ্চার হয়েছিলেন 'কে তুমি? পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল গারো?/ কনফুসিয়াস? চার্বাক চেলা? বলে যাও বল আরো/বন্ধু যা খুশী হও/পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা খুশী পুঁথি ও কেতাব কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক/জেন্দাবেস্তা গ্রন্থসাহিব পড়ে যাও যত সব/ কিন্তু কেন ও পন্ডশ্রম মগজে হানিছ শূল?/ দোকানে কেন এ দর কশাকশি? পথে ফুটে তাজা ফুল।/তোমাতে রয়েছে সকল সকল কেতাব কালেব জ্ঞান/সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ।

এই তাজাফুল নজরুল দেশবাসীকে বলেছেন ঃ

'কেন খুঁজে ফেব দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ায় নিভৃত অন্তরালে?'

নজরুল শুধু লিখে ক্ষান্ত হন নি। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ক্ষুরধার জ্বলে উঠেছিল। কৃষ্ণনগরে যখন ছাত্র যুব মহিলাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল নজরুল সেখানে তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ছিলেন। সম্মেলনেব উদ্বোধনী সঙ্গীত ছিল তাঁরই গান 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু ...।' জন্মে তিনি মুসলমান ছিলেন এটা সাংসারিক সত্য কিন্তু তিনি সদ্যোজাত শিশুর মত কোন ধর্মের পরিচয়ে চিহ্নিত ছিলেন না। মায়ের পেট থেকে কোন শিশু ধর্মের পরিচয়ে চিহ্নিত ছিলেন না। মায়ের পেট থেকে কোন শিশু ধর্মের বা বর্ণের ঐতিহ্য নিয়ে আসে না। জন্মের পর মানুষ তাকে চেষ্টায় কষ্টে দীক্ষিত করে। সে তারপর এই তৈরী পরিচয়ের ধারা বহন করে চলে। এতে কোন পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নেই এখানে আকস্মিকতাই কাজ করে। মধুসূদনও তাঁর ধর্মকে অস্বীকার করেছিলেন নিতান্ত ব্যক্তিগত খেয়াল অভিরুচিতে আপন প্রয়োজনে তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। হিন্দুর সনাতন চিন্তা চেতনায় তিনিও আঘাত করেছিলেন কাব্যে কবিতায়। এছাড়া ধর্মের প্রতি তাঁর কোন সমালোচনা ছিল না — না প্রশংসা না অপ্রশংসা।

সে অর্থে নজরুল আদৌ মুসলমান ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি নিজে কোন

ধর্মাচরণ করতেন না। অবশ্য তাই বলে ধর্ম তাঁর কাছে অবহেলার বস্তু ছিল না। ইসলাম ও হিন্দুধর্মে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর রচনা থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। দুটি ধর্মেরই সুগভীর মানবিক আবেদন তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল--তাই বাহ্য ভেদাভেদ তাঁর অন্তর থেকে মুছে গিয়েছিল। সেজন্যই তাঁর লেখা শ্যামা সঙ্গীত প্রসিদ্ধ কালী ভক্ত সাধক গায়কদের বচনার সমতুল্য ।কোন অংশে কম নয়।

তাঁর সাহিত্য তাঁর জীবন সবই ধর্মনিরপেক্ষ মুক্ত মনের মানুষের উজ্জ্বল প্রকাশ। বিয়েও করেছেন ধর্ম নিরপেক্ষ মতে। শ্রীমতী আশালতা সেনগুপ্তাকে নামান্তরিত করেছেন প্রমীলা সেনগুপ্তা বলে। বিদ্রোহী মুক্ত মানবিক পরিচয়ের ছবি তিনি দেখেছিলেন মধুসূদনের প্রমীলা চরিত্রে যিনি দৃপ্ত উচ্চাবণে বিপক্ষ বাম লক্ষণদের শাসিয়েছেন 'রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?' নজরুলও ভরসা রেখেছিলেন তাঁর প্রমীলাও তাঁকে পতিত্বে বরণ করার দুঃসাহসিকতায়, ঘটনার অভিনবত্বে তাঁকে স্বামী প্রেমে, প্রাগ্রসর প্রমীলাব মতোই যুদ্ধ যাত্রায় দুর্জয় হবেন।

অবশ্য ঘটনার দিক থেকে হিন্দু মুসলিমের বিয়ে ভাবতবর্ষে এমন কিছু নতুন বা বিরল ঘটনা নয। বহুজনেই এভাবে বিযে কবে সংসাব পেতেছেন, ছেলেমেয়ে নিযে বিচ্ছিন্ন একক সংসার যাত্রায সুখী বা দুঃখী যা হবাব হয়েছেন, সেটা ছিল তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাঁর হিন্দু বা মুসলমানেব মনেব দবজায কখনো তেমন করে কড়া নেড়ে বোধবুদ্ধির গোড়ায় বিবেক জাগানোব খোঁচা দেননি। বলেননি 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান'। জাতিভেদ নেহাৎই পছন্দানুসাবী ব্যাপাব। বাগানে বিভিন্ন ফুলেব বিভিন্ন রঙে প্রকাশের মতো নেহাৎই একটি বাহ্যিক, এতে মূল মানবিক গুণগত ব্যাপারে কোন বৈষম্য ঘটে না। সুতরাং এই ভেদ দূর করো। সংযত হও--সচেতন হও মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হও।
ইসলাম যে কত মহৎ ধর্ম কত উদার কত মানবিক তাঁব বিভিন্ন কবিতায় মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে এ কথা বারবার শুনিয়েছেন। ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হতে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন।

সেজন্যই অন্যদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। আর এ জন্যই তিনি শুধু বিদ্রোহী কবি নন--সঙ্গীতের বুলবুল নন--চিন্তা চেতনায় তিনি বিশ্ব মানবের পূর্ণাঙ্গ বিবেক। যার কোন বিশেষ জাতধর্ম নেই--যিনি প্রকৃত অর্থে একজন সম্পূর্ণ মানুষ। তাই আমাদের দেশের পট ভূমিকায় নজরুলের মত ব্যক্তিত্ব আজ কাল পরশু সব কালেই অতি আবশ্যকীয়। শুধু এ দেশে নয় সমগ্র উপমহাদেশের বিবেক জানাতে এমনই ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষের প্রয়োজন। আজ দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ভয়াবহ। প্রতি বছর গড়ে ২৫০টি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির ঘটনা ঘটে। এতে প্রাণ হারায় অন্তত ৫০০ মানুষ। পুলিশ প্রশাসনের মদতেই দেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটছে। কাজেই আজ নজরুল জীবনদর্শনের আলোচনা তাঁর কাব্য কবিতা তাঁর উদ্দেশ্য লক্ষ্যের চর্চা খুব প্রয়োজন।

নুতন প্রজন্মকে আজ বোঝানো দরকার ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষই আধুনিক মানুষ। মানুষের জীবন আজ মধ্যযুগের মত একরোখা ধর্ম নির্ভর নয়। বিজ্ঞানধর্মী মানুষই আজ

প্রকৃত মানুষ। ধর্ম থাকতে পারে--থাকুক, সংস্কৃতির একটা পরিচয় হিসাবে আত্মোন্নতির উপায় হিসাবে। তা কখনই উৎকট প্রচারমুখী, মানুষকে আক্রমণমুখী যেন না হয়। ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে যেহেতু আমরা আধুনিক মানুষ বলছি তাই ছাত্র এবং যুব সমাজকে চিনে চলতে হবে কোনটা ধর্মনিরপেক্ষ মুখ, কোনটা ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ।

এই চর্চায় আমরা এখনো যেতে পারছি না। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে নজরুল জন্ম শতবর্ষে আজ দেশ জুড়ে অগণিত ছোট শিশুরা বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় সামিল হচ্ছে। মা বাবা বহু উৎসাহে সন্তানের সম্ভাব্য পুরস্কার প্রাপ্তি আশায় সোৎসাহে যোগদান করছেন। ভুলেও নজরুলের গল্প শিশুদের বলছেন না।

বহু বালক, কিশোর, যুবক বিভিন্ন গ্রুপে নজরুলের কবিতা মুখস্থ করে এসে আবৃত্তি করছে। এরাও নজরুল সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু জানে না। তারা জানে নজরুল বিদ্রোহী কবি যিনি লিখেছেন ‘বল বীর চির উন্নত মম শির...’ কে তিনি, কেমন মানুষ, এই মানুষটির সঠিক ভূমিকা কি সবই তাদের অজানা।

নিঃসন্দেহে এদের যোগদানে জন্মজয়ন্তীর ভিড় বাড়ছে কিন্তু নূতন প্রজন্মের মানসভূমি গঠনে আজ ধর্ম নিরপেক্ষতা সহিষ্ণুতা এবং সঠিক মানব ধর্মের আদর্শকে তাঁর জীবনের আলোকে তুলে ধরতে হবে। এতে কোন ভুল নেই। গান্ধীজীর ‘আমার জীবনই আমার । বাণী’র মতো নজরুলের জীবনকে জানলেও তাঁর বাণীকে জানা হবে যা প্রতিটি চেতনা সম্পন্ন মানবিক ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের আচরণীয় আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। সে জন্য আজ দরকার সঠিক নজরুল চর্চার।

নজরুল এখনো তাঁর যোগ্য সম্মান পাননি। এজন্য দায়ী তাঁর ঢিলেঢালা ভাবে ভোলা স্বভাব যা মানুষের কাছে তাঁর প্রতিভা এক উচ্চ দর্শনকে আড়াল করে রেখেছিল। সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন প্রতিভা থাকলেই হয় না সঙ্গে গৃহিনীপনার দরকার। এই গৃহিনীপনা নজরুলের ছিল না। তাঁর ভাষা যেন আমোদে ভাব সহজ সরল চলা আড্ডা প্রিয়তা তাঁকে সাধারণ্যে অসাধারণত্বে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা করেনি। হাতের কাছের মানুষ যে কত বড় মানুষ এটা অনেকেই ভেবে উঠতে পারেন নি।

আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে নজরুলের নাম উচ্চারণ করি। অথচ নজরুল ইসলাম যে রবীন্দ্র পরিমন্ডলের বাইরে একটা স্বাধীন ঘরানা তৈরী করেছিলেন যা আগে সে- ভাবে ছিল না। যাবতীয় সৃষ্টি ও কর্মের মধ্যে, অপরিসীম দুঃখ দারিদ্র্য ও আঘাতের মধ্যেও তিনি যে একটা প্রাণের গতিবেগ এনেছিলেন তাঁর সঙ্গীত সাহিত্য দর্শন তাঁর ধারাবাহিক আপোষহীন জীবণ সংগ্রাম তাঁর যা অনুকরণ করা যায় না--একথাটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি আমরা।

এমন উদার সংস্কার মুক্ত বিদ্রোহী তথা বিপ্লবী মানুষটিকে সাময়িক বলে উপেক্ষা করা যায় না। যে ত্রুটি এতদিন আমাদের উচ্চবর্গের অনেক বুদ্ধিজীবী এ যাবৎ দেখিয়ে এসেছেন। বাংলা সাহিত্য বাঙালী সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিশেষ যুগের

প্রেক্ষিতে অবিচ্ছেদ্য কাজী নজরুল। তাই আরেক মহান অসাম্প্রদায়িক কবি অন্নদাশঙ্কর কৌতুক করে বলেছেন-- 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল, আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে ভাগ হয়নিকো নজরুল, নজরুল ভাগের মা নন তিনি অবিচ্ছেদ্য মহাত্মা পুরুষ।

আগেই বলেছি সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর চারিত্র্যে সীমাহীনতা, না মুসলিম না হিন্দু, ধর্ম নিরপেক্ষথার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে জাতিভেদ ব্যবস্থায় ছাত্রদের ভিন্ন পাতের ব্যবস্থা রেখেছিলেন--ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের পাদস্পর্শে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মেয়ের বিয়েতে পণপ্রথা মেনেছিলেন। অল্প বয়সের কন্যাকে পাত্রস্থ করেছিলেন। প্রচলিত সংস্কারের ঊর্ধ্বে যেতে পারেন নি। সেখানে নজরুল কি তুমুল আলোড়নে বাঁধভাঙ্গা বন্যা আনতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ধুমকেতুকে চিনেছিলেন বলেই জীবনমুখী এই কবিকে আহ্বান করেছিলেন 'আধারে বাঁধ অগ্নিসেতু/দুর্দিনের এই দূর্গ শিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন' বলে ভার দিয়েছিলেন 'জাগিয়ে দে রে চমক মেরে আছে যাবা অর্দ্ধচেতন'। এই চমক মারবার ক্ষমতা নজরুলের ছিল। এই যে দায়িত্ব পালনের শুরু তিনি করেছিলেন তার শেষ হয়নি। আরো অনেক করার ছিল তাঁর। ভাগ্য তাঁর পথ প্রতিবন্ধকতায় ভরে দিয়েছিলেন। তবু যেটুকু সময় হাতে ছিল তিনি সেটা আবেগে উদ্দীপনায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সঠিক গৃহিনীপনা হয়ে ওঠেনি।

ঠিকমতো টাকাপয়সাও তিনি পাননি। জীবন জোয়ারে ভালোবাসায় প্রেম উদ্বল হয়ে ভেসে গেছে। তাঁর দর্শনই ছিল কি পাইনি তাঁর হিসাব মেলাতে 'মন মোর নহে রাজী'। অথচ তাঁর মূল্যায়নের অনেক বাকী। বিশেষ কবে তাঁর অসাম্প্রদায়িক সম্পূর্ণ সংহতির মনোভাবকে, ধর্ম নিরপেক্ষতাকে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। মুসলিমরাও যে ইসলাম ধর্মের মূল তত্ত্ব কথা জানেনা তা তাঁর অজস্র কবিতায় লাইনে লাইনে উচ্চারণ করে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। ক'জনে সেটা পড়েছেন? শুধু ভারতে নয় অনুবাদের মাধ্যমে এদেশে এবং এই উপমহাদেশের যেখানে মুসলিম জনসাধারণ আছেন তাদের মধ্যেও তাঁর সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ এবং মুক্ত আধুনিক মনোভাবের পরিচয়কে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র চিন্তাধারায় আবদ্ধ মৌলবাদী হিন্দুদের কাছেও উদারবাদী একজন মুসলিম যিনি হিন্দু না হয়েও বড়ো হিন্দু। তাঁর চিন্তাধারা হিন্দুধর্মেব প্রতিও যে অনুরূপ শ্রদ্ধাশ্রীল সেটাও নতুন করে তুলে ধরতে হবে।

এ কাজে ব্রতী হয়ে আমরা যতটা সার্থক হতে পাববো ততটাই আমাদের নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং কর্তব্য পালন করা হবে।

জীবনের পথ সংগ্রাম চেতনায়

সার্বিকভাবে মানবজীবনে আজ এক গভীর বৈপরীত্য চলছে। পৃথিবী আজ একদিকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিক্ষা-সভ্যতায় উন্নতির শীর্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। শিল্প কাব্য সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সুউচ্চ পরিমন্ডলে মানুষ বাস করছে। আরেকদিকে মানুষ অভাবে অনটনে সামাজিক অন্যায় অবিচারে গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। হিংসা দ্বেষ খুনোখুনি বোমাবাজি নরহত্যার মিছিল মানুষের জীবনকে অশান্তির আগুনে দগ্ধ করছে। দিকে দিকে মানবতার চরম অপমান মানুষকে কলঙ্কিত করছে।

শুধু একটি রাজ্য, একটি রাষ্ট্র নয়, সমস্ত পৃথিবীতে খানে খানে আজ এই চিত্র। শ্রীলংকা থেকে ভারতের নানা রাজ্যে, মায়ানামার, আফগানিস্থান, আফ্রিকা, বসনিয়া, রাশিয়া ইত্যাদি বহু স্থানে আজ হানাহানি, উগ্রপন্থা চলছে ভীষণভাবে।
এর পিছনে শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার আগ্রাসী দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা আর এগুলোই পাশবিক দৌরাত্ম্যের উৎসস্থল।
শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিঁকে থাকার জন্য মানুষের আদর্শহীনতা আজ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বিমূঢ় করে তুলছে। রাজনীতির সঙ্গে অন্ধকার অপরাধ জগতের আঁতাত মানুষকে আতঙ্কিত করছে। মাছি মশা মারার চাইতেও সহজ এবং নির্দ্বিধায় মানুষকে খুন করছে মানুষ।

সামাজিক ন্যায় বিচারের অভাবে অর্থ পুঞ্জীভূত হচ্ছে সামান্য কিছু ক্ষমতার প্রকৌশলীদের হাতে। যাদের বিবেক বুদ্ধি আজ সব ভোঁতা। অন্যকে সার্থকভাবে ঠকিয়ে নিশ্চিহ্ন করেই তাদের গর্ব এবং আনন্দ। দেশের উন্নতি, মর্যাদা এবং দেশবাসীর প্রতি তাদের প্রীতি ভালবাসার মানসিকতা পক্ষাঘাতগ্রস্থ। কর্মহীন বেকার যুব শক্তিকে বঞ্চিত পশ্চাদপদ মানব শক্তিকে এরা হাতের মুঠোয় এনে স্বার্থ আদায় করে অন্ধকারের গর্ভে ঠেলে দিচ্ছে।

সম্পদশালী মানুষের অপরিমিত লোভ এবং আদর্শহীনতা আজ সমস্ত মানবসমাজকে সৎ চিন্তা বিমুক্ত অস্থির চঞ্চল করে তুলেছে। প্রশ্ন জাগে এরা কি সত্যি এই দানবীয় পরিস্থিতিতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে অর্থ ক্ষমতা ভোগ করতে পারবেন? যে গাছের ডালে বসে আছেন সে ডাল

কেটে কি তারা সুখে থাকবেন ? মানুষের প্রতি প্রতিবেশীর প্রতি, দেশবাসীর প্রতি ভালবাসা না থাকলে আর যাই হোক স্বস্তি ও আনন্দ কোনদিন আসবে না।

আজ দিকে দিকে এই অনাকাঙ্খিত পরিবেশের বীজ রোপিত হয়েছে বহু আগে, যার ফলে আজ আমরা দুর্ভোগ পোয়াচ্ছি। এই অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিক সার্বিক এবং সর্ব জাগতিক ভিত্তিতে উন্নয়নে ইউনেস্কো দু হাজার সালকে ঘোষিত করেছে 'A year of culture for peace'। ডাইরেকটার ফ্রেডরিক মেয়র বলেছিলেন, আমরা দু হাজার সালে শান্তির জন্য সংহতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো। সমস্ত দু হাজার সালে সারা পৃথিবীতে কি ঘটে গেল কি ঘটছে একটু বিচার করলে আমরা দেখতে পাবো এই ছোট্ট ত্রিপুরায় আজ দু দশকের উপর হয়ে গেল অশান্তির আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছে।

এই ভূখন্ডে বসবাসকারী দুটি সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু বাঙালী এবং সংখ্যালঘু উপজাতি আজ বহুদিনের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ মিলিত জীবনযাত্রায় পুরনো ঐতিহ্যকে পাশে সরিয়ে রেখে একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস বেদনায় ভুগছে।

বহুদিনের বঞ্চিত উপজাতি সমাজে কিছু বিভ্রান্ত যুবক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল নিজেদের স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ে নেবেন সেখানে থাকবে তাদের প্রাধান্য, মুছে যাবে সব আর্থিক সামাজিক অন্যায় অবিচার। সে স্বপ্ন সফল হয়নি কারণ এ ধরণের সফলতা লাভের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তারা আজ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারী গোষ্ঠীর হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। কিছু লুঠেরা গুন্ডা হয়ে নির্বিচারে জঘন্য খুন--অপহরণ করে সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন করছে। এতে উভয় সম্প্রদায়েরই দুষ্ট শক্তি নিযুক্ত আছে।

মাঝখান থেকে দরিদ্র পশ্চাদপদ উপজাতি সম্প্রদায় আজ সমস্যার ঘুর্ণিজালে সর্বহারা হতে চলেছেন। শিক্ষা দীক্ষা রুজি রোজগার আজ সবই বন্ধ হওয়ার মুখে। তারও চাইতে বড়ো কথা নিরীহ দরিদ্র উপজাতিবা আজ অতর্কিত চলাচলের পথে মৃত্যুব শিকার হচ্ছে। যাদের তথাকথিত উগ্রপন্থীদের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। উগ্রপন্থীদের ভয়ে পার্বত্য অঞ্চলে শত শত স্কুল আজ বন্ধ। গত এক দশকে রাজ্যে উপজাতি অ-উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনহানির সংখ্যা প্রায় সমান। উন্নয়নের কাজকর্মও নিদারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

ত্রিপুরায় একদিকে যখন চলছে প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জন্মজয়ন্তীর সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত-আবৃত্তিমূখর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তখনই অন্যদিকে চলেছে লুঠতরাজ, অপহরণ জাতি-উপজাতি নিরীহ মানুষের প্রাণ ধ্বংস। অনেক দেখছি, সহ্য করছি এবং ভিতরে ভিতরে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। সর্বক্ষেত্রে এই জ্বালা, যন্ত্রণা, ঘৃণা প্রাণের উষ্মা প্রকাশ করছি আমাদের শিল্প সাহিত্য দিয়ে। দুঃখ হয় যে এই সব লুটপাট, অপহরণ, নরহত্যার পিছনে কোন যুক্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে কোন সাহসিক আত্মত্যাগ বা কোন গঠনমূলক গভীর পরিকল্পনা আছে বলে বিশ্বস করার কোন অবকাশ নেই।

এই উগ্রপন্থার পিছনে যদি সমাজের বঞ্চনা শোষণজনিত কোন দুঃখ বা জ্বালা বা এ

সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা অথবা এ বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করে মনের খেদ মেটানোর চেষ্টা ইত্যাদি যে কোন কিছু কারণকেই দায়ী ধরে নেয়া যায় তবে এর উত্তরে শুধু একটি কথাই বলার থাকে যে, এর দ্বারা তাদের জন্য কোন ফলদায়ী স্থায়ী সমাধান আসবে না-- উন্নতি প্রণতি তো নয়ই। 'খুনকা বদলা খুন' করে আজ পর্যন্ত কোন অন্যায়ের প্রতিকার হয়নি।

এতে শুধু অপরাধের বোঝা ভারী হয়, গ্লানি বাড়ে। চারপাশে নিরীহ জনজীবনের শান্তি বিঘ্নিত হয়। পবিস্থিতি অস্বাভাবিক অসুন্দর জটিল হতে থাকে। যে কোন দাবীদাওয়া আদায় করতে হলে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে, অহিংসার পথে, প্রীতিপূর্ণ উপায়ে অথচ সুকঠোর নিষ্ঠায় দৃঢ়তায় তা আদায় করে নিতে হবে। ইতিহাস তাই বলে। সেটাই শ্রেষ্ঠ পথ। এছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। এ জন্য সকলকে এক মতে এক পথে একত্রিত হতে হয়। এজন্য সংঘবদ্ধ সাধনার পথে যেতে হয়। সেটা মানুষ মেরে ফেলার চাইতে অনেক কঠিন কাজ। প্রতিষ্ঠা কেউ কাউকে সহজে হাতে তুলে দিতে চায় না। তাই এগুলো সবক্ষেত্রেই অর্জন করতে হয়। সেই অর্জনের পথটাই বাছতে হবে। হরণ, ধর্ষণ হত্যাবলীর পথে একাজ কোনদিন সম্পন্ন হবে না, হতে পারে না।

এইসব কথাগুলো বাঁধাধরা বক্তৃতার মত শোনাতে পাবে, বিরক্তিবও প্রকাশ কবতে পারে। কিন্তু আলাপ আলোচনা কথা বলারই আজ প্রয়োজন বেশী। কাবণ মানুষ দুহাত দিয়ে কাজ করার আগে তার মাথা থেকেই নির্দেশ পায় সেটা করবে কিনা। তেমনি আমরা ঠিক কাজ করছি কিনা, সকলের প্রতি সামাজিক ন্যায় বিচার হচ্ছে কিনা ইত্যাদি ক্ষণিকের ভাবনায় নয়, ধীর স্থির যুক্তিপূর্ণ বিচারে বোঝাতে পারি।

আমি অন্য কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টাকে সঠিকভাবে হয়তো উপস্থাপিত করতে পারবো না, তবে একজন মায়ের দৃষ্টিতে বলতে পারি গায়ের রক্ত জল করে, ঘামে পরিশ্রমে, রোগে শোকে রাত্রি জেগে বহু দুঃখ কষ্ট পার করে একটি শিশুকে আমরা বড় কবি। সেটা কি পরিণত বা অর্দ্ধ পরিণত বয়সে বিনা রোগ শোকে মানুষের হিংসার শিকার হয়ে হারাবার জন্য? এ ব্যাপারে নিজের সন্তান না হলেও প্রতিটি মায়ের মনেই অসহ্য বোধ হয়। তবে আমরাও আজ ক্রমে ক্রমে অল্প শোকে কাতর থেকে অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছি। তাই এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিঃশ্বাস নিতে পারছি--উপায় নেই।

এই অবস্থায় আমরা যারা শহরবাসী কিছু উপজাতি সম্প্রদায় আছি যাদের অধিকাংশেরই ককবরক জানা নেই--সামান্য কিছু শিক্ষা দীক্ষার গুণে সামান্য ধরণের কিছু চাকরী-বাকরী যারা করি তাদের অবস্থা অনেকটা কুমড়োর মত দায়ের উপর পড়লেও সেই কুমড়োই কাটা যায়। উগ্রপন্থীর কাছ থেকেও চিঠি পাই চাঁদার জন্য, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ফোর্সের কাছ থেকেও চিঠি পাই ভবিষ্যত মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য। এদের প্রতি পাহাড় অঞ্চলের বৃহত্তম উপজাতি সমাজ যারা বিভিন্ন দুঃখে কষ্টে অসুবিধায় আছেন তাদের আত্মীয়তা বোধ নেই। তাই তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব উপজাতি সমাজও পশ্চাদপদ,

সামান্য কিছু শিক্ষিত অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষ না ঘরকা না ঘাট্‌কা গোছের।

যাই হোক, বিচ্ছিন্নতায়, ঘৃণায়, সমালোচনায় সমস্যার সমাধান হবে না। সমাধান হবে না সুদীর্ঘ মৃত্যুর মিছিলেও। আজ পাহাড়ী শহরে সব আদিবাসীদেরই যুগ ও জীবনকে বুঝে নিতে হবে। উন্নতির পথে যেতে হবে এবং সেজন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। প্রস্তুতি নিতে হবে শিক্ষার জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য, শান্তির জন্য। এই শান্তি আসতে পারে আশেপাশের প্রতিবেশী জাতি-উপজাতি ভিন্ন জাতি সকলের মধ্যে ঐক্যের বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে। অনুপ্রবেশ বন্ধ করা, ইনাব লাইন পারমিট চালু করা এ সকল কিছুই ঠিক হবে বৃহত্তর স্বার্থে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। না হয় তার জন্যও সবাইকে ভাবতে হবে-- সবাইকে নিয়েই উন্নতির আরো বৃহত্তর পরিকল্পনা করতে হবে। কারণ এ সমস্ত বিষয়গুলো আজ বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধিত। সমস্ত পৃথিবীতেই অনুপ্রবেশের সমস্যা রয়েছে, রয়েছে চাকরী-বাকরী ব্যবসা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার সমস্যা। এটা ত্রিপুরা বা উত্তর পূর্বাঞ্চল বা ভারতের একাব সমস্যা নয়। তাছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রসরতা এবং শিক্ষায় উদার নৈতিকতার জন্য মানুষেব ছোট সামাজিক বেড়া ভেঙ্গে যাচ্ছে। আশির দাঙ্গাক্রান্ত আগবতলা শহরই আমাদেরই দেখিয়ে দিয়েছে কত উপজাতি পরিবারে বাঙালী মেয়ে-বৌ আছে এবং তেমনি পাল্টা বাঙালী পরিবারে কত মেয়ে উপজাতি বৌ রয়েছে। কারণ দাঙ্গাতঙ্কে উপজাতি পবিবার থেকে বৌ-রা হয়তো বাজাবে গিয়েছে, বরেরা বেরোযনি। দাঙ্গাগ্রস্ত ভয়-ভীত আমার জীবনেও আমি দেখছি কি সামান্য সংখ্যক অর্বাচীন লোক দাঙ্গা ঘটিয়েছে কি অসামান্য স্থৈর্য এবং বিচার বিবেচনায়। বাকিবা একে অপরকে হৃদয় থেকে সাহায্য করেছে। উদ্বাস্তু জীবনে প্রথম সান্ত্বনা সম্ভাষণ পেয়েছি প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সহকর্মী সরোজ চৌধুরী, বিজন চৌধুরী, রূপেন ভৌমিক প্রমুখ বহু বাঙালীর কাছ থেকে। প্রতিদিন খাবার পেয়েছি ধর্মের ভাই সুমিত দাসেব কাছ থেকে। হুমকি এবং অত্যাচারের মুখেও আমাদের সঙ্গ ছেড়ে যায়নি দু'বছব ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকা পারুল দাস, যে আজো সঙ্গেই আছে। জুনের দাঙ্গার পর কলেজ খোলর পরই এম বি বি কলেজে আমাকে নিয়ে ছোটোখাটো অনুষ্ঠানে সাহস এবং সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। আমার কি সে দাঙ্গার কথা মনে রাখা উচিত? আমি রাখি নি।

কোন আরোপিত জিনিস কোন কিছুতেই চিবপ্রোথিত হতে পারে না। সময়ের ঢেউয়ে তা মুছে যায়। এরপরও কয়েকটি বাঙালী মেয়ে আমার সঙ্গে থেকেছে, পড়াশোনা করেছে, চাকরী পেয়ে বিয়ে হয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলে গেছে। আজও তারা আমার আত্মীয় হয়ে আসে যায়, খোঁজ নেয় আমার। অসুখে-বিসুখে উতলা হয় ছুটে আসে। আমি তাদের মেয়ের মতোই মনে করি। বিভেদ পার্থক্য বা ঘৃণ্য হিংসা যদি ভিতর থেকে থাকতো তবে ও ঘটনাগুলো সম্ভব হতো না।

আসলে আমাদের দুর্ভাগ্য যে কিছু মষ্টিমেয় লোক ক্ষমতার স্বার্থে, রাজনীতির খেলায় পাঁচ বছরী চিন্তার বাইরে ভাবতে পারে না বলেই দেশের সাধারণ মানুষের ভালোমন্দ

ভেবে কোন কল্যাণকর বৃহৎ পরিকল্পনায় যায় না। যদি সেটা তারা করতো তবে যারা দুর্বল, অক্ষম, বঞ্চিত বা পিছিয়ে পড়া তাদের বিশেষভাবে টেনে তুলতো, কারণ সেটা করার জন্য নীতিগতভাবে তারা দায়বদ্ধ এবং ঠিকঠাকভাবে সেটা হলে গত পঞ্চাশ বছরে মোটামুটি জাতি, উপজাতি, বিভিন্ন জাতি একটা কাছাকাছি আর্থ-সামাজিক স্তরে চলে আসতো এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা উগ্রপন্থার কোন প্রয়োজন ঘটতো না। কারণ যে যাই বলুক বিংশ শতাব্দীর মানুষের জীবন এখন সত্যি তো আর অন্ধ ধর্ম বা রীতিমুখী নেই। হিন্দু মন্দির মুসলিমদের মসজিদ বা খ্রীষ্ঠানের চার্চ কোনটাই সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ নেই। এগুলো ক্রমশঃ আনন্দ উৎসব বা সংস্কৃতি প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যই নববর্ষের পায়েস পিঠে বড়দিনের কেক বা ঈদের সেমাই মিলেমিশে গেছে।

মানুষের জীবন আজ প্রায় একশো ভাগ অন্তর্মুখী। আমাদের জীবনে প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় যাই হোক আর্থিক বৃত্তই জীবনের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পাশাপাশি দুটি মানবিক অস্তিত্বের বন্ধুত্বে কোন চিড় নেই। এমনি একই পবিবারে ঠিক আর্থিক কারণেই ভাইয়ে ভাইয়েও মিল থাকে না, ব্যবহারে তাচ্ছিল্য বা পার্থক্য আসে। যোগ্য না হলে এক ভাই আবেক ভাইকে চেপে বা সরিয়ে দিতে চায়। এটা অনস্বীকার্য জাগতিক সত্য।

উপজাতি সমাজেব জন্য আজ যা প্রয়োজন তা দ্রুত আর্থিক প্রতিষ্ঠা। নিজেব শান্তি সুখের স্বর্থেই আজ আমাদের সকলকে দেখতে হবে তারা যেন দ্রুত আর্থিক প্রতিষ্ঠা পায়। সামাজিক ন্যায় বিচার পায়। সে সঙ্গে দেখতে হবে আবেগ অনুভূতির দিক থেকেও তারা যেন আহত না হয়। বলিষ্ঠ স্বাভাবিক, মানসিক এবং মানবিক সম্পর্কে জাতি উপজাতি যেন বাঁধা থাকে।

এজন্য আজ খুব সুস্থ সুন্দর সাংবাদিকতা, সুস্থ সুন্দর গণমানসিকতা এবং বলিষ্ঠ উদার সুস্থ নেতৃত্ব এবং সুস্থ সুন্দর প্রীতিপূর্ণ সাংগঠনিক শক্তি দরকার। এখন দরকার খোলামেলা আলাপ আলোচনার। জায়গায় জায়গায় সভা সমিতি করার। কারণ খোলা আলাপ আলোচনায় অনেক ভুল ভাঙে। একে অপরকে বুঝতে পারে, তাতে পরিস্থিতি সহজ সবল হয়।

সমাজে এ বিষয়ে আজ মেয়েদের বেশী এগিয়ে আসা দরকার। কাবণ যেমন পরিবারে, তেমন সমাজে মেয়েরাই ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, চিন্তা সামাজিকতা সব কিছু বিস্তৃত খুঁটিনাটিভাবে আঁকড়ে ধরে। সন্তানের মনে মা-ই প্রসারতার বীজ বপন করতে পারেন। সন্তানকে প্রকৃত ভালবাসার দায়িত্ব আজ তাদের। উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী বিভ্রান্ত মানুষকে আজ তাদের বোঝাতে হবে। 'মরে যাও' বলে বকা অনুচিত। যেখানে কেউ জীবন দিতে পারে না সেখানে জীবন নেয়া উচিত নয়। জীবনের পথেই সংগ্রামে চেতনায় সমস্যার সমাধান হবে। কাজেই এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা নারী সমাজের উপর খুব সঠিকভাবে নির্ভর করতে পারি। কাবণ আমরা আজ দেখছি প্রতিটি আন্দোলনে--প্রতিটি অন্যায় বিধানে

নারী সমাজ এগিয়ে আসছে লক্ষ্যণীয় সংখ্যায়। সমাজের এই সর্বনাশা চেহেরাকে বদলে দিতেও নারীদেরই এগিয়ে আসতে হবে সংগঠিত সংগ্রামে।

ইতিমধ্যেই আগরতলায় মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'চেতনা' সংহতি ও মিলনের আদর্শে গ্রামীণ ও পার্বত্য অঞ্চলে 'আত্মীয়সভা'র অনুষ্ঠান করছে। ভাঙ্গা এবং বিশ্বাসহীনতার যোগসূত্রকে শুধরে আবার সুস্থ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে গেলে প্রীতির বিস্তার চাই।

এজন্য বলা হচ্ছে যেখানে যারা সংখ্যাগুরু সেখানে তারা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব এবং মিলনের চেষ্টা নিন। উগ্রপন্থাকে গুঁড়িয়ে দিন। দুটি কথাই অত্যন্ত মূল্যবান এবং গ্রহণীয়। সে সঙ্গে তৃতীয় একটি দায়িত্বও রূপায়িত করতে হবে আন্তরিক সততা এবং যত্নের সঙ্গে। সেটি হচ্ছে পশ্চাদপদদের উন্নয়ন বিষয়। এজন্যও একটি আন্তরিক দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যদি সত্যি আমরা প্রকৃত সংহতি এবং শান্তি এসঙ্গে সঠিক উন্নয়ন চাই এটা সাম্যের জন্য জরুরী। এভাবেই সংগ্রামেব পথে চিন্তা চেতনায় সত্যিকারের সংহতি আসবে ভাষণ, শ্লোগানে নয়।

উপজাতি নারী সমাজের জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ন্যায়-বিচার

মুখবন্ধ

ইউনাইটেড নেশানস্ অর্গানাইজেশন (U.N.O) বা জাতি সংঘের বার্ষিক মুখপত্র বড়ে Progress of Nations জার্নালের মুখবন্ধে প্রতি বছরই একটি শুভেচ্ছা বার্তা থাকে যাতে বলা হয় — পৃথিবীতে এমন একদিন আসবে যেদিন একটি রাষ্ট্রের গুণগত মান নির্ধারণ করা হবে সে রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষের সমান উন্নতি, উপযুক্ত স্বাস্থ্য, শিক্ষার ব্যবস্থা তাদের পরিশ্রমের উপযোগী পুরস্কার লাভ -- তাদের জীবন যাপনকে প্রভাবিত করে সেসব বিষয়ে নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ --- তাতে মতামত দেয়া — তাদের নাগরিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন — তাদের দূর্বল এবং অসম সুযোগভোগী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং তাদের সন্তান সন্ততির দেহমনের সঠিক বিকাশের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে — সে রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক উন্নতি, তার বড় বড় রাজধানী শহরগুলির জৌলুস বা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির জাঁকজমক দিয়ে নয়।

সেদিনের জন্য প্রত্যাশা এবং শুভেচ্ছা আমরাও রাখি। শক্তিমান চালক, নেতা, নাগরিক সকলের সদিচ্ছায় সেদিনটি পৃথিবীর বুকে বাস্তবায়িত হোক্ এটাই মানুষের সুস্থ আকাংখা।

কিন্তু গভীর মনস্তাপের বিষয় পারস্পরিক প্রচেষ্টায় যে নীতিনিষ্ঠ প্রশাসন, এবং প্রাত্যহিক জীবন ধারায় সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন তা আমাদের বাস্তব জীবনে এখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

তবু সৌভাগ্যের বিষয় এরই মধ্যে সাধারণ মানুষের সচেতনতা, কল্যান বোধ, দাবী-দাওয়া নানাভাবে আন্দোলিত হচ্ছে, জাগ্রত হচ্ছে। মানুষ সুবিচার লাভের জন্য, ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আবহমানকালের প্রচলিত অমানবিক ও অকল্যানকর প্রথা, ক্ষতিকর সামাজিক নিয়ম কানুন এবং রাষ্ট্রীয় আইন কানুনগুলির সংশোধন করে নতুন আইন কানুন প্রনয়ণে ঐক্যবদ্ধ আবেদন অন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতে জাতি উপজাতি সমাজ

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বিচিত্র জনসমাজ, তাদের বহুভাষা এবং এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির ধারাকে বহন করে বর্তমান যুগে এসে উপস্থিত হয়েছে। হাজার হাজার বছরের বাহিত এই বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতি সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমানভাবে অতীতে কোন সাধারণীকরণ ঘটায় নি। অবশ্য সেটা সম্ভব এবং প্রার্থিতও নয়। তবু রাষ্ট্রীয় কারণে দ্বন্দ্ব সংঘাত ঘটলেও জনজীবনে মোটামুটি একটি পরমত সহিষ্ণুতা এবং শান্তি বর্তমান ছিল।

এই জনসমাজে রয়েছে উন্নত সংস্কৃতির বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী যাদের রয়েছে বিকশিত ভাষা, শিল্প সাহিত্য, দর্শন, উন্নত জীবনযাত্রা। আবার এরই পাশাপাশি রয়েছে অনুন্নত জনজাতি, পার্বত্য উপজাতি গোষ্ঠী যাদের রয়েছে বিভিন্ন এবং বিচিত্র সাংস্কৃতিক জীবনধারা, নাচগান, পূজা উৎসব, জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে নিজস্ব ধ্যানধারণা, অপদেবতা ভূতপ্রেত ভয়, নানা কুসংস্কার। পাহাড় পর্বত অরণ্য অঞ্চলের নানাস্থানে এদের অবস্থান। শারীরিক গঠন চেহারা ছবিতেও রয়েছে বিভিন্ন পার্থক্য। এদের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিস্তৃত পরিচয় নেই। আর্য ভারত এবং আদি ভারত একই ভৌগলিক সীমার মধ্যে থেকেও একসঙ্গে মিশতে পারে নি –– না হয়েছে শোনিত সমন্বয় না হয়েছে সংস্কৃতির সমন্বয়। অবশ্য বিরাট হিন্দু সমাজের সুবিস্তৃত জাতি সিঁড়িতে কয়েকটি ধাপে কোন কোন গোষ্ঠী আদিবাসী হিন্দু হয়ে ঠাঁই পেয়েছে নিজস্ব আগ্রহে।

আধুনিক সভ্য ভারতীয়ের ইস্পাত সভ্যতার কেন্দ্রভূমি টাটা নগরের পাশেই সিংভূমের শালের বনে আদিবাসী বিরহোর পাথরের কুঠার নিয়ে উলঙ্গ ঘুরে বেড়িয়েছে বিংশ শতাব্দীতেও, কুটির নির্মাণের পদ্ধতিও জানা নেই। ইস্পাত সভ্যতার পাশাপাশি মূর্তিমান প্রস্তর সভ্যতা।

আর্য ভারতীয় জীবনে জাতি উপজাতি সম্পর্ক

ভারতবর্ষের জীবনে বহু রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের সংঘটন হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত নেই যা থেকে প্রতীয়মান হতে পারে যে ভারতের আদিবাসীকে আর্য সভ্যতা আপন করে নেবার চেষ্টা করেছে। বীর পার্থ আদিবাসী দুহিতা উলুপীকে এবং মধ্যম পান্ডব বৃকোদর হিড়িম্বাকে সাময়িকভাবে সহচরী হিসেবে গ্রহণ করেছেন ঠিক কিন্তু ধর্মপত্নীর মর্যাদা দিয়ে নয়। ইন্দ্রপ্রস্থে বা হস্তিনাপুরে আর্য গরিমায় ফিরে এসে তারা নির্বাসিত জীবনের সুখ সহচরীকে ভুলে গিয়েছিলেন। আর্য ভারত যে আভিজাত্যের গর্বে আদিবাসী সমাজকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল আজও সে ব্যবধান দূর হয় নি। আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসী বুদ্ধির দিক দিয়ে উদারনীতিক হলেও এই বুনিয়াদী জাতি গর্ব তার রুচিকে অজ্ঞাতসারে গ্রাস করে আছে।

আধুনিক ভারতে জাতি-উপজাতি

উনিশ ও বিশ শতকের ভারতবর্ষ নূতন সাহিত্য শিল্প ও সমাজ সংস্কারের ভারতবর্ষ। কিন্তু এর মধ্যেও একটা বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সমাজকে আপন সমাজ বলে মনে করতে পেরেছেন আধুনিক ভারতীয় তার সাহিত্যের দর্পণে এমন প্রমাণ প্রতিফলিত করতে পারেন নি। অরণ্যের অধিকার নিয়ে সমবেদনায় সংগ্রামী হিসাবে যতদিন না একটি মহীয়সী মহিলা আদিবাসী সমাজকে নিজের সমাজ করে নিতে এগিয়ে এসেছেন। তিনি মহাশ্বেতা দেবী। ভারতে এত সমাজ সংস্কারের আন্দোলন হয়ে গেল কিন্তু তা আদিবাসী সমাজকে নিয়ে নয়। এটা মাত্র সম্প্রতি রাজনৈতিক উদারতাবাদের জন্য কিছু কিছু দেখা দিয়েছে।

আদিবাসীদের নিজস্ব প্রাকৃতিক বন্য জীবনধারার জন্য তারা পাহাড়িয়া বুনো, জংলী হিসাবে দূরে রয়ে গিয়েছিলো। তাদের সম্বন্ধে কোন সশ্রদ্ধ ধারণা আধুনিক ভারতীয়রা পোষণ করেন নি। কিন্তু সংবেদনশীলতা নিয়ে এগিয়ে এলে দেখা যেতো ঠিক আধুনিক ভারতীয়ের মতোই তাদের আদিবাসী সমাজেও রয়েছে এক ন্যায়নিষ্ঠ সাংস্কৃতিক জীবনধারা যা সময়ের স্রোতে উত্থান পতন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। এরই মধ্যে কোথাও এরা অনড় প্রাচীন ব্যবস্থায় ও বিধানের মধ্যে অচল হয়ে আছে, কোথাও নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকে হারিয়ে এরা আগের তুলনায় দীন ক্ষুব্ধ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন কোথাও বা আধুনিক যুগের রীতিনীতির সঙ্গে কিছুটা খাপ খাইয়ে একটা পরিবর্তনকে বরণ করে নেবার চেষ্টায় আছেন।

ভারতের খাঁটি ভূমিজ সন্তান কে বলা দুস্কর। আর্য আগমনের পূর্বে ভারতে বসবাসকারী আদিবাসীরাও বহিরাগত বলে নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা। আদিবাসীরা বনিয়াদী আদিবাসী, হয়তো এটুকুই বলা চলে আর কিছু নয়।

আর্যরা এসে আধুনিক ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা করেছেন। যমুনা গঙ্গা নর্মদা কাবেরীর উপত্যকা আর্য অভিযাত্রীর কাছে ছেড়ে দিয়ে আদিবাসী দুর্গম গিরিকন্দরে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুপ্রাচীনকালের আর্য অনার্যের রাজনৈতিক সংঘর্ষের পরিচয় পুরাণকারের লেখায় অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু সমন্বয়ের বিশ্বাস্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র অনার্য রাজা গুহক চন্ডালকে মিতা করেছিলেন এবং হনুমানকেও একনিষ্ঠ সহায়ক বন্ধু রূপে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু সুক্ষ্ম বিচারে রামায়ন কাহিনীর তাৎপর্য এটাই দাঁড়ায় যে এক আর্য রাজা রাবণ শাসিত এক অনার্য রাষ্ট্র শক্তিকে দমন করার জন্য হনুমান, গুহক ইত্যাদি কয়েকটি অনার্য দলপতিকে যুদ্ধবন্ধু রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেটা রাজনৈতিক সৌহার্দ্য মাত্র ছিল সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য নয়। আর্যেরা সেদিনের অনার্যকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের সমান স্তরে টেনে তোলার জন্য মোটেই আগ্রহান্বিত ছিলেন না এবং এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট মনোবলের অভাব ও উদারতার কার্পণ্য ছিল। তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত

একলব্যের কাহিনীর মধ্যে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডী রূপে কীর্তিত হয়ে আছে। অনার্য দ্রোণকে একলব্য একান্তে গুরু বলে মেনে অর্জুনের চেয়েও দক্ষতর ধানুকী হয়ে উঠেছিলেন। আর্য শিষ্য অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব অটুট রাখতে অনার্য একলব্যের কাছে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দ্রোণ একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আদায় করে নিলেন। একলব্যকে এভাবে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়ার মধ্যে আর্য কূটনীতির জঘন্যতম দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হয়েছে।

একলব্যের বেদনা আজো সাত কোটি আদিবাসীর হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে আছে। আর্য ভারতের উপক্ষায় ধিক্কৃত হয়ে ছায়াবৃত অরণ্যের আড়ালে আজো তারা বিদ্যাহীন নিঃসঙ্গ জীবনের ভাব বহন করে চলেছে। তবে আজ হাজার হাজার বছর পরে খ্রীষ্টিয় বিংশ শতাব্দীর শেষে আর্য ভারতের সৌহার্দ্যের আহ্বানের ক্ষীণকণ্ঠস্বর তাদের কানে পৌঁছতে আরম্ভ করেছে। আদিবাসীরা কেউ এ ডাকের অর্থ বুঝতে পারে কেউ বুঝতে পারে না অনেকেই সংশয় বোধ করে। কেমন করে ডাকলে পরে সাত কোটি বনিয়াদী ভারত সন্তান সাড়া দিয়ে যুগব্যাপী সঙ্গোপনের বেড়া অতিক্রম করে বৃহৎ ভারতের জনতার উৎসব অঙ্গনে মিলিত হতে পারবে সেটাই আজকের দিনের সমস্যা। সেটাই আদিবাসী সমস্যা। আসলে সমস্যার পটভূমিকে বুঝে নিতে পারলে তার সমাধানকেও খুঁজে পাওয়া যায়।

কোটি কোটি বছব আগে সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর — আর তাতে মানুষ এসেছে মাত্র ১০ লক্ষ বছর আগে — সে থেকেই মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছে তথাকথিত সভ্যতার দিকে। গুহাবাসী আদিম প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তাঁর বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনের পালায় শিকারী জীবনের শেষে এসে পৌঁছেছিল কৃষি ভিত্তিক জীবনে। দশ লক্ষ বছরের বিরাট দীর্ঘ জীবনের মাত্র চার পাঁচ হাজার বছরের কথা অমরা জানতে পেরেছি। প্রাচীন মানব সমাজ যাযাবর জীবনে মূলতঃ মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিচরণশীল ছিল। সন্তানের পরিচয়ে মাই ছিলেন প্রধান। তাকে ঘিরেই গোষ্ঠীবন্ধ মানুষেরা প্রাত্যহিক জীবন চর্যায় দিন যাপন করেছে। তখন নারী শিকারে সংহারে অগ্রণী এক দলনেত্রীর ভূমিকায়।

তারপর থেকে মানব সভ্যতায় বহু উত্থান-পতন ঘটে গেছে। কোন কোন দলবদ্ধ গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পূর্ণ জাতি সত্ত্বায়, কোন কোন গোষ্ঠী রয়ে গেছে নিজেদের আবহমানকালের পুরানো জীবনধারায়। বিস্ময়কর ভাবে উন্নত সভ্যতার পাশাপাশি প্রস্তর সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরে আছে কেউ-যেমন চেঞ্চু উপজাতি।

ভারতীয় আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

ভারতে বসবাসকারী আদিবাসীদের নিয়ে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তিরা নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেছেন। ব্রিটিশ ভারতে এ বিষয়ে বহু জন বহু ভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। মোটামুটি ভাবে দেখা গেছে তিন শ্রেণীর আদিবাসীরা ভারতে প্রাচীনকাল

থেকে বসবাস করে আসছেন। এঁরা হচ্ছেন —

১) প্রোটো অস্ট্রেলয়েড ঃ প্রায় অস্ট্রেলীয় বাসীদের মত এরা। সমস্ত মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এদের বাস। এদের সঙ্গে নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো গোষ্ঠীর সংমিশ্রন হয়েছে।

২) নিগ্রোবটু ঃ ভারতে সম্পূর্ণ নিগ্রোবটু না দেখা গেলেও নিগ্রোবটুর ছাপ পাওয়া যায়। এরা কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করেন। রাজমহল পাহাড়ের আদিবাসীদের মধ্যে এবং আংনামি নাগাদের মধ্যে এই নিগ্রোবটু সুলভ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

৩) মঙ্গোলীয় ঃ এদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ করা হয়েছে — ক) আদি মঙ্গোলীয়, খ) মঙ্গোলীয়। ভারতের আদিবাসীদের কয়েকটি গোষ্ঠী মূল মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল, মেঘালয় ত্রিপুরা বর্তমানের বাংলাদেশে এই গোষ্ঠীর আদিবাসীরা রয়েছে। চট্টগ্রামের চাকমা জাতি ও পূর্ব মঙ্গোলীয় দেশের মানুষ — তিব্বত মঙ্গোলীয়দের মধ্যেই মঙ্গোলীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট। সিকিম ও ভুটানের আদিবাসীদের মধ্যেই এই গোষ্ঠীর খাঁটি নিদর্শন রয়েছে। হিমালয়ের উত্তরে বহু দূর বিস্তৃত অঞ্চলে এবং এদিকে নেপালেও তিব্বত মঙ্গোলীয়দের অস্তিত্ব রয়েছে।

এই তিন উপজাতি ধারা থেকে আরো অনেক উপজাতি গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। এদের একেকটি গোষ্ঠী বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত এবং এদের সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। একই গোত্রের দুই নর-নারীর মধ্যে বিবাহ হতে পারে না। গোত্রের নাম সাধারণত আদি পিতারূপী কোন টোটেমের (গাছ, পশু) নাম অনুসারেই হয়ে থাকে।

ভারত ইউনিয়নে জনসংখ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো উপজাতি বা আদিবাসী মানুষ। মোট জনসংখ্যার অনুপাতিক হারে এরা শতকরা পাঁচ ভাগের ওপর। এদের আদিম জাতি 'আদিবাসী' গিরিজন এসব বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়। ভারতের সংবিধানে এরা তফশীল ভূক্ত উপজাতি বা সিডিওল্ড ট্রাইব।

এই অংশের মানুষেরা ভারতের সব রাজ্যেই রয়েছে তবে সব রাজ্যের জনসংখ্যায় উজাতিয়দের আনুপাতিক হার সমান নয়। যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতেব রাজ্যগুলো অরুণাচল, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম এই সাতটি রাজ্যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে এরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী। অন্যান্য যে সব রাজ্যে জনসংখ্যায় উপজাতিদের আনুপাতিক হার উল্লেখযোগ্য সেগুলিব মধ্যে রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উড়িশা প্রভৃতি রাজ্যের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবাংলাতেও উপজাতীয় মানুষেরা মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ছয় ভাগ।

এই উপজাতীয় মানুষরা নিজ রাজ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত কৃষি অর্থনীতিতে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এরা মূলত কৃষক। তবে কতগুলি শিল্পে যেমন কয়লাখনিতে শ্রমিক হিসাবে এদের ভূমিকা রয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই কৃষি ও শিল্প দুটি ক্ষেত্রেই এদের শ্রমশক্তিকে খুব সস্তায় কাজে লাগানো হয়। এরা জমিদার জোতদার ও পুঁজিপতিদের

লুণ্ঠনের শিকার সর্বত্রই। এই সব শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে উপজাতি সমাজের মানুষেরা সর্বভারতে বহু বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রাম করেছে। গোটা ব্রিটিশ শাসনকালব্যাপী রয়েছে এদের বহু সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস।

ব্রিটিশ ভারতের স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থায় আদিবাসী

ব্রিটিশ ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতায় আদিবাসীরা খুব স্বল্প সংখ্যায় হলেও যোগদান করেছিলেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধান অনুসারে পৃথক নির্বাচন প্রথাব মাধ্যমে আদিবাসীদের জন্য আইনসভায় কতগুলি আসন সংরক্ষিত হয়েছিল। এই সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল মোট ২৪টি।

আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আইনসভার আসন ঃ

আসাম	—	৯
বিহার	—	৭
উড়িশা	—	৫
বোম্বাই	—	১
মাদ্রাজ	—	১
মধ্যপ্রদেশ	—	১
মোট	—	**২৪টি**

বাংলা প্রদেশে সেদিন আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসন একটিও ছিল না। যদিও সেখানে আদিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষের উপর। দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন ব্যবস্থার কথা না বলাই ভাল। সেখানে শিক্ষিত প্রজা সমাজেই প্রতিনিধিত্ব যা ছিল তা না থাকার মত। আদিবাসীদের কথাতো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এপ্রসঙ্গে তৎকালীন ভারতীয়, জাতীয়তাবাদীদের মনোভাবের সম্পর্কে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ কবার একটা সঙ্গত কারণ ছিল। সেদিন আদিবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার নিয়ে জাতীয়তাবাদীরা বলতে গেলে কোন আন্দোলনই করেন নি। যেমন হরিজনদের দাবীর সম্পর্কে হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রায় হরিজনদের সমান কিন্তু মধ্যপ্রদেশের আইনসভায় আদিবাসীদের জন্য একটি আসন সংরক্ষিত ছিল। হরিজনদের জন্য ছিল কুড়িটি আসন। উড়িশাতে যদিও আদিবাসীদের জন্য পাঁচটি আসন সংরক্ষিত ছিল কিন্তু এর মধ্যে চারটি আসনের প্রতিনিধি স্বয়ং গর্ভনমেন্ট মনোনীত করেন। অথচ আইন সভায় মনোনয়নের ব্যপার কোন প্রদেশেই কোন সম্প্রদায়ের জন্য ছিল না। মাত্র উড়িশার আদিবাসীদের জন্য এই বিচিত্র গণতন্ত্র

বিরোধী ব্যবস্থা চালু ছিল।

সে সময়ে লোকাল বোর্ড ইত্যাদিতেও আদিবাসী প্রতিনিধি গ্রহণ করার কোন পদ্ধতিই ছিল না। তবে আগেই বোম্বে গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে বা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উপজাতীয়দের সামগ্রিক সামাজিক অবস্থান যা ছিল তার চেয়ে তারা আজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উপজাতীয়দের সমস্যাগুলোকে আজ আর এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকছে না। যুগযুগান্তের বঞ্চিত আদিবাসী আজ দেশের রাজনীতির আঙিনায় হাজির হয়েছে।

ভূমিসংস্কার

তবে উপজাতীয়দের জীবনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক যেসব বিষয় যেমন সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান তার জন্য প্রয়োজন যে ধরণের ভূমি সংস্কার আজও তা এদেশে হয় নি। তবে পশ্চিমবাংলায় ভূমি সংস্কার এবং অন্যান্য অনেক কিছু ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

এব্যাপারে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ বা নীতি প্রনয়ণই শেষ কথা নয় — সীমাহীন দূর্নীতি, দায়িত্ব পালনে ত্রুটি, মাফিয়ারাজ ইত্যাদির ফলে উপজাতিদের জন্য উন্নতি বা সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সাফল্য আসছে না। একটি জনসংখ্যার প্রকৃত উন্নতির জন্য তার ভাষা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নতি প্রয়োজন। আদিবাসীদের ভাষার উন্নতির জন্য তৎকালীন সরকারী শাসন ব্যবস্থা সময়মতো ভাষার স্বীকৃতি দেন নি। উন্নতিরও চেষ্টা হয় নি।

ভাষা

মিঃ সিমিংটন, ব্রিটিশ ভারতে উপজাতিদের শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের বিষয়ে বলেছিলেন যে যেসব শিক্ষক আদিবাসী সমাজে ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষা দান করবেন তারা যেন স্থানীয় আদিবাসীর উপজাতীয় ভাষা বা উপভাষা সম্পন্ধে পারদর্শী থাকেন। উড়িশার আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল সম্বন্ধে তদন্ত কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তাতে মন্তব্য করা হয়েছিল যে খন্দমাল, গঞ্জাম, কোরাপুট ইত্যাদি আদিবাসী অঞ্চলে স্কুলের শিক্ষকরা অবশ্য উড়িয়া ভাষাতেই শিক্ষা দান করেন কিন্তু শিক্ষকদেরও স্থানীয় আদিবাসী ভাষা সম্বন্ধে সম্যক ভাবে পারদর্শী হতে হবে।

আদিবাসী জীবনযাত্রার উপর বিশেষ গবেষণাকারী ভেরিয়ার অ্যালুইন উপজাতীয়দের ভাষা সম্পর্কে বলেছিলেন যে উপজাতীয়দের ভাষার বিশিষ্ট গুণ — ঐশ্বর্য।

কিন্তু এটা সাধারণ্যে গৃহীত হয় নি। অন্যান্য গবেষকদের অভিমত ছিল উপজাতীয়

ভাষাগুলির সাহিত্যগত উৎকর্ষ নেই। হাজার বছর আগের অরণ্য জীবনের ভাষা - আজ বর্তমান যুগের উপযোগী নয়।

এটাও বলা হয়েছে যে ভাষা জীবনের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য উপনীত হওয়ার উপায় মাত্র। তাই আদিবাসী জীবনকে যা উন্নত করবে সে ভাষায় কাজ করতে হবে।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা সেদিন ভাবা হয় নি যে, ভাষা শুধু লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় মাত্র নয়। ভাষা একটি মানবগোষ্ঠীর আনন্দ প্রেরণা, গর্ব — এতে জড়িয়ে আছে তার ড্রপ্পপ্সব্ধনক্ষ, শ্রদ্ধা। একটি ভাষার জন্য কিভাবে একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশ।

আদিবাদী সমস্যা বিশেষজ্ঞের অভিমত — আইনকানুন-প্রশাসনিক রীতিনীতি প্রয়োগ ও পরিচালন

উপজাতি-আদিবাসী গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সামাজিক ভিত্তি ভাঙ্গার মূল কারণ ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইন। আদিবাসী সমাজের মূল যে কৃষি ব্যবস্থা — জুম তা ব্রিটিশ রননীতির ফলে আক্রান্ত হয়েছে। আংশিক বা সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলে সরকারী কর্মচারীদের উপর এত বেশী ক্ষমতা ন্যস্ত করা হতো যা অপব্যবহারের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেতো।

এভাবে আদিবাসী অঞ্চলে স্বায়ত্ব শাসনের নীতিগুলিকে ব্যর্থ করা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রাচীন সামাজিক আইন কানুন ব্যবস্থাগুলিকে যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি Customary Laws এগুলিকে আদিবাসী গোষ্ঠীর ইচ্ছা অভিপ্রায় অনুসারে সহাযতা করে সঠিক পরিচালনা করা হয় নি। যেমন ধরা যাক - জোর করে কোন মেয়েকে বিয়ে করা উপযুক্ত সমাজে বিধিবদ্ধ অথচ ব্রিটিশ আইনে এটা অপরাধ। আবার ভারতীয় হাকিম যখন অনেক দূরে বসে এজলাসে সেটার বিচার করেন তখন সেটা নিরপেক্ষ বিচার হয় না একপেশে গোঁড়া বিচার হয়।

আদিবাসী জীবনধারা নিয়ে গবেষণাকারী শ্রী শরৎচন্দ্র রায় লিখেছেন "ব্রিটিশ পদ্ধতির আইন ও শাসন উপজাতি সংহতি আরো বিকট করেছে। এবং তাদের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব 'পঞ্চের' অর্থাৎ নিজস্ব সামাজিক কর্তৃত্বকে খর্ব করে দিয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে উপজাতীয় সামাজিক প্রথাগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে গভর্নমেন্ট যে নির্দেশ দিতেন আদালত আবার সেগুলিকে অস্বীকার করতেন।

দৃষ্টান্ত ঃ পিতৃ সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার। এই উপজাতীয় প্রথাকে অস্বীকার করে আলাদত ব্রিটিশ ভারতীয় প্রথা অনুসারে দায়াধিকার আইন (Succesion Act) বলে মামলার বিচার করত যেটা উপজাতীয়দের সামাজিক জীবনে মৌলিক ব্যবস্থা ও আত্মীযতার নীতি বিরোধী।

এরপর আসে জমি জমার ব্যাপার। এক্ষেত্রেও আদিবাসীদের জমি ধীরে ধীরে মহাজন,

জমিদার প্রভৃতি লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে—এইভাবে ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়ে আদিবাসীরা তাদের সমাজ সংহতি হারিয়েছে এই অধঃপতনের মূল কারণও হলো ব্রিটিশ পদ্ধতির ভূমি আইন।

এর শিকার আদিবাসী চাষী, এবং শিকার সাধারণ চাষী ভূমির উপর থেকে চাষীর অর্থনৈতিক মূল উচ্ছিন্ন হলে তার সামাজিক মনোবলের ভিত্তি থাকে না। এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য। ভারতের বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত আদিবাসী সমাজের মনোবল হানির যে কথা বহু নৃতাত্ত্বিক উল্লেখ করেছেন তার প্রধান কারণ হলো ভূমি থেকে অধিকারচ্যুত হওয়া। এই মনোবল হানি হওয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ পদ্ধতির আইন সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে। ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুসারে জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে চাষীকে বিশেষকরে রায়তী চাষীকে অবাধ অধিকার দেয়া হয়েছে।

১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এসে এত বিষয়ে ভারতবাসীর হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়েও আদিবাসীদের একটা প্রাচীন পবিবর্তনহীন জীবনে আবদ্ধ করে দূরে সরিয়ে রাখার নীতি ছাড়তে পারলেন না।

আদিবাসী মজুরের সমস্যায় বিভিন্ন দিক

জমি জমাহীন অধিকাংশ আদিবাসী জীবন ও জীবিকার জন্য বিভিন্ন ধরণের মজুরী কাজে যুক্ত হলেন। কারখানা, কয়লাখনি, চাবাগান, পাবলিক ওযার্কসের সড়ক তৈরীর জন্য পাথর বিছানোর কাজ করতে শুরু করলেন। এদের মজুরীর সমস্যা সমজীবিকা সম্পন্ন ভারতীয় মজুরের সমস্যা। তবু এদের ক্ষেত্রে মানসিক ও সামাজিক দিক দিয়ে কিছু ভিন্নতর সমস্যা এব্যাপারে থেকেই যায়। বিশেষ করে বহু ক্ষেত্রেই আদিবাসী ক্ষেতমজুরের কাজ মজুরীর বিনিময়ে স্বেচ্ছা কাজ নয়। দূর অতীত থেকেই তাদের ক্ষেত্রে এটা হতো বাধ্যতামূলক Compulsary Labours।

বাধ্যতামূলক কাজ নিন্দনীয় নয় যদি তা বৃহত্তর জনসাধারণের মঙ্গলে অনুষ্ঠিত কাজ হয়। যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কাজকর্ম ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক মজুরী নিন্দনীয়। প্রাচীনকালে ভারতের ভূস্বামীরা এভাবে তাদের প্রজাদের বেগার খাটিয়েছেন। এব্যাপারে কোথাও কোথাও এখনো চলে আসছে। ত্রিপুরার মহারাজার সরকারী কর্মচারীদের মালপত্র বিনা পয়সায় একখান থেকে এককখানে বইতে হতো। এই ধরনের কাজে আপত্তি জানিয়ে মোট বইতে অস্বীকার করায় খোয়াইয়ের পদ্মবিলের কুমারী, মধুতি এবং রূপশ্রী নামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েদের পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

এইসব মজুরিগিরিতে মহিলাদের উপর কাম লালসা চরিতার্থ করা হতো। গতর খেটে জমিদারের খাজনা শোধ করার প্রথাও ছিল পাশাপাশি। আদিবাসীদের মধ্যে অনেক

ধরনের মজুরী প্রথা ছিল চুক্তিবদ্ধ শ্রম (Bonded Labour) — নাগপুরে "কামিয়াতি" উড়িশায় একে বলে "খোটি"। ত্রিপুরায় পাহাড় অঞ্চলের মেয়ে পয়সায় কিনে আনাহতো রাজবাড়ীতে - এদের বাঁদী বলে বলা হতো। দূর্ভাগ্যের যে ঋণ শোধের জন্য এই দৈহিক শ্রমদান করা হয় কিন্তু ঋণের হিসাবে এখন জুয়াচুরি চলতে থাকে যে বছরের পর বছর খেটেও এগুলি শোধ হয় না। এদের ছেলেরাও পিতৃ ঋণ শোধ করতে সারা জীবন খাটে — শোধ হয় না।

এসব অমানবিক প্রথার পাশাপাশি ছিল 'কন্যাপণ' সমস্যা-যার শিকার ছিল দরিদ্র পর্বতবাসী যুবকরা। সাধারণ নিম্নবর্ণের হিন্দুও ঋণ করে বিয়ে করতেন অথবা কোন সামাজিক কাজের জন্য যেমন মা বাবার শ্রাদ্ধ বা পূজা ইত্যাদির জন্য ঋণ করতে হত।

সারা ভারতের আদিবাসীদের তুলনায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদের শিক্ষার হার যদিও বেশী তবু সামাজিকভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরী বাকরীতে তাদের প্রতিষ্ঠা সে অনুপাতে ঘটে নি।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা, একটি রাজ্যের সঙ্গে আরেকটি রাজ্যের উপযুক্ত সংযোগ বিভিন্ন রাজ্যের আদিবাসী জীবনে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির অভাবে জনসাধারণের মনে ক্ষোভ দুঃখ জমে উগ্রতা তৈরী হয়। অবশ্য এসবই যায় জানা। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই আদিবাসী জীবন নিয়ে যতটা উৎসাহ কৌতূহল এবং নানা ধরনের সমীক্ষা ইত্যাদি বিপুল বিক্রমে চলে এসেছে তার ভগ্নাংশ পরিমাণ শ্রদ্ধা ভালবাসা সহমর্মিতা দেখালে ব্যাপারটা আজ অন্য রকম হতো।

এতক্ষণ পর্যন্ত নিখিল ভারতীয় এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী বা উপজাতি সমাজেব যে প্রেক্ষাপট আলোচনা কবা হয়েছে তাতে পুরুষ সমাজের সমস্ত সুবিধা অসুবিধাগুলির সঙ্গে নারীও জড়িত। আলাদা কবে তাদের কিছু সমস্যা থাকলেও সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অসুবিধা এবং পশ্চাদপদতার ফলাফল একই বলে নারীর দুর্দশা আরো বেশী হয়ে পড়ে।

উপজাতি নারী

নারীব সামাজিক অবস্থান বিচারে দেখা যায় যে সমাজে চলাফেরা হাটে বাজারে যাওয়া, নাচগান, মদ্যপান সমস্ত ব্যাপারেই অকুণ্ঠ ভাবে নারীর সম স্বাধীনতা আছে। তবে অধিকাংশ উপজাতি সমাজেই নানা বিষয়ে তাদের প্রতি সামাজিক ন্যায় বিচারের অভাব রয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা সমাজে এবং পরিবারে তাদেব অবদানকে সঠিক স্বীকৃতি এখনো দেয়া হচ্ছে না। এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ও তাদের ভূমিকার কথা এখনো সঠিক ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না। উপযুক্ত বিচারের মাধ্যমে যে তথ্য বেরিয়ে আসবে তাতে দেখা যাবে সমাজে

সংসারে সিংহভাগ পরিশ্রম দায়িত্ব পালন করে উপজাতি নারী। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে যেরকমই থাকুক না কেন কৃষক, কর্মী সংগঠক সমস্ত ভূমিকাই সার্থকভাবে পালন করছেন নারীবা। অতীতে তাদের যে পারিবারিক এবং সামাজিক সম্মান এবং গুরুত্ব ছিল সে অবস্থা তারা ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলেছেন।

উপজাতিদের মধ্যে রয়েছে নানা সম্প্রদায়, গোষ্ঠী। বিভিন্ন রীতিনীতি সামাজিক সংস্কার, বিশ্বাস এবং সংস্কৃতিতে পার্থক্য। পরিধেয় বস্ত্র বোনার নক্সার ধরন দেখেই বোঝা যায় কে কোন সম্প্রদায়ের লোক। এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর মূল পরিচয় এবং গুরুত্বকে বহন করে নিয়ে চলেছে উপজাতি নারী সমাজ।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে তারা সংসারকে রক্ষা করে। সমস্ত অভাব অভিযোগের মোকাবেলা করে এবং সংসারের সমস্ত দুঃখ কষ্ট তারাই ভোগ করে।

অথচ সামাজিক আইন কানুন সুযোগ সুবিধা তাদের পক্ষে ছিল না তা এখনো নেই।

ব্রিটিশ আমলে বননীতি

অরণ্যদুহিতা উপজাতি নারীদের প্রথম এবং প্রধান আশ্রয় স্থলই হচ্ছে বন। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে সেই বনের উপর নারীর অকুণ্ঠ অধিকার আর রইল না। অজস্র নিষেধের বেড়া দিয়ে বন এবং উপজাতি নারীর মধ্যে ভেদের আড়াল তৈরী হল। কিন্তু সার্থক বন সৃষ্টিতে তাদের ভূমিকাকে রূপায়িত করা হলো না।

গোষ্ঠীগত আইনকানুন ও নারী

বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভিন্ন আইনকানুন বা Customary Laws — রীতিনীতি যা ছিল তাতে সব কিছুর শেষ বিধানই কিছু অর্থদন্ড বা এক থেকে কয়েক বোতল মদ দিতে হত অপরাধীকে এবং সেটা গোষ্ঠীর সর্দারকে। সেটা নারীর শ্লীলতাহানিই হোক বা ধর্ষণই হোক সেখানে নারীর জন্য কোন ক্ষতিপূরণ বা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার বিধান ছিল না বা নেই। এভাবে নারীর নিজস্ব সম্মান এবং অস্তিত্বকে মূলতঃ অবহেলা এবং অস্বীকার করা হয়েছে। মেয়েদের সামাজিক অধিকার, মানবাধিকার বহু আইনকানুন আছে কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য কোন প্রকার নীতি স্থির হয় নি। সমাজ ব্যবস্থায় এটি দূর্বলতর অংশ। এভাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই একের পর এক বিধিনিষেধের বেড়া মেয়েদের অসম্মানের বোঝা বাড়িয়েছে।

বিবাহ ব্যবস্থা পূর্বে এবং বর্তমানে ঃ

বেশীরভাগ উপজাতি সমাজেই অতীতে কন্যাপণ চালু ছিল। মেয়েরা সমাজ সংসারের

সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করতো এবং তাদের পরিশ্রমেই গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে উঠতো। কাজেই কন্যা সন্তানের সামাজিক মূল্য ছিল বেশী। তাকে পাওয়ার জন্য হবু স্বামীর মূল্য দিতে হতো। বেশীরভাগ স্থলেই এই কন্যাপণ দিতে না পারার ফলে হবু জামাইকে শ্বশুরবাড়ীতে উপযুক্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সে অর্থ মেটাতে হত। এসঙ্গে স্বামী হিসেবে তার উপযুক্ততার পরিচয় প্রমাণও এই জামাই খাটা প্রথার মাধ্যমে দিতে হত।

বর্তমানে উন্নততর সংস্কৃতির প্রভাবে কন্যাপণের বদলে বরপণের রীতি সমাজে চালু হয়েছে। এবং এর অমানবিক এবং নিন্দনীয় দিকগুলি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। পণের জন্য বৌকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা না থাকলেও নানা দাবী দাওয়া এবং সে দাবী পূরণে চাপ বাড়ছে। এই বিবাহ পদ্ধতির ব্যাপারে বর্তমানে সমাজে উপজাতি মহিলাদের উপর অত্যন্ত অমানবিক এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হচ্ছে। আজকাল দেখা যাচ্ছে বহু পুরুষ প্রথমা স্ত্রী এবং সন্তানাদি রেখে দ্বিতীয়বার বিয়ে করছে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা প্রথমা স্ত্রীর অজ্ঞাত। দ্বিতীযবার বিয়ের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামী কার্যত প্রথমা স্ত্রীকে খোঁজ করে না। এ বিষয়ে অনেক স্বামীরই মত যে আমবা উপজাতি আমাদের নিজস্ব গোষ্ঠীগত আইনকানুন আছে - সে আইন মূলে আমরা একাধিক বিয়ে করতে পারি এতে দোষ নেই।

এধরণেব অন্যাযকাবী স্বামী যেখানে সরকাবী কর্মচাবী সেখানে স্ত্রীর অভিযোগ মূলে স্বামীর চাকরীর জায়গা থেকে খরপোষ আদায় করা হয়ে থাকে। তবে সেটা ও নিয়মিত দেয়ার মানসিকতা স্বামী দেখায না কিছুদিন বাদেই বন্ধ করে দেয। স্ত্রীর পক্ষে প্রায়ই আবার আইনী সহায়তা নেয়া সম্ভব হয না। সেখানে 'লিগ্যাল এইডস' ব্যবস্থার আশ্রয় চাইতে হয়।

উপজাতি মহিলাদের সম্পত্তিতে আইনগত অধিকার

স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানে যদিও সব ভারতীয় নাগরিককে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ নম্বর ধারায় যদিও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনও নাগরিকের প্রতি বৈষম্য সংবিধান বিরোধী— কিন্তু এই সমান অধিকাবেব দাবী বাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের সময় মনে রাখা হয় নি। ফলে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত আইনগুলি, সমাজিক রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আইনগুলি ১৪ এবং ১৫ ধারাকে উপেক্ষা করে আজও বহাল তবিয়তে বলবৎ আছে।

২৫ নং ধারায় ভারতের সমস্ত নাগরিককে তাদের নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও অধিকার দেয়া হয়েছে — এটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ আছে যেগুলি নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে পড়ে। ৪৪ ধারাটি এরই অন্তর্গত। এতে বলা আছে রাজ্যের তরফে প্রচেষ্টা থাকবে একটি অভিন্ন দেওয়ানী

বিধি প্রয়োগ করার।

বর্তমান ভারতের রাজনীতি এই ধারাগুলিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত আইনের যে কোন সংশোধনের দাবি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঝড় তুলছে। রাজনীতির জটিল ব্যাখ্যায় ধামাচাপা পড়ে যায় গণতান্ত্রিক এবং মানবাধিকার।

এই কলকোলাহলের মধ্যে বঞ্চিত নির্যাতিত নারীর ক্ষীণস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত আইন বা Personal Law এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত প্রচলিত আইনকানুন বা ট্রত্তব্দব্ধপ্সপ্পন্দ্বক্তন্তস্ত্রভ্র মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত সমস্যা পরিচয় নিয়ে ঘিরে আছে। এটি দেওয়ানী আইনের আওতায় পড়ে। এবং মানুষের সামাজিক এবং বাহ্যিক জীবনকে আইনানুযায়ী যা নিয়ন্ত্রণ করে সেটি ফৌজদারী আইন। দেওয়ানী আইনের আওতায় রয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের দায়িত্ব (হেফাজত অভিভাকত্ব) ভবণপোষণ, খোরপোষ এবং সম্পত্তির অধিকার।

এখন একই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বাস করে এবং ক্রমশঃ শিক্ষা দীক্ষা আর্থিক জীবনে সমধারায ব্যক্তিগত জীবন যাপন করেও একটি উপজাতি মহিলা তাব হিন্দু বোনের মত ব্যক্তিগত বিষযগুলির সমান আইনের সুবিধা নিতে পারছে না। উপজাতীয মহিলাদের (হিন্দু হলেও) তার পৈতৃক বা স্বামীর সম্পত্তিতে কোন আইনী অধিকাব নেই। Hindu Succession Act, ১৯৫৬ অনুসারে একজন হিন্দু মহিলাব তার পিতৃ সম্পত্তিতে ভাইয়েব মতই অধিকার রয়েছে এবং বিয়ের পরে তার স্বামীর সম্পতিতেও, স্বামীর মতই ভোগ, দখল এবং বিক্রীর অধিকার রয়েছে।

কিন্তু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পরেও একজন উপজাতি মহিলাব পৈতৃক বা স্বামীর সম্পত্তিতে শুধুই ভোগ দখলের অধিকার, আছে। বিক্রী বা হস্তান্তবিত কবাব কোন অধিকার নেই। পুত্রই শুধু সম্পত্তির অধিকাবী হতে পারে কন্যা নয়। অথচ প্রকৃত উপজাতি গোষ্ঠীর সেই লোকেদের মধ্যে পিতা কন্যাকে বিয়ের পরও নিজের ঘবে রাখেন এবং তার পুত্রেরা বিবাহ সূত্রে বেশীর ভাগই শ্বশুর বাড়ীতে জমি জমা পেয়ে চলে যান। সেই সম্প্রদাযেব লোকেরাই আবার যদি শহরের বসবাসকারী হন তবে সেখানে তাদের মেয়েদেব জন্য হবু স্বামী জামাই খাটা খাটতে শ্বশুরবাড়ীতে এসে থাকেন এবং ছেলেরাও তাদের হবু শ্বশুরবাড়ীতে জামাই খাটা খাটতে গিয়ে বিয়ে শাদী করে শহরের জমিজমায় অংশভাগী হন না কিন্তু পুত্রহীন অসহায় বিধবা বা কুমারী কন্যাকে এই নিজস্ব আইনকানুন বা Customary Laws এর নামে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে কোথাও কৌশলে ঘরবাড়ী ছাড়া করা হয় কোথাও 'ডাইনী' অপবাদ দিয়ে খুঁচিয়ে পুড়িয়ে মেরে সম্পত্তি গ্রাস করা হয়।

সংবিধানের ৩৬৬ নং ধাবার ২৫ নং উপধারা মতে উপজাতি সদস্য বা Schedule Tribe বলতে এখন উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের লোককে বোঝায় যিনি কিনা সংবিধানের ৩৪২ নং ধারায় বর্ণিত উপজাতি সদস্য। এখন হিন্দু উপজাতি মহিলাদের সম্পত্তিতে অধিকার আইন প্রযোজ্য হতে পারে যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটি

নোটিফিকেটশন দিয়ে একে চালু করার স্বপক্ষে ঘোষণা দেওয়া হয়।

মূলত উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসীদের জাতিগত পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের জন্যই সংবিধানে ষষ্ঠ তপশীলের জন্ম। যাহোক আরো পাঁচটি অন্যান্য সমাজের মতো উপজাতি সমাজেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সব দিক দিয়েই দারুণ পরিবর্তন এসে গেছে। সমাজের এই চলমান পরিবর্তন খুব সঙ্গত কারণেই তাদের বিভিন্ন উপজাতি অংশের মহিলাদের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই পরিবর্তনের বাতাস চিরাচরিত আবহমান কালের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি, এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের এই সঙ্কট মূর্হুতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি গোষ্ঠীর মহিলাদের সম্পত্তিতে অধিকার এবং উত্তরাধিকারের বিষয়টি একেবারে তৃণমূল গভীর পর্যায়ে গিয়ে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহিলা এবং অন্যান্য সমাজের উৎসাহী বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে

১) উত্তর পূর্বাঞ্চলের মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার এবং উত্তরাধিকারের ব্যাপারে বিভিন্ন উপজাতি সমাজে তাদের সামাজিক অবস্থিতির প্রকৃত ছবি কি, এবং

২) উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি সমাজে সম্পত্তির অধিকার এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে সামাজিক রীতিনীতি আইন কানুনগুলি কি কি রয়েছে —

এই বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমেই বেরিয়ে আসতে পারে এইসব আবহমানকালের ঐতিহ্যবাহী কাস্টমারী লজগুলোর মধ্যে কতটা সামাজিক ন্যায় নীতি, কতটা সাববত্তা, কতটা সময়োপযোগী উপযুক্ততা রয়েছে কতটা ছাড়তে হবে কতগুলিকে ধরে রাখতে হবে অথবা আদৌ রাখা যায় কিনা। এই সংরক্ষণের পিছনে কতটা যুক্তি রয়েছে ইত্যাদি। শুধু পুরানো রীতিনীতি বলেই আবেগপ্রবণ হয়ে তাকে আকড়ে থাকার যথার্থ আছে কিনা সেটাই হওয়া উচিত বিচার্য বিষয়। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ালে হয়তো দেখা যেতে পারে যে এগুলি নিদারুণভাবে নারীর মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে যার পরিবর্তন আশু এবং অনিবার্য হতে পারে।

ডাইনী প্রথা

নারীর মানবাধিকারকে লাঞ্ছিত করে একটি লজ্জাজনক নৃশংসতার উদাহরণ উপজাতি সমাজে ডাইনী প্রথা। এই প্রথার মূলে রয়েছে কিছু ভ্রান্ত সংস্কার — পরিকল্পিতভাবে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর নারীর প্রতি বঞ্চনা এবং এরই সাথে রয়েছে সম্পত্তি গ্রাসের জন্য লোভ এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

এখানেও নারী জাতির প্রতি জঘন্য অবিচার রয়েছে কারণ কখনোই কোন পুরুষ ডাইন হয় না। ডাইন হয় মেয়ে মানুষরাই। এবং এই ডাইনী প্রায়ই বয়স্কা বিধবা, নিরাশ্রয় এবং সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে থাকেন। ডাইনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী চিকিৎসক যারা

হবেন তারা প্রায়ই ট্রাইবেল এবং কৌম সমাজের অন্তর্ভূক্ত। ডাইনী প্রায়ই গ্রামে কারো রোগশোক বা দূরবস্থার জন্য দায়ী হন। তাকে ওঝার খুঁজে বের করা মানেই তাকে চিহ্নিত করে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা — কখনো সেটা তাব ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়ন কখনো আগুনে পুড়িয়ে মারা, কখনো ধারালো অস্ত্রে খুঁচিয়ে মারা।

এভাবে যে কত 'ডাইনী'কে মেরে ফেলা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এশুধু কোন বিশেষ সমাজ বা অঞ্চলের ব্যাপার নয়। এককালে সমস্ত ইওরোপে এই ডাইনী সংক্রান্ত কুসংস্কার এবং হিংসাবৃত্তির প্রচলন ছিল। জেমস স্প্রেঙ্গার তার 'ম্যালিয়াস ম্যালিফিকেরাস' গ্রন্থে দাবী করেছেন যে ইওরোপে ৯০ লক্ষ নারীকে ডাইনী সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার মত উন্নত রাজ্যেও ডুয়ার্সে জলপাইগুড়ি ও অন্যান্য কিছু অঞ্চলে ডাইনী সন্দেহে বহু দরিদ্র নিম্নবর্ণের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। ত্রিপুরাতেও মান্দাই, জিরানীয়া, অমরপুর, সিধাই, তৈরাজবাড়ী এবং আরো অনেকখানে ডাইনী সন্দেহে শুধু সাধারণ নারীদের নয় সমাজ শিক্ষা বিভাগের পরিচালিত মহিলা স্বাস্থ্য প্রকল্পে কর্মরত মহিলা মন্ডলের সভনেত্রী যিনি একজন অগ্রগামী ব্যক্তিত্বসম্পন্না বহু ভাষাবিদ এবং সুপরিচিত সমাজসেবী মহিলা ছিলেন তাকেও নৃশংসভাবে কুঠারাঘাতে হত্যা করা হয়। এরকম শিক্ষিতা মহিলা মিঠু সোরেণকেও কুঠারাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এব্যাপারে সত্য তথ্য উল্লেখ করতে গেলে শুধু কলেরবই বৃদ্ধি হবে।

এখানে আমাদের চিন্তনীয় বিষয় যে আজ শিক্ষা সভ্যতার এই উজ্জ্বলতার মাঝেও কিভাবে নারীদের মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ববাসী সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের ডাইরেক্টার জেনারেল বুট্রোস বুট্রোস ঘালি ঘোষণা করেছিলেন "নারীর হিংসা মানবাধিকারের চরম উলঙ্ঘন আমাদের সবাইকে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে"। এই ঘোষণার পরও ১৯৯৭ সালে মান্দাইয়ের কাছে এন সি কলোনীতে ডাইনী বলে মারা হয়েছে বীনাবালা দেববর্মাকে। ১৯৯৯ এর জুনমাসে জিরানীয়া থানাধীন দুই নম্বর এন সি কলোনীর বাসিন্দা মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মাকে আগেভাগে ডাইনী ঘোষণা দিয়ে রাত্রে জলখাবার অছিলায় ডেকে দরজা খুলে গুলি করে মারা হয়।

গভীর পরিতাপের বিষয় যে এই ধরণের খুনের জন্য যেখানে অপরাধীর নির্মম শাস্তি হতে পারে সেখানে এই হিংসাত্মক ব্যাপারকে একটি উপজাতি গোষ্ঠীর অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারকে হাতিয়ার করে ঠান্ডামাথায় পরিকল্পিতভাবে খুন করে অপরাধীরা সমাজের মঙ্গল কর্ম করার দাবী ও বড়াই করে। আইনী ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা এখানে বলা নিরর্থক। সংঘবদ্ধ প্রচার সচেতনতা এবং শক্ত পালটা সামাজিক প্রতিরোধের ব্যবস্থা না গড়ে তুললে স্থায়ী ফল পাওয়া সম্ভব নয়। তবু এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল শক্তি আইন, প্রশাসনের কর্তব্য রয়ে গেছে বঞ্চিত শোষিত অবহেলিত নারীর প্রতি সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করার।

উপজাতি নারীর সামাজিক স্বাধীনতা

উপজাতি নারীর মানবাধিকার যেরকম শোচনীয় ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে সেরকম ভাবে তার প্রতি নানা নূতন নূতন নিষেধাজ্ঞাও আরোপিত হচ্ছে। একই নারীকে কোথাও অবস্থাভেদে শাড়ী পরার জন্য বলা হচ্ছে কোথাও তাকে রিগনাই চাদর পরার জন্য চাপাচাপি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রধান বিষয় হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা। নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতির মন্ডিত অপরূপ বস্ত্র রিগনাই পরা গর্বিত অনুভূতির বস্তু। কিন্তু তাকে এক তরফা সাংস্কৃতিক দায় বহনের জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা খোয়াতে হবে এটা ঠিক নয়। পারস্পরিক দেয়া নেয়া সপ্রশংস বিনিময়ের মাধ্যমেই মানুষের প্রীতির জগদবর্দ্ধিত হয় এটা মনে রাখাও মুক্তমনের সভ্য ব্যক্তির ঃ নৈতিক দায়িত্ব। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মত ধর্মীয় স্বাধীনতা, শিল্প সঙ্গীতের স্বাধীনতা সবই নারীর প্রয়োজন। রিগনাই পরলেও কাউকে যেমন সমালোচনা করা উচিত নয় — রিগনাই না পরলেও তেমনি নিষেধ করা ঠিক নয়।

নিজের ছোট ছোট গৃহাঙ্গন পেরিয়ে আমরা এক জগতের স্বপ্নদ্বারে পৌছতে চাই সেটা নিজের গৃহকে ভুলে যাবার জন্য নয় তাকে তুলে ধরাব জন্য।

উপজাতি নারীর শিক্ষা ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে তুমি নারীকে শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও সে তার নিজের সমস্যা সমাধান নিজেই করবে। উপজাতি নারীর পক্ষে একথা শতাংশে সত্য। অধিকাংশই কঠোর পরিশ্রমী। দায়িত্ব কর্তব্য সচেতন উপজাতি নারী বিচার বুদ্ধি জ্ঞানে কম শক্তিমতী নয় জীবনের অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট শুধু পুঁথিগত বাহ্যিক বিদ্যা তার চলার পথে প্রয়োজন। এব্যাপারে তাকে দিতে হবে কিছু অবসর নিত্যগৃহকর্মের কঠোর চাপ থেকে শিশু কল্যাণে মুক্তি দিলে — নিত্য বিদ্যালয়ে যাওয়ার গৃহ পরিবেশ এবং সুযোগসুবিধা দিলে সে দশজনের মতোই স্কুলে যেতে পারবে। তার জন্য দরকার বাসস্থানের নিকটবর্তী বিদ্যালয়, গৃহশিক্ষকের সহায়তা (যেহেতু গৃহ পরিবেশে মা বাবা বা অন্য কোন শিক্ষিত ব্যক্তির সহায়তা নেই)। ১৯০১ সালে যেখানে ত্রিপুরায় শিক্ষার হার ছিল ২.১ শতাংশ— ১৯৪১ সালে সেটা বেড়ে হয় ৪ শতাংশ। এই সময়ে শহরবাসী কিছু উপজাতি শিক্ষিতা মহিলা ছাড়া অন্যত্র মহিলা শিক্ষার হার ছিল শূন্য। কিন্তু পরবর্তী ৫০ বছরে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত শিক্ষার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১.৩৭ শতাংশ, উপজাতি মহিলাদের স্থান এখানে ২৫ শতাংশ। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় এই শিক্ষার হার ১২ শতাংশের বেশী নয়।

সমস্ত অবিচার বঞ্চনা শোষনে প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষার বিকল্প তাদের জন্য আর কিছু নেই। সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচীতে ছাত্রীদের জন্য আর্থিক অনুদান, বুক গ্র্যান্ট ইত্যাদি যাতে সময়মতো সঠিকভাবে তাদের কাছে পৌঁছে

তা দেখতে হবে। কারণ অধিকাংশ দরিদ্র উপজাতির পক্ষে কন্যা সন্তানের জন্য বইপত্র কেনা বা স্কুলের পোষাক পরিচ্ছদ জোগাড় করা অসম্ভব।

বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সহস্র ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থায়ও উপজাতি সমাজে বিশেষত মেয়েদের মধ্যে যে শিক্ষার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে তা উৎসাহজনক।

উপজাতি মেয়েদের স্বাস্থ্য — স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান, স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাত্রার ধারণা উপজাতি মেয়েদের নেই। অপরিশ্রুত জল, বাড়ীর পরিবেশ, গৃহপালিত পশুপাখির দ্বারা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল এবং খালিপায়ে হাঁটার জন্য হুকওয়ার্ম ইত্যাদি অনিষ্টকর কৃমির আক্রমণে প্রায়ই আজকাল এদের সাধারণ স্বাস্থ্য আক্রান্ত। এর ফলে রক্তাল্পতা এবং অন্যান্য অসুখে এরা ভুগছে। আগের মত অপর্যাপ্ত বনের ফলমূল তরিতরকারী মেলে না। সুষম খাদ্য সম্পর্কেও এদের কোন ধারণা নেই। এদের অভ্যস্ত খাদ্য বাঁশ করুল ও আজ সহজলভ্য নয়। সেক্ষেত্রে তাদের প্রচুর ডাল এবং অন্যান্য সবজি খাওয়া উচিত। এইসব তথ্যগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেবার যে ব্যবস্থাদি আছে সেগুলো যথেষ্ট নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য মাঝে মাঝে সচেতনতা শিবির ইত্যাদি করা দরকার।

আইনী সচেতনতা

বিচারব্যবস্থা, আইনজীবী, বিচারক এঁরা আজ নারীদের পক্ষে। দায়িত্ব কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরা আইনী জ্ঞান এবং আইনী সহায়তা দিতে এগিয়ে আসছেন। প্রায়ই নানা অঞ্চলে আইনী সাক্ষরতা শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে একথাও ঠিক যে শুধু আইনী শিক্ষা পেলেই যে এরা সমাজে সংসারে সঠিক বিচার পাবেন এটা সত্য বা সম্ভব নয়। তবু পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর মহিলা অংশের কাছে বিচারের বাণী পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। তবু এরই মধ্যে দুঃখ হয় যখন দেখি উন্নততর সংস্কৃতির গুণাবলী অর্জনে বিমুখ উপজাতি যুবকেরা অনেকেই তাদের মধ্যে প্রচলিত পণপ্রথার মোহে পড়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, স্বল্প সময়ের মধ্যেই আবার দ্বিতীয় বিয়ের আসরেও পৌঁছে গেছেন প্রথমা স্ত্রী সন্তানকে বিপদাপন্ন অবস্থায় রেখে। বিধিবদ্ধভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ করে খোরপোষের ব্যবস্থা করেই তারা এ কাজটা করতে পারেন।

প্রথমা স্ত্রীকে না জানিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ খোরপোষ না দেয়া

উপজাতি সমাজে দ্বিতীয় বিবাহ প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ এ এসে ২৭টি কেস বিচারের জন্য মহিলা কমিশনে এসেছে। ক্রমশঃ স্ত্রীর প্রতি শারীরিক অত্যাচার ইত্যাদির ঘটনাও দেখা যাচ্ছে। খোরপোষ না দেয়া এবং সম্পূর্ণ স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে দ্বিতীয় বিবাহ করার ঘটনাগুলি খুবই মর্মস্পর্শী।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাই উদ্বেগের কারণ ঃ

উজান ময়দানে আসাম রাইফেলস বাহিনীব দ্বারা কিছু উপজাতি মহিলার উপর গণধর্ষণ দিয়ে বড় আকারের মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনা মানুষের দরবারে পৌছেছিল। এরপর থেকে সময় সময় নানাভাবে উগ্রপন্থীদেব দ্বারা অত্যাচারিতা বা অন্যান্য মানুষের দ্বারা উপজাতি নারী অত্যাচারিতা ধর্ষিতা হযেছে। ১৯৯৫ সালে অত্যাচারের অভিযোগ ছিল একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে। ২০০০ সালে একটি দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ছিল এখানে অভিযুক্তরা উগ্রপন্থী।

এইসব অভিযোগের ঘটনা সমুদ্রজলে ডুবন্ত আইস্‌বার্গের সামান্য ভাসমান অংশের চেহারা মাত্র। সব কেস বিচারের দরজা পর্যন্ত পৌছে না।

নারীঘটিত নানা অপবাধের মধ্যে ধর্ষণ সবচেযে জঘন্যতম অপরাধ বলে স্বীকৃত। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ এম আনন্দ বলেছেন সাধাবণ আক্রমণকারী আক্রান্তার দেহের ক্ষতি করে কিন্তু ধর্ষণে ধর্ষক আক্রান্তাব দেহ মন উভয়কেই ধ্বংস করে দেয। এই ক্ষত নারীর জীবনে চিরসাথী হয়ে থাকে।

এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অপবাধীর যাবজ্জীবন কাবাদন্ডই উপযুক্ত। যদিও ধর্ষণের জন্য প্রস্তাবিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড মহিলা সংগঠনেব দ্বারাই সমর্থিত হয নি খুব গভীর কারণে।

উপজাতি নারী আজ গভীর সঙ্কটে ঃ

সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রবাদের বৃদ্ধি প্রসার এবং ঘটনাবলীর গুরুত্ব মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে শুধু ব্যাহত করে নি প্রায় শুদ্ধ কবে দিযেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরায উগ্রপন্থার তাৎপর্য একটা অন্য মাত্রা পেয়ে গেছে। এখানে উগ্রপন্থা উপজাতি সাধারণ উপজাতিকে হত্যা করছে, জোর করে ধরে নিযে গিয়ে মুক্তিপণ দাবি করছে — আদায় করছে - তারপরেও তাদের মেরে ফেলছে। অউপজাতি শ্রেণীর মনুষদের উপব এই অত্যাচারগুলি তো নিয়মিতভাবেই হয়ে আসছে।

তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় যে সাধারণ উপজাতির প্রতি এই অত্যাচারে সংখ্যা এবং তীব্রতা খুবই উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে।

আজ এই বিপর্যয়ে উপজাতি মেয়েরা খুবই সঙ্কটে। উগ্রপন্থা তাদের জন্য শাখের করাত। জমি জমাওয়ালা মানুষ এবং চাকুরীজীবি উপজাতি তাদের নিয়মিত চাঁদা দিয়ে যাচ্ছে। তবু উগ্রপন্থা তাদের জীবনে দুদিকেই বিপদ এনেছে। উগ্রপন্থা তাদের জীবনকে ভয়াবহ করেছে। সেখানে উগ্রপন্থীরা তাদের শত্রু। ঘরে ঢুকে এসে ঘরের পোষা হাঁস,

মুরগী, পাঁঠা কেটে মেয়েদের রান্না করতে বলে।

আবার উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগকারী উগ্রপন্থীরাই তাদের পিতা ভ্রাতা স্বামীপুত্র। তারা ধরা পড়লে এনকাওন্টারে মারা গেলে তাদের শুধু বিয়োগের দুঃখ নয়, তাদের ছোটছোট শিশু সন্তান সহ সাংসারিক জীবনের সুস্থিতি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আঘাত ও তাদের কাবু করে ফেলে।

অথচ তাদের সম্পত্তিতে অধিকার নেই জমিজমায় যৌথ অধিকাব নেই কিন্তু সংসারের দায়িত্ব দায়ভারটা তাদের উপর এসে পড়ে।

অথচ এদের আজ লক্ষ্যণীয়ভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রীয় বিচার সামাজিক বিচার কিছুই তাদের সংসার জীবনকে গ্যারান্টি দিয়ে উজ্জ্বল করতে পারলো না।

রাজ আমলে পার্বত্য ত্রিপুরায় উপজাতি মহিলা সম্মান স্বীকৃতি পায় নি যদিও তাদের অনেকেই রাণী বা কাছা পদে বৃত হয়েছেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে রাজার সামাজিক বিয়ে হলেও সেটা মেয়ের বাড়ী থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে রাজবাড়ীতে হয়েছে। বাজা কোনদিন শ্বশুরবাড়ীতে পা রাখেন নি। এবং কোন রাণী পিতৃগৃহে বেড়াতে গেলে কোনদিন রাত্রিবাস করেন নি। তারও আগে রাণীবা কখনোই বাপেব বাড়ীতে বিয়ের পর পা রাখেন নি এমনকি পিতামাতার মৃত্যু সংবাদেও তাদের বাজবাড়ীর গেট পেরিয়ে বাপের বাড়ী যাওয়ার চল ছিল না।

তারা না পেয়েছে উপযুক্ত প্রার্থিত শিক্ষা না পেয়েছে আহ্লাদজনক জীবিকা — কোন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। অথচ সকাল থেকে সন্ধ্যা কর্মের যাঁতাকলে তাদের সময় সুযোগ সবই গুঁড়িয়ে যায় অজান্তে। পৃথিবীর আদি কৃষক নারী তার কৃষিকাজের নৈপুণ্য ক্ষমতাকেও স্বীকৃত কৃষক হিসাবে কাজে লাগাতে পারেন এবং আর কিছু না হলেও তাদের বস্ত্র বয়নের আবাল্যের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এটিকে কুটির শিল্পের মত বাণিজ্যিক রূপ দেয়া যেত। কাজ তারা করবে শুধু বিপননের ব্যবস্থা এবং প্রচারের সহায়তা পেয়ে গেলেই তাবা খুব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো।

অসম মজুরীতে খেত মজুর

আদিবাসী মেয়েরা আজ অর্থনৈতিক চাপে নিজস্ব জমিজমার অভাবে পুরুষের পাশে এসে বৃহৎ সংখ্যায় খেত মজুরের কাজ করছে। এখানেও রয়েছে বেদনাদায়ক বৈষম্য যার সংশোধন যত তাড়াতাড়ি হয় করা দরকার। স্বাভাবিকভাবেই মেয়েরা খুব দায়িত্বপূর্ণভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে এবং পুরুষের কিছু কম কাজ করে না। তবু মজুরীর বেলায় মেয়েদের দেয়া হয় অর্ধেক মজুরী। ছেলেদের দিনমজুরীর পরিমাণ ৬০ টাকা মেয়েদের অবশ্য ত্রিশ টাকা। অবশ্য এই মজুরীর হারে বৈষম্যের পরিমাণ একেকখানে একেকরকম।

অথচ আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষের (১৯৭৫) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্ত্রী পুরুষের সমান মজুরী হওয়ার কথা। এ বিষয়ে সরকার বড় equal Remunaration Act, ১৯৭৬ চালু করেছেন ২ নং অধ্যায়ের ৪ নং ধারাতে বলা হয়েছে একই ধরণের কাজের জন্য স্ত্রী পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে কোন প্রকার মজুরী বৈষম্য থাকবে না। ৪ নং ধারায় দুই উপধারাতে বলা হয়েছে মালিক বা কর্তৃপক্ষ কোন শ্রমিকের মজুরী কমিয়ে দিতে পারে না। ৫ নং ধারাতে বলা হয়েছে অন্য কোন আইনগত বাধা না থাকলে কর্ম নিযুক্তিতে মহিলাদের কোন প্রকার বাধা দেয়া চলেব না। অথচ বিনা কারণেই মেয়েদের কাজ যখন তখন বন্ধ করে দেয়া হয়। ছাঁটাই করা হয় কখনো একেবারেই বাদ দিয়ে দেয়া হয়।

তাছাড়া গর্ভবতী শ্রমিক মহিলার বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। এইগুলি সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক মহিলারা পেয়ে থাকেন। কিন্তু যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী মজুর তাদের এই সুযোগ সুবিধা মিলে না। উপজাতি মহিলারা যে কাজ করে সেটা ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত নয় বলে কোন সুযোগ সুবিধাও পান না।

উপসংহার ঃ

আদিবাসী উপজাতি মহিলার জীবনে জন্ম থেকেই কঠোর পরিশ্রম শুরু হয় বলতে গেলে অবসর বলে তার জীবনে কিছুই থাকে না। মানুষের জীবনে কর্মের মত অবসরও তার মানবাধিকার। এরপর তার শিক্ষার অধিকার খেলার অধিকার। সহসাথী ছেলেদের মত নিঃসঙ্কোচ ভরহীন সমালোচনাহীন জীবনের অধিকার সবই তার পাওয়ার দাবী রয়েছে। ১৯৯৫ এর বেজিং সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষের ঘোষিত দাবী দাওয়ার রূপায়ণে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সমাজে তার গুরুত্বের কথা আলোচনা হয়।

সেখানে মেয়েদের প্রতিবেদন থেকে দেখা গেছে যে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে একজন পুরুষ একটি বলদ যা কাজ করে তারও চেয়ে দেড় গুণ বেশী কাজ করে সে অঞ্চলের মহিলা।

উপজাতি মেয়েদের প্রসঙ্গে একদিকে কাস্টমারী লজ একদিকে দেশের মেয়েদের জন্য দেওয়ানী বিধি নানা সংঘাতের সৃষ্টি করছে।

এইসব ঝামেলা এড়াতে অবিলম্বে দেশের সমস্ত মেয়েদের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাস্টমারী ল'জগুলির কোডিফিকেশান জরুরী ভিত্তিতে করা দরকার। তার সম্পত্তিতে অধিকার, সম মজুরীর অধিকার, জমিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অধিকার এবং অবশেষে মানবাধিকার রক্ষার জন্য দেশের সরকার সমাজ সকলকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রেমিক সুভাষ

আমাদের অনেকেরই বিচার বিবেচনার মধ্যে কেমন এক ধরনের আবেগ যেন কাজ করে যা যুক্তি বা হৃদয় দিয়ে নয় গতানুগতিক ছাঁচে ঢালা কিছু চিন্তা চেতনায় বয়ে আসা ঐতিহ্য, পুরানো জীবন-দর্শনকে নিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ বুজে চলে। তাই আমরা অসার্থক বিবাহিত জীবনে যা এমনি এমনি বিবাহিতা মেয়েদের নতুন কোন প্রেম পছন্দ করি না। সহায় সম্বলহীন বিধবার বিয়েকে ঠিক মেনে নিতে পারি না। পতিতাকে নূতন করে সমাজে বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ভাবতেই পারি না। বাবার বিয়ে যদিও বা হজম করা যায় দুঃখিনী অনাথা উপায়হীন কোন মায়ের বিয়ে রীতিমতো ঘৃণা জাগায় এবং তজ্জাত ক্রোধে আমাদের শেষ মাথায় নিয়ে যায়। ঠিক তেমনি মান্য গণ্য দেশ-বরেণ্য নেতাব বা এককালে সাধু সন্ত ব্রহ্মচারী প্রেম বিয়ে যা আবার গার্হস্থ্য জীবন আমাদের খুব করে। আরো বেশী মুষড়ে যাই যদি সে বিয়ে জাতে মতে কুলেশীলে নিয়মনীতি বিধান মেনে না হয়।

এমনি এক মাপক কাঠি নিয়ে আমাদের দিন চলা। এই দিন-চর্চায় আমবা কোন ভিন্নতর ঘটনা বা ব্যতিক্রমকে তার নিজস্ব কার্য কারণ সূত্রে স্বাধীন অনুভবে, হৃদয়ের গভীরতায় বিচার করতে চাই না। অবশ্য সে না চাওয়াটা না পারারই আরেক পিঠ। হয় এটা দৃষ্টির ক্ষুদ্রতা নয় আবেগের ছন্নতা। পিতৃদোষে মূর্খতা আর মাতৃদোষে ছন্নতা। কিন্তু পন্ডিত লোকেও দেখা যায় পিতৃদোষ কাটিয়ে উঠেছেন সত্যি কিন্তু ছোট্ট চিন্তার গুটি থেকে বেরিয়ে হৃদয় সৌন্দর্যে আর প্রজাপতি হতে পারেন না।

এসব ব্যক্তিদের জন্যই উচ্চকোটিতে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ বা নেতারা লোকচক্ষুতে হেয় সমালোচিত বা জনতার আদালতে সোপর্দ হবার ভয়ে চিন্তায় তাদের জীবনের সহজ স্বাভাবিক মধুর অধ্যায়ের বিষয়েও যতদিন পারেন নিশ্চুপ থেকে যান। কিভাবে কত অকৃতদার নেতা যথারীতি বিয়ে করে কয়েকটি সন্তানের পিতা হবে। চিরকুমারই থেকে যেতে বাধ্য হন। অস্বীকৃতির কষ্ট যন্ত্রণায় স্ত্রী পুত্র কন্যা অযথা এক অগৌরবের জীবন কাটান। কিন্তু কেন এই অন্যায় অবিচার?

রক্ত মাংসের একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে শ্রেষ্ঠ অনুভূতি স্নেহ প্রেম ভালবাসা স্বপ্ন রোমান্স থাকতে পারে না? কেন তাকে আমরা চাঁছাছোলা রুক্ষ ত্যাগী পুরুষ, কঠিন

নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামী হিসাবেই পেতে চাইবো? এসব দিয়ে শুরু করেও তো তাঁর জীবনে কোন মাহেন্দ্রক্ষণ কোন সোনালী রঙীন মুহূর্ত হঠাৎ আসতে পারে যা তার জীবনে নূতন কিছু মাত্রা যুক্ত করে তার বর্তমান এবং আগামী সমস্ত জীবনকে অতীতের সবকিছু ছাপিয়ে মহামূল্যবান করে তুলতে পারে।

সমস্ত কিছু দায়দায়িত্ব পালন করে সমস্ত উচ্চতর ভাব-ভাবনাকে পাশে নিয়েও তো সেই হৃদয়-নদী আরেক খাতে বিভক্ত হয়ে সমানতালে বইতে পারে। তাতে আমাদের পাওনার জগতে কি ক্ষতি?

ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব নেতাজী সুভাষ বসুর জীবন নিয়েও এই প্রশ্ন মনকে বিষাদে ভরে দিয়ে যায়। এত বড় অমিত বিক্রম, লৌহ কঠিন সংগ্রামী মানসিকতার মানুষটির জীবনে কি কুসুম কোমল প্রেমের প্রকাশ ঘটেছিল। কি তাঁর গভীর গোপন সৌরভ -- কি অপরূপ যন্ত্রণা, কত যে অপ্রকাশের বেদনাক্ষণ, মিলনের সুখ উচ্ছ্বাসেই চির বিরহের অন্ধকার, তাকে আমরা তেমন করে সম্বর্দ্ধিত করলাম কই? ভাবলেই কেমন অপরাধ বোধ হয়। আমাদের সমাজ মানসিকতার ক্ষুদ্র তালে চোখে বড় ঠেকে।

একদিন বাংলাদেশের সমাজ-মানস রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তাকে দেশ নায়ক করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ নায়কের পদে বরণ করি। গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ তাকে সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশকারী বলে বর্ণনা করেছেন। দার্শনিক, ভাবুক, দেশপ্রেমী, মুক্ত, সাম্প্রদায়িক প্রীতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিপ্লবী সুভাষ ছোট থেকেই ত্যাগী আদর্শবাদী সেই সঙ্গে সত্য সন্ধানী রোমান্টিকও। প্রচন্ড নৈতিক মূল্যবোধে বিভূষিত সুভাষ সত্য পথের সন্ধানে বাড়ি থেকে পালিয়ে হিমালয়ে চলে যান আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্খায়। পৃথিবীতে একটা নতুন জীবন নতুন সৃষ্টির ইচ্ছায় উন্মুখ তরুণ সুভাষ কাঙ্খিত পথ, এ পথে সেদিন পাননি। ফিরে এসেছেন কর্মের জগতে মানুষের জগতে। 'আত্মদানের আনন্দে আমরা বিভোর হইব' — সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে। কিন্তু আমাদের দেওয়ার শেষ নাই কর্মেরও শেষ নেই কারণ — 'যত দেব প্রাণ/রহে যাবে প্রাণ/ ফুরাবে না আর প্রাণ এ কথা আছে এত সাধ আছে/ এত প্রাণ আছে মোর/ এত সুখ আছে, এত সাধ আছে/ প্রাণ হয়ে আছে ভোর — এই কথাগুলির বক্তা সুভাষচন্দ্র তার রাজনৈতিক গুরু চিত্তরঞ্জন দাসের কাছে বলেছিলেন ''আপনি বাঙলাদেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক। তাই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি — মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছু নাই। আছে শুধু নিজের এক মন আর এই তুচ্ছ শরীর'' — যার হৃদয়ে এত কথা এত প্রাণ, এত সুখ এত সাধ ছিল তার একটা তুচ্ছ শরীরও ছিল — সে শরীরটাই একদিন বেঁকে বসলো।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্ণবহুল কর্মকান্ড ঘটনাবহুল সংগ্রামের ধারায় —

শিওনী জেলে জব্বলপুর জেলে সুভাষ শরৎ দু'ভাইয়েরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। এর মধ্যে সুভাষচন্দ্রের যক্ষ্মারোগ বলে সন্দেহ করা হলো, সঙ্গে গলব্লাডারের ব্যথা। তবু ইংরেজ সরকার তাকে মুক্তি দেবেন না — লক্ষ্মৌর হাসপাতাল, ভাওয়ালির স্যানিটেরিয়াম, মাদ্রাজের জেলে — নীলরতন সরকার এবং বিধান রায়কে দিয়ে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা করা হলো কিন্তু তার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই গেল। অবশেষে স্থির হলো দেশ ছাড়লে মুক্তি দিয়ে তাকে বিদেশ গিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে দেয়া যেতে পারে — তবে অবশ্যই নিজ খরচায়। ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারীতে 'এস এস ডাঙ্গে'' জাহাজে তিনি ইউরোপের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়লেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ — এই ক'বছরের ইউরোপ বাসের জীবনে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যই শুধু বদলে যায় নি, তার সমস্ত জীবন মন এবং হৃদয় জগতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। যদিও তার জীবন ও কর্মের আলোচনায় এই অধ্যায়টি খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে আলোকিত হয়নি এখন তবু তার রচনা সমগ্রের অষ্টম খন্ডের ভূমিকায় সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছে The year 1933 to 1937 witnesed the transformation of radical leader into a statesman.

তার জীবনের নানা রাজনৈতিক কাহিনী তার দ্বিধা দ্বন্দ্ব মতভেদ জার্মান ও জাপানে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আন্দোলনের কথা সবাই আলোচনা করেন কিন্তু ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত এই নির্বাসিত জীবনের কথা কেউ তেমন আলোচনা করেন না অথচ এই সময়টা তার জীবনে মানসিক বিবর্তনের এক গুরুতর অধ্যায়। এই সময়ের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি। দুঃখকে তুমি করে তুলেছো সুযোগ, বিঘ্নকে করেছো সোপান।

এই সুযোগ গড়ে তোলার পিছনে ছিল এক সঞ্জীবনী শক্তি। তার নব আস্বাদিত প্রেম, অস্তিত্ব নাড়া দেয়া প্রচন্ড ভালবাসা। সে সময়ে দেশে বান্ধবীর সাহচর্য সম্ভব ছিল না। যাঁরাই তাঁর হিতৈষী ছিলেন সবাই বয়স্কা নারী। এ সময়ে বেশ কিছু গুণী প্রতিভাময়ী নারীর সাহচর্য, সাহায্য, অনুপ্রেরণা তিনি পান বিদেশে। একটু শরীর সারতেই তিনি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শ্রীমতী নাওমি ফেতার, হেডিফুলপমিলার, এমিলিয়ে শেঙ্কল প্রভৃতি তাঁর বেশ কিছু বিদেশিনী বান্ধবীরা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ভিয়েনা, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড, জেনেভা বহু শহরে। ভিয়েনা ও প্রাগ সুভাষচন্দ্রের প্রিয় ছিল তার মধ্যে ভিয়েনার প্রতি তার বিশেষ টান ছিল। তিনি নাওমি ফেতারকে লিখেছিলেন অনেকে আশ্চর্য হন কেন আমি গত তিন বছর এত সময় ভিয়েনাতে কাটালাম — আমি কিন্তু আশ্চর্য হই না।'' আমরাও হই না। কারণ সেখানে এমিলিয়ে শেঙ্কল ছিলেন। সব রকম অন্যায়, সব রকম বাধা কাটিয়ে তাঁর সংগ্রাম চলেছে একদিকে আরেকদিকে তার এত প্রাণ, এত সাধ, এত সুখ প্রেম চেতনায় ভোর হয়েছিল নতুন আবেগে। এই পর্বেই তার সৃষ্টিশীল মন রচনা করেছে দুটি বই। 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল, লেখা হয়েছে ১৯৩৪ সালে। ভিয়েনাতে

এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন এমিলিয়ে শেঙ্কল। ১৯৩৪-এর জুন থেকে প্রায় প্রতিদিন লিখে নভেম্বরে বইটি শেষ হয়। রোম থেকে ২৫ শে জানুয়ারীতে এমিলিয়েকে তিনি লিখেছেন 'বইটি প্রকাশিত হয়েছে। ছাপা ভাল হয়েছে। ভূমিকাতে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছি।'

১৯৩৭ এ বাদগাস্টাইনে লেখা হয় তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম।' সেখানেও সাহায্যকারিনী ছিলেন এমিলিয়ে। ১৯৩৫-এর মধ্যে তিনি ভারতে এলেন এবং বোম্বাই বন্দরেই গ্রেপ্তার হলেন। জেলে যেতে হলে তাকে আবার। আবার ১৯৩৭-এ ফিরে এলেন তার প্রিয় পার্বতী শহর বাদগাস্টাইনে। ১৯৩৪-এর পরিচিতা বান্ধবী সুন্দরী এমিলিয়ে তখন তাঁর প্রিয়তমা এমিলিয়ে। ধাপে ধাপে গভীর বন্ধুত্ব পর্যবসিত হয়েছে গভীর প্রেমে। সুভাষচন্দ্র তাঁকে জানালেন যে, আমার প্রিয়তমা তুমি হলেও আমার প্রথম ও একমাত্র প্রেম শুধু ভারতবর্ষ, এমিলিয়ে একে মেনে নেন। ১৯৩৭-এর ডিসেম্বরে এখানেই গোপনে বিয়ে হয়ে গেল তাঁদের। সাময়িকভাবে একথা গোপন রাখাই স্থির হল।

তাঁর জীবনের এই পরিবর্তনের দিক চিহ্নের সন্ধান জানতেন মাতৃসমা বাসন্তী দেবী — রাজনৈতিক গুরু চিত্তরঞ্জন দাসেব মা। তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন 'তুমি বার বার ভিয়েনায় যাও কেন বলতো? এর পিছনে নিশ্চয় কোন মেয়ে আছে, শোনা যায় একথা শুনে তার কান লাল হয়ে গিয়েছিল। বাসন্তী দেবী একথা বলেছিলেন সুভাষের ভাইজি কৃষ্ণা বসুকে।

এই পরবাস এই নির্বাসন সুভাষচন্দ্রের জীবনে এক গভীব নির্মাণের ইতিহাস। একে অস্বীকার করলে সত্যকে অস্বীকার করা হয়। একদিকে পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃখ অপমানের কথা বিশ্বে প্রচার করে দেশ বিদেশের রাষ্ট্র নেতা মনীষীদের সান্নিধ্যে এসেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির খুব কাছে থেকে. সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের জন্য আবার যুদ্ধকেই স্বাগত জানিয়ে রোমা র্যোলাকে লিখছেন আবার ঠিক এ সময়েই আত্মদর্শনের অনুভব করেছেন।

Persisted little knowing at the time have natural the sex instinct was to the human mind — তিনি বুঝতে পেরেছেন বাস্তব অস্তিত্বের মূলভাব প্রেম। I see all around me the play of love. I perceive within me the same instinct I tell that I must love in order to fulfill my self and I need love as the basic principle on which to re-construct life — তাঁর নতুন জীবন গড়ার মধ্যে এই ভালবাসা — এই এমিলিয়ে শেঙ্কল — তিনি কি শুধু একজন সুন্দরী নারী? না — তিনি পরিপূর্ণ এক শক্তিময়ী প্রেমময়ী নারী — যাঁর অস্তিত্বে সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশেছে প্রজ্ঞা, ঔদার্য, মহৎ উচ্চাঙ্গ চিন্তা চেতনা।

নিজের বিয়ের কথা সুভাষচন্দ্র সুন্দর একটি চিঠিতে মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে জানিয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে তিনি জার্মান ছেড়ে এশিয়া রওয়ানা হন সাবমেরিনে। যাত্রা পথ বিপদ পরিপূর্ণ, ফিরে আসার আশা খুবই সামান্য। প্রাণ প্রিয়তমা স্ত্রী

সদ্যজাত, কন্যাকে ফেলে চলে যাচ্ছেন। হৃদয় নাড়ানো মর্মস্পর্শী ভাষার সে চিঠিতে তিনি জানালেন তার স্ত্রী এবং সদ্য জন্মানো শিশু কন্যার কথা। তাঁর সম্ভাব্য অবর্তমানকালে তাঁদের দেখাশোনা করার অনুরোধ জানালেন।

সুভাষচন্দ্রের সংগ্রাম তাঁর অন্তর্ধান তাঁর মহানজীবন সবই আমাদের মনোজগতে এক অতুলনীয় দুর্লভ হৃদয় উদ্বেলকারী শ্রদ্ধা ও সম্মানের ইতিকথা।

কিন্তু তাঁর এত ভালবাসার পাত্রী এমিলিয়েকে আমরা কতটুকু দিতে পারলাম তা আমাদের কর্তব্য বোধকে কতটা গৌরবযুক্ত করেছে তা আজ ভাবার কথা। স্বামীর প্রতি বুকভরা ভালবাসা, বসু পরিবারের প্রতি আনুগত্য শ্রদ্ধা প্রীতি নিয়ে দূর বিদেশে স্বাধীনচেতা, তেজস্বিনী এমিলিয়ের জীবনযাত্রায় কোন প্রচারের উগ্রতা ছিল না, নিজেকে জাহির করার কোন ব্যস্ততা কিছুই দেখা যায়নি। আজ নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর প্রধান শিশির কুমার বসুর প্রকাশিত 'লেটারস টু এমিলিয়ে' থেকে মানুষ প্রেমিক সুভাষচন্দ্রকে জানার এক দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে। এমিলিয়ের চালচালনে ছিল প্রাচ্য আদর্শ। এক বিরাট দেশপ্রেমিকের ক্ষণকালীন প্রেম বিশ্ব আলোড়ন করা ঐতিহাসিক পট ভূমিকায় তাঁর অবিস্মরণীয় সংগ্রামের ভগ্ন অংশ জুড়ে তাঁর সুখময় স্মৃতি আর নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ বেদনা এমিলিয়ের জীবনকে গৌরবান্বিত করেছে। তবু তিনি নেপথ্যচারিনী হয়ে সরে রইলেন নাকি আমরাই তাকে তা করে রাখলাম জানি না।

কিন্তু দুঃখ হয় যখন তাঁর মত নারীকেও সমালোচিত হতে হয় তাঁর প্রতিও বক্রোক্তি বর্ষিত হয়। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদের পর তিনি জার্মানীতে পত্নী কন্যা রেখে গেছেন শুনে লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মনে নাকি কঠিন আঘাত লেগেছিল। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, প্রথম সংবাদটা একেবারে অবিশ্বাস করিলাম। পরে শুনিলাম বসু পরিবার সুভাষচন্দ্রের পত্নী কন্যাকে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও পরে শুনিলাম আনুষ্ঠানিক বিবাহ সত্যি হইয়াছিল। কিন্তু আমার কাছে পত্নীত্ব বা উগ্রপত্নী প্রশ্নটা অবান্তর।

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল সে ধারণা আমাদের যুগের প্রত্যেকেরই হইবার কথা .... সুভাষচন্দ্রের বিবাহ ও সন্তান জন্ম সত্য ঘটনা জানিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম তাঁহার পক্ষে এমন আচরণ কি করিয়া সম্ভব হইল।

...........সুভাষচন্দ্র নারীর প্রেমে ব্রতত্যাগ করিতে পারেন না .... ইত্যাদি, এমিলিয়েকে তিনি সুভাষের জার্মান সেক্রেটারী বলে উল্লেখ করেছেন। এসব কথায় মনে হয় প্রেম আর ব্রত যেন পরস্পর বিরোধী বস্তু। একে অপরকে যে শক্তি ও সম্পদ জোগায় তা যেন এসব ব্যক্তির অজানা।

যাক এমিলিয়ের প্রতি কিছুটা কর্তব্য করে গেলেও কন্যা অনীতার প্রতি সুভাষচন্দ্র তার কিছুই করতে সুযোগ পান নি। তবু প্রচন্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী অনীতা রাজনৈতিক,

সামাজিক, পারিবারিক জগতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আজ প্রতিষ্ঠিতা।

তবু আজ মনে হয় প্রিয়তমা স্ত্রী কন্যাকে ফেলে রেখে দেশ সেবার ডাকেই চলে গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। প্রেমিক স্বামী, প্রেমময় পিতার হৃদয় তাঁর পিছনে ফেলে রেখে সজল চোখে বিদায় নিয়ে তিনি যাত্রা করেছিলেন অনিশ্চয়তার পথে। এমিলিয়ের অধ্যায় আজ আরো গৌরবান্বিত আরো গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা চেতনায় আমাদের উৎসবে আনন্দে আসা উচিত। সুভাষচন্দ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে, হাসপাতাল থেকে, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে, রাজনৈতিক সফরে, গান্ধীজীর সঙ্গে মত বিরোধের দিনগুলিতে সব সময় এমিলিয়েকে চিঠি লিখেছেন বুদ্ধি পরামর্শ নিয়েছেন। বাস্তব জগতে এমিলিয়ে তাঁর থেকে দূরে থাকলেও মানসিক জগতে এমিলিয়ে সব সময় তার কাছে কাছে এবং একেবারে পাশে ছিলেন।

তাই তিনি লিখতে পেরেছেন — "I Just west to let you know I am exactly what I was before when you knew me not a single day passes that I don't think of you - you are with me all the time I can not possibly think of anybody else in this world "

অথচ আমাদেব অনেকেবই ধারণা যে সুভাষচন্দ্রেব জীবনে তাব প্রেম তাব বিবাহ একটা এমনি সাধাবণ ব্যাপার। এসবে বা গার্হস্থ্য জীবনে তাঁর প্রকৃত কোন টান ছিল না। তিনি সংগ্রামী দেশ নেতা, আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসই যাব জীবনের মূল সুর ইত্যাদি। গার্হস্থ্য জীবন ছেড়ে দিকভ্রান্ত বেরিয়ে গেছেন বৃহত্তর জগতে। এ সবই ভুল।

তিনি একজন আপ্লুত প্রেমিক, যে প্রেমেব ছবি আমরা দেখি 'লেটারস টু এমিলিয়ে শেঙ্কল,' বইয়ের সপ্তম খন্ডের মলাটে বা প্রচ্ছদপটে। বাদগাস্টাইনের মাটিতে তোলা এ ছবিতে সুভাষচন্দ্র এমিলিয়েকে আলতে করে জড়িয়ে আছেন প্রীতিভরে। বিদেশিনী বলে বা এমন একজন জগৎ বিখ্যাত সংগ্রামী নেতার জীবনে একটা যেন হঠাৎ ঘটে যাওয়া অস্বস্তিকর ঘটনা বলে তাকে পাশ কাটিয়ে রাখা যায় না। আজ বিস্তর ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা ত্যাগ করে এমিলিয়েকে যদি তার বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমবা না তুলে ধরি তবে নেতাজীব প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বোধ হয় পূর্ণ হবে না।

তাঁর এই অনলস আন্তরিক জীবনের প্রতি নজর না দিলে তাঁর জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়ণ ত্রুটিযুক্ত হতে বাধ্য এতে কোন সংশয় নেই।

বঙ্কিম মানসে চিরন্তনী আধুনিকারা

"যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহে দাসীত্ব তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না"— ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন সমাজে স্ত্রীলোকের আলাদা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না — নবকুমার, নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দলাল, ব্রজেশ্বরের মতো পুরুষরা যখন বাঙালী সমাজ শাসন করতেন সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুন্ডলার মুখে এই অবিশ্বাস্য উক্তি দিয়ে প্রকারান্তরে ভাবী নারী জাগরণে তার সংগ্রাম এবং বিদ্রোহের এক বৈপ্লবিক সূচনা করে গেছেন। যদিও তখন বঙ্কিমী নায়িকাদের মুখে এ ধরণের উক্তিতে কেউ তেমন কান মন দেন নি বিশেষত, কপালকুন্ডলা তো সমাজ সভ্যতা বহির্ভূত এক অরণ্যদুহিতা বালিকা। যার অজ্ঞানতা বা ধৃষ্ট বাতুল উক্তিকে অনায়াসেই কাল্পনিক বলে ক্ষমার চোখে দেখা যায়। কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রে মৃন্ময়ী (বিবাহিত জীবনে কপালকুন্ডলা) সূর্যমুখী, কুন্দনন্দনী, শৈবলিনী, ভ্রমর এদের মধ্যে যে জীবনবোধ, ক্রোধ, বিদ্রোহ, সংগ্রাম প্রাগ্রসর মানসিকতা, আত্মমর্যাদাবোধ দেখিয়েছেন তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছিল অকল্পনীয়, বিংশ শতাব্দীতে সাধনীয় এবং একবিংশ শতাব্দীতে হয়তো বা সাধ্য হবে।

এইসব নায়িকারা কেউ আত্মমর্যাদার প্রশ্নে সমাজের কাছে বা পুরুষের পায়ে মাথা নোয়ায় নি, পরাজয় মেনে নেয়নি। প্রয়োজনে কেউ ঘর ছেড়েছে, কেউ স্বামী ছেড়েছে। কেউ দেহ ছেড়ে মৃত্যুবরণ করেছে তবু মুখ বুজে অপমান অসম্মান সহ্য করেনি। বঙ্কিমের প্রায় সব উপন্যাসেই রোমান্স প্রেম ভালবাসা ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ সংগ্রাম রয়েছে — তা কখনো বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কখনো সমাজের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অহিংসার বিরুদ্ধে, কদাচার, সঙ্কীর্ণ অনুশাসনের বিরুদ্ধে। বঙ্কিমের নায়িকারা বাইরের কাঠামোয় সামান্য গৃহবধূ। সামান্য স্ত্রীলোক মাত্র, কিন্তু অন্তরের দৃপ্ততায়, বিশ্বাসে পূর্ণতায় তারা প্রত্যেকেই এক অপূর্ব সংগ্রামী। এইসব সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আজও রয়ে গেছে পূর্ণমাত্রায়, প্রয়োজনীয়তা কমেনি।

মৃন্ময়ী চরিত্রটির রূপকল্পনায় এইসব বিদ্রোহপূর্ণ মানবিক কথা বলিয়ে নিতে বঙ্কিমের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল কারণ মৃন্ময়ীর চরিত্রের বেড়ে ওঠার মধ্যে প্রথম থেকেই একটা সতেজ সরল অনাবিলতা ছিল।

স্ত্রীলোকেরা সব সময়ই স্বামীর সম্পত্তি। ভালবাসায় না হোক একটা নিম্নস্তরের অধিকার এবং দাসত্ব মানসিকতায় স্বামীদের ভয় থাকে এই বুঝি মেয়েরা পর পুরুষের দ্বারা নষ্ট হয়ে গেল। নবকুমারের এইরকমই একটা অবিশ্বাসী মনোভাবের প্রশ্নে তাই মৃন্ময়ী নিঃসঙ্কোচে জোর দিয়ে বলতে পারে 'আইস আমি অবিশ্বাসী কিনা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও। ননদের জন্য বলীকরণের শিকড়, বাকড় খুঁজতে গেলেও কজন গৃহবধূ একথা আজও স্বামীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলতে পারে। বড় কথা ক'জন এমন প্রয়োজনেও নিঃসঙ্কোচে নিশা রাত্রিতে সাহস করে বের হতে পারে? এখনো কার্যব্যাপদেশে একটু গভীর রাতে ফিরলেই মেয়েদের কপালে কি অঘটন ঘটে তা আমরা মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন' ছবিতে দেখতে পাই।

বঙ্কিমের পরোপকার বৃত্তিতে ভূষিতা নায়িকা কপালকুণ্ডলা (মৃন্ময়ী) যে একদিন মৃত্যুর হাত থেকে নবকুমারকে উদ্ধার করেছিলেন সে আজ ননদ শ্যামাসুন্দরীর মঙ্গলের জন্য যা করছে তার জন্য সম্পূর্ণ ভয়হীন দ্বিধাহীন। এজন্য লোকনিন্দাকে স্বামীর বাধাদানকে ঘৃণা করে। কপালকুণ্ডলা এভাবে রাত্রিতে বাইরে গেলে তাকে দাদার সন্দেহভাজন হতে হবে বলে শ্যামাসুন্দরী আশঙ্কা প্রকাশ করায় কপালকুণ্ডলা বলছেন -- "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" কি অত্যাশ্চর্য দর্পিত উক্তি।

নবকুমার অত্যাচারী নিষ্ঠুর পুরুষ ছিলেন না ছিলেন দুর্বল সঙ্কীর্ণমনা ভীরু পুরুষ যারা তিরস্কার না করতে পারলেও অবিশ্বাস সংশয় দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারেন। তাই তিনি বলেন "কপালকুণ্ডলে আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি একবার বল যে তুমি অবিশ্বাসিনী নও। একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।

এর উত্তরে কপালকুণ্ডলা হাত ধরে নবকুমারকে ওঠালেন তারপর মৃদু স্বরে বললেন 'তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই' -- তারপর জবাব দিলেন 'তুমি যাহাকে দেখিয়াছ সে পদ্মাবতী, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম — কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না।"

কপালকুণ্ডলা তথা মৃন্ময়ী বুঝেছিলেন যে এ ঘরে ভালবাসা এবং বিশ্বাস সত্য বস্তু নয়। বিশ্বাসের উপরই স্ত্রী পুরুষের প্রেম নির্ভর করে অবিশ্বাসে নয়। যেখানে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নেই সেখানে এ ঘটনা একবার নয় একাধিকবার বারবার এবং সারাজীবন ঘটবে, ঘটতে পারে। বাস্তব জীবনে তাই ঘটে।

শুধুমাত্র যবনী হওয়ার অপরাধে যে ঘরে পদ্মাবতীর প্রতিষ্ঠা হলো না — পদ্মাবতীকে হতে হলো বিদ্রোহিনী তার জেদ স্বামীর অধিকার সে এ জন্মে ছাড়বে না। যেভাবেই বিশ্বাস এবং সম্মানে প্রতিষ্ঠা হলো না বলে আবার মৃন্ময়ীকে ঘর ছেড়ে হলো বিদ্রোহিনী। নবকুমারের আচরণের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম বাঙালী সমাজের একটা ছবি তুলে ধরেছেন। যাদের নিয়ে মৃন্ময়ীরা ছিলেন এবং কেমন আছেন সে সমাজে তাঁর নায়িকারা প্রথাগত

আচরণ ভেবেই প্রয়োজনে বিদ্রোহিনী হোক আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জ্বল হোক এটা তিনি চেয়েছিলেন।

মানুষের জীবনে প্রলোভন আসতে পারে আসার পরে দুর্বলতা, মোহ ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি কিন্তু তা চিরন্তন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। পুরুষের দ্বিতীয়বার বিয়ে সমাজ অনুমোদিত হলেও এটা স্ত্রীর কাছে হৃদয় অনুমোদিত নয়। বিশেষতঃ যেখানে তেমন কোন উপযুক্ত কারণ থাকে না। তবু ঊনবিংশ শতাব্দীতে তো বটেই বিংশ শতাব্দীতেও বহু নারী মুখ বুজে এই দুঃখ অপমান সয়ে গেছেন, সয়ে যান। কখনো একই ঘরে সতীন সহ সহাবস্থান করেন। কখনো তাকে ভিন্ন আস্তানায় সরিয়ে দেয়া হয় (সরে যান খুব কমই)। কারণ যাওয়ার জায়গা কোথায় বা থাকলেও মেয়েদের সাহস বা সুযোগ কোথায়?

সূর্যমুখীকে কিন্তু বঙ্কিম নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে বিয়ে করার পরই গৃহত্যাগ করিয়ে তার প্রতিবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এটা সে যুগে কতটা সম্ভব ছিল তা সন্দেহজনক। কারণ এখনো দেশে বহুবিবাহ না নিন্দনীয় না আইনত নিষিদ্ধ। বহুবিবাহ নিরোধ আইন তখনো চালু হয়নি। তবে বিদ্যাসাগরের কল্যাণে বিধবা বিবাহ আইন চালু হয়েছে।

তেমনি অন্যদিকে কুন্দনন্দিনী বিদ্রোহ প্রকাশ করেছেন আত্মহত্যা করে। এখানে বিধবা বিবাহটা কোন কারণ নয়। কারণ নগেন্দ্রনাথের গাঢ় ভালবাসা সূর্যমুখীর উপর - কুন্দনন্দিনীর প্রতি তার ক্ষণিক রূপজ মোহ তায় আসক্তিকে সম্মানিত করেনি। এই আবিষ্কার কুন্দনন্দিনীকে ব্যথিত এবং অসম্মানিত করেছে। এরপর বেঁচে থাকার আকর্ষণ সে আর খুঁজে পায়নি। মৃত্যুই তার কাম্য ছিল।

কারণ প্রেমহীন বিবাহ আদর্শ হিসেবে নারীর পক্ষে অসম্মানের। সূর্যমুখীর মত কুন্দনন্দিনীও নগেন্দ্রনাথের আচরণে আঘাত প্রাপ্তা। স্বেচ্ছামৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে জানিয়ে গেছে যে আইন করলেই সব কিছুর প্রতিষ্ঠা হয়না। বিধবা বিবাহ আইন নগেন্দ্রনাথের মত বিবাহিত, প্রতিষ্ঠিত কিছু মানুষের লোলুপতা চরিতার্থ করার উপায়ের জন্য নয়। কুন্দনন্দিনীর মত বিধবার বিয়ে অবিবাহিত যুবকের সঙ্গেও হতে পারতো — হতে পারে। অবশ্য সেক্ষেত্রে কজন এগিয়ে আসতো - আজো আসে?

এভাবে ঘর ছেড়েছে শৈবালিনীও। তার কারণ বাল্য প্রেম নয় — বাল্য প্রেমিক নয় — কারণ স্বামী চন্দ্র শেখর। যার ঘরে শৈবলিনীর ভূমিকা ছিল অস্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল অসম্পূর্ণ। তার সংগ্রাম ছিল মুক্তির সংগ্রাম। গ্রন্থ পাগল জ্ঞান তপস্বী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। জীবন জিজ্ঞাসা তাকে অসুখী করে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে এই মানসিক ক্লেশ শৈবলিনীর সহ্য হয়নি। তার গৃহত্যাগই স্বামী চন্দ্রশেখরকে তার জাগতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম সচেতন করে তুলেছিল।

বাংলাদেশের তথাকথিত আসাড় হৃদয়হীন পুরুষদের মানসিকতা পরিবর্তনে নারীর এই সংগ্রাম এই বিদ্রোহ এই গৃহত্যাগ একটা চিন্তা চেতনা নিয়ে আসুক সেটা বঙ্কিমের ইচ্ছা ছিল।

প্রতাপের প্রেম এখানে গৌণ। বারো বছরের মেয়ে বিয়ের পর আট বছর স্বামীর সঙ্গে আনন্দে ভক্তিতে দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছে — , সেবা দিয়েছে চন্দ্র শেখরও তেমনি সন্তুষ্ট ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রিয় বহ্নিতে দগ্ধ, আত্মসুখ পরায়ণ চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর প্রতি লক্ষ্যহীন চন্দ্র শেখরই তার মুখ্য কারণ।

বঙ্কিমের নায়িকারা এভাবে সব অর্থেই অত্যাধুনিক প্রাণময়। এরা ঊনবিংশ শতাব্দীর কল্প রচনা কিন্তু প্রকৃত অর্থে একবিংশ শতাব্দীর ঘটনা।

তাই অবিশ্বাসিনী সন্দেহে অপমানিতা কপাল কুন্ডলা স্বামী পরিত্যাগ করে। কুন্দনন্দিনী নামক দ্বিতীয় প্রেমিকার আবির্ভাবে অপমানিতা সূর্যমুখী নিজের ভূমিকা ছেড়ে সম্মানকে আঁকড়ে ঘর ছেড়ে চলে যায় — রোহিনীকে কেন্দ্র করে স্বামীর বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে ভ্রমর তাকে ত্যাগ করে। কিন্তু শৈবলিনী এদের কোন দলে পড়েন না। সার্থক অস্তিত্বের প্রশ্ন 'এ জীবন নিয়ে কি করিব কি আমার ভূমিকা' — এ প্রশ্নে তিনি সরে যান।

তাঁর গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রশেখরের উপলব্ধি জাগে — তিনি তাঁর অধীত অধ্যয়নীয় (শোণিত তুল্য) প্রিয় গ্রন্থগুলি একে একে একত্রিত করে তাতে অগ্নি প্রদান করলেন।

আত্মসুখ পরাযণতার মায়াজাল খসে পড়ে। কিন্তু এতো আদর্শের পূজারী বঙ্কিমেব ছবিতে। বাস্তবে? উপক্রমনিকায় বঙ্কিম তাঁর চিরাচরিত দার্শনিকতায় সেই এককথায় বলে গেছেন -- 'যত বিদ্বান বুদ্ধিমান দার্শনিক সংসার তত্ত্ববিদ যে কেহ আস্ফালন কর সকলে মিলিয়া দেখ পরসুখধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল্য আছে কিনা? ' — চন্দ্রশেখর যেন শুনতে পায় -- 'নাই'। একদিকে পুরাণ ইতিহাস কাব্য অলঙ্কাব ব্যাকরণ তাকে যা দিতে পারেনি সে উত্তর সে মুহূর্তেই লাভ করে শৈবলিনীর এই মর্মান্তিক অর্ন্তধানে। হৃদয়ের মর্মস্থলে অনুভব করে 'বিদ্যাতৃপ্তিদায়িনী নহে — কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়।

শৈবলিনীকে যতই পাপীয়সী নামে সমাজ সাহিত্যিক জগৎ নামাঙ্কিত করুক শৈবলিনী গৃহত্যাগে এটা প্রধান হয়ে ওঠে যে মেয়েরা শুধু পুরুষের পত্নী অর্থে স্বামীর সেবাদাসী নয় আন্তঃপুরিকা নয় — গোপনে দুঃখ ভার সয়ে পাষাণ — হওয়া নয় - স্ত্রীর মনের দিকটা পুরুষকেও ভাবতে হবে সমানভাবে যেমন করে পুরুষের কথা নারী ভেবেছে।

সীতারামে বঙ্কিম বলেছেন 'স্ত্রী পুরুষের পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নয়। একাভিসন্ধি সহৃদয়তা ইহাই দাম্পত্য সুখ। এই দাম্পত্য সুখের অভাব বেদনাই শৈবলিনীর

জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তাকে গৃহত্যাগী করে। এই কাজ জীবন যন্ত্রণার অনিবার্য ফল।

বঙ্কিম এ বিষয়ে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আত্ম সুখ নয়, প্রিয় সুখ পর সুখই মনুষ্যত্বের লক্ষ্য এটা বোঝাতে চেয়েছেন।

বঙ্কিম দেশের জন্য শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয় সামাজিক জীবনেও সংস্কার, উন্নতি স্বাধীনতা চেয়েছিলেন সকলের জন্য মেয়েদের জন্যও। সমাজে ভ্রমরদের মত মেয়েরা আসুক, যে ভ্রমর অন্য নারীতে (রোহিনী) আসক্ত স্বামীকে চরম পত্র লিখতে পারে "তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা, তোমার উপর আমার বিশ্বাস অখন্ড। আমিও তাহা জানিতাম কিন্তু এখন বুঝলাম যে তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তি যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি যতদিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমাব উপর আমার ভক্তি নাই- বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও আমি কাঁদিয়া কাঁটিয়া যেমন কবিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।"

এরপর ছয় বছর পর স্বামী যখন চিঠি দেন "পেটের দাযে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি দিবে না কি?" তার উত্তরে তিনি জানান যে তার জন্য সকল বন্দোবস্ত করে তিনি পিত্রালয়ে চলে যাবেন — নতুন বাড়ী না হওরা পর্যন্ত সেখানেই থাকবেন। লেখেন " আপনার সঙ্গে আমার ইহ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবাব সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট, আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহাতে আমায় সন্দেহ নাই।"

কী অসম্ভব আত্মমর্যাদাপূর্ণ উক্তি — হৃদয়ে ব্যথা কাতর হয়েও সম্মানের প্রশ্নে সমতা প্রার্থিনী ঘাড় নোয়াবেন না। সেদিনকার বাঙালী সমাজে কোন স্ত্রীব পক্ষে এ ধরণের বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষনা কল্পনার অতীত ছিল। এটা বাস্তব ছিল না আদর্শের রচনা? বঙ্কিমেব এসব নারী চরিত্র ব্যক্তিগত দুঃখে বিবাদময়ী কিন্তু আত্ম স্বাতন্ত্র্যে মর্যাদায় সংগ্রামে উজ্জ্বল। এরা সকলেই নারী সুলভ স্নেহ প্রেমে ক্ষমায় ভূষিতা কিন্তু সেই সঙ্গে কঠোরতার, তেজস্বীতায় দর্পিতা। এরা বঙ্কিমের সাধ - সামাজিক জীবনে সাধনা বলা চলে। বঙ্কিমের চিরন্তন আধুনিক সব মানসকন্যা।

কিন্তু দুঃখ হয় 'সাম্য' প্রবন্ধে যাদের জন্য তিনি এত পক্ষ নিয়েছেন যাদের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য এত কথা লিখেছেন সে পুস্তককেই তিনি কেন তার রচনা থেকে বাদ দিলেন। তাহলে কি তাঁর মানসিক জগতে নারী পুরুষের সাম্য নারী প্রগতি সম্বন্ধে যে আদর্শ ভালোবাসা এবং সম্মান বিশ্বাস ছিল তা তিনি পরে সামাজিক চাপে পর্দার আড়ালে সরিয়ে দিয়েছিলেন? আজ বঙ্কিমের এই চিন্তা চেতনা সাধ এবং কল্পনার উপর নূতন আলোকপাত প্রয়োজন।

এ বিষয়ে তাঁর লেখা যথোপযুক্ত আলোচনা এবং গুরুত্ব পেলে প্রার্থিত নারী মুক্তি এবং প্রগতি বোধ হয় আরো আগেই সঠিক রূপ পেতো।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

আবিষ্কারের মধ্যে একটা উচ্চমার্গীয় আনন্দ আছে। সৃষ্টির মহত্তর আনন্দের চেয়ে এ আনন্দও কম নয়।

আমাদের আশেপাশেই ছিল চোখের সামনেই আছে তবু আমরা সে বিষয়ে কোন গভীর অনুধাবন না করে উপর উপর মলাট সমালোচকের ভূমিকায় যদি নিজের দায়িত্ব সারি তবে সেটা আমাদের লভ্যাংশেই ঘাটতি টানে। তাতে আমাদের অজ্ঞানতাই বাড়ে। এই ত্রুটিটুকু দূর করে নিতে পারলে কোন ব্যাপারকে সঠিকরূপে জানার গভীর আনন্দে আমাদের মন ভরে যায়।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের উচ্চ সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা ভালবাসায় আপ্লুত হই। কারণ জেলেদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে এক অপূর্ব মহাকাব্য বাংলাসাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। আমরা অনেকেই জানি তিনি শুধু 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের রচয়িতা। আসলে আমরা তাঁর সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানি না। কারণ তাঁকে নিয়ে এ যাবৎ তেমন বিস্তারিত কোন আলোচনা হয়ও নি। যদিও সিনেমা হিসাবে নাটক হিসাবে তাঁর রচনাটি চূড়ান্ত খ্যাতি পেয়ে গেছে। এ বিষয়ে তার স্বল্পায়ু জীবনও আরেকটি কারণ। জীবনের দায়-দায়িত্ব অভাব অনটন নিয়ে বিপর্যস্ত এই প্রতিভাধর সাহিত্যিকেব জ্ঞানরাজ্যে সাহিত্যের অঙ্গনে যে কি বিপুল এবং অনায়াস বিচরণ ছিল তা অনেকেরই জানা নেই। নিদারুণ ক্ষয় রোগের সঙ্গে যুদ্ধক্লান্ত এই লেখকের রচনায় জীবনের জয়গানই ধ্বনিত হয়েছে, ক্ষয় নয়।

সামান্য জল মজুর জেলে-মালো সম্প্রদায়ে জন্মেছিলেন তিনি ১৯১৪ সালে। ভাবতে অবাক লাগে যে সেখান থেকে কিভাবে উঠে এসেছেন তিনি --- সেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছোট্ট শহরের গোকর্ণ গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করে এসেছিলেন কুমিল্লায় আই. এ. পড়তে। মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি এবং ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া ছেলে অর্থাভাবে পড়া শেষ না করেই ঢুকে গেলেন চাকরীতে। চাকরী দিলেন কুমিল্লাব ধনী ব্যাঙ্কাব নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ব্যাঙ্ক ছাড়াও তাঁর ছিল অন্য কর্মক্ষেত্র। শিল্প সাহিত্য প্রিয় এই ভদ্রলোক তাঁর নূতন কেনা পত্রিকায় নবশক্তিতে অদ্বৈতকে সহ-সম্পাদক করলেন। সে সময়টার প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন নবশক্তিতে।

তখন ১৯৩৫ সাল। তিন বছর ছিলেন তিনি সম্পাদক হিসাবে। তিনি বলে যাবার পর অদ্বৈতই হন সম্পাদক। সেই থেকে তাঁর নিয়মিত গদ্য লেখার শুরু। তার আগে লিখেছেন কবিতা ছোটদের পত্রিকায়। নবশক্তিতে লিখেছেন নানা প্রতিবেদন, বাংলার লোক গান, ব্রত ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ। গল্প লেখার শুরু এসময়েই। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ থেকে তাঁর কোন চাকরী ছিল না। নবশক্তিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনিয়মিতভাবে দুএকটি পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু কাজ করেছেন, লিখেছেন। এ সময়েরই লেখা গল্প স্পর্শ দোষ। ১৯৩৮ সালে 'ভারতবর্ষ'-এ বেরিয়েছিল একটি গল্প, নাম 'মন্ডলিকা'।

১৯৪৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রকাশনা সংস্থায় যোগদান করেন তিনি। ঠিক এরপরই 'মোহাম্মদী পত্রিকা'র' দুই নদী নামে তিনটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয় 'তিতাস একটি নদীর নাম, দেশ আনন্দাবাজারে প্রকাশিত হয় কিছু প্রতিবেদন প্রবন্ধ বার হয় আর্ভিব স্টোনের লাস্ট ফর লাইফ' উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ 'জীবনতৃযা (১৯৫০)

এই পত্রিকাগোষ্ঠীতে যোগ দেবার আগেই প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতের চিঠি : পার্লবার্ককেও নামে তাঁর একটি রচনা। পাল বার্ক-এর 'দি গুড আর্থ'-এর দরিদ্র চাষী ওয়াঙ্ সাঙ্ -এর প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচার সংগ্রামে ভারতের দলিত মানুষ তিতাস কুলের মানুষের মিল আছে। সে কথাই তিনি পাল বার্ককে জানাতে চেয়েছিলেন।

মাত্র ৩৭ বছর বয়সের মধ্যেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ দু-তিনটি নভ্লেট, বেশ কয়েকটি ছোটগল্প, কিছু রম্য রচনা আর উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিবেদন লিখে গেছেন। এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে লোক সংস্কৃতির চর্চা। বিষয়টি যে যুগে তেমন পরিচিত ছিলনা তখন অদ্বৈত মল্লবর্মন সংগ্রহ করেছিলেন বেশ কয়েকটি অলৌকিক আখ্যান লোকসঙ্গীত। এগুলিকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অকৃতদার।

বর্তমান সময়ে আজ তার সাহিত্যিক প্রতিভা, রচনায় দক্ষতা তার রচনাপঞ্জী, তার সংগৃহীত পুস্তকের * তার উপরে বিভিন্নভাবে লেখার তালিকা সংগৃহীত হচ্ছে। গভীরভাবে পুর্নমূল্যায়নের কাজ চলছে।

এই ক্ষমতাবান অথচ মিতকথনের শিল্পী যেসব রচনা রেখে গেছেন এগুলির মধ্যে রয়েছে দরিদ্র অথচ প্রতিবাদী মানুষের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ। মিথ্যে বানানো ভাবপ্রবণ কথাবার্তা নয়, বাস্তব জীবন থেকে তুলে আনা ছবি অধ্যয়নে অভিজ্ঞতায় চিরায়ত শিল্পরূপ পেয়েছে তাঁর রচনায়।

দেশজ সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণাধর্মী অনেক রচনা তিনি লিখে গেছেন। অপ্রকাশিত পল্লীগীতি পুতুল বিয়ের ছড়া, উপাখ্যানমূলকসঙ্গীত, পল্লী সঙ্গীতে পালাগান, ভাইফোঁটার গান, মাঘমন্ডল ব্রতের কথা, বরজের গান অনেক কিছু তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। রাঙামাটি,

শাদা হাওয়া উপনাস বেরিয়েছিল চতুষ্কোণ এবং সোনার তরী শারদীয়া পত্রিকায়। দলবেঁধে (গল্পগ্রন্থ) নাটকীয় কাহিনী (রম্য রচনা) ছোটগল্প সপ্তর্ণিকা, স্পর্শ দোষ ছাড়াও আরো বহু রচনা রয়েছে তাঁর।

অনেক প্রসিদ্ধ জগৎ বিখ্যাত লেখকের মত অদ্বৈত মল্লবর্মণও বেঁচে থাকতে সঠিক মূল্য পান নি। এটাই পৃথিবীতে হয়ে থাকে। কোন কিছুকে সঠিক বীক্ষণের জন্য তাকে একটু দূরে রাখতে হয় তবেই তার পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়। আমরাও আজ তাঁকে সেভাবেই দেখছি। রচনা অনেক রয়েছে থাকবে তবে একটি জীবন্ত জলধারা যেন জীবনেরই প্রতিচ্ছবি যাকে নির্ভর করে শ্বাসেপ্রশ্বাসে বেঁচে আছে বহু জীবনসংগ্রামী হতদরিদ্র মানবগোষ্ঠী সেই অত্যাশ্চর্য নদী 'তিতাস'কে নিয়ে এমন এপিক পরিকল্পনায় রোমান্টিক শিল্প নৈপুণ্যে, জীবন্ত রক্তমাংসে, কঠিন রূঢ় বাস্তবে অথচ অসাধারণ মমতায় তিনি রচনা করে গেছেন এক অপরূপ জীবনগাথা কাব্য ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম' সে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বয়ে চলবে আবহমান কাল। এর আর ক্ষয় নেই লয়, নেই।

'দুই নদী' নামে লেখা প্রথম রচনাটিকে আরো বৃহৎ উপন্যাসের রূপ দিয়ে পাণ্ডুলিপি তিনি মৃত্যুর আগে প্রেসে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন কিন্তু মৃত্যুর (১৯৫১) আগে তাঁর বইটি প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫৬ সালে বইটি প্রকাশ পেলে পাঠকসমাজ বিষ্ময়ে চমকে ওঠে . আর্নেষ্টি হেমিংওয়ের বিখ্যাত ছোটগল্প 'দি ওল্ড ম্যান এন্ড দি সী-র মত মানুষের বাঁচার সংগ্রাম মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় অপূর্ব গৌরবে চিত্রায়িত হয়েছে 'তিতাস একটি নদীর নাম' এ।

আমাদের বুকে আরো ধোঁকা লাগে দেশে যখন আমাদের মনে পড়ে, চোখে ফুটে উঠে তিতাসের সেই জল ছলছল হৃদয় মাতানো ছবি। তার বুকে বয়ে যাওয়া নৌকো, মাঝিদের ভাটিয়ালী সুর, মাছ ধরা মাছ তোলা। সেই স্মৃতি সাধারণ থেকে অসাধারণত্বে পৌঁছে যায় যখন তার সঙ্গে এই গ্রন্থপাঠে যোগ হয় একে কেন্দ্র করে আবর্তিত দুঃখ বেদনার অর্থনৈতিক জগৎ, জেলে মাল্লাদের জীবনের বঞ্চনা, বেদনা আবার তিতাসকে নির্ভর করেই নতুনভাবে তাদের বেঁচে ওঠার আশা আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন।

মনে পড়ে তিতাসের বুকে নৌকাদৌড় দেখতে গিয়ে বাল্যকালের শোনা সারি গানের সেই মনমাতানো সুর। কিন্তু তখন আমরা জল দেখেছি, নৌকা দেখেছি, নৌকা বাইচ দেখেছি, মাঝি মাল্লা, আশে পাশের জেলে নৌকা, জেলে দেখেছি কিন্তু জেলে জীবনকে দেখিনি। এই জীবনের মর্মকথাকে আনুপূর্বিক বিচিত্র বর্ণনায় সমস্ত বিশ্বের নদীমাতৃক জেলে জীবনকে মহাকাব্য উপাখ্যান করে যিনি তুলতে পেরেছেন তার সঠিক মূল্যায়নও সময়ে হয়নি তবু দেরীতে হলেও আমরা যেন সত্য অর্থে এই স্রষ্টাকে হৃদয়ঙ্গম করে পারি, বুঝে নিতে পারি সেই হোক আমাদের সার্থক প্রয়াস। অদ্বৈত মল্লবর্মণকে চেনা জানার চর্চা হোক প্রতি ঘরে ঘরে।

এক প্রতিবাদী মহাত্মার যুদ্ধাভিযান

কথায় বলে জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো। জন্মের পরিচয়ে আমরা মানুষ সবাই সমান। কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবাই সমান রাঙা — গঠনতন্ত্রে সবাই একই সংস্থাপনায় বেঁচে আছি। পার্থক্য শুধু চিন্তা চেতনার মস্তিষ্কের ক্ষমতায়। কিন্তু আজও মানুষের সমাজ সর্বত্র একথা মেনে নিতে চাইছে না। অযৌক্তিক ভেদাভেদে মানুষকে প্রতি পদে অপমানিত করে মানবতা বিরোধী ব্যবস্থাপনাকে কোথাও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কোথাও গায়ের জোরে টিকিয়ে রাখছে। এটা অন্যায় আর এরই বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী মহান আত্মা গর্জে ওঠে — যেমন উঠেছিলেন দাক্ষিণাত্যের এক এক যুক্তিবাদী পুরুষ। মানুষ তাঁকে অভিধা দিয়েছিল "মহাত্মা"। সত্যি তিনি এক মহান আত্মা নিয়ে জন্মেছিলেন অব্রাহ্মণ প্রগতির পরিপন্থী স্বচ্ছল পরিবারে। আত্মকেন্দ্রিক জীবনে সন্তুষ্ট জীবন কাটাতে পারতেন তিনি। কিন্তু তিনি তা করেন নি। নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ বন্ধুরা স্কুলে যাওযাব অনুমতি পায় নি বলে তিনি নিজেও দারুণ বেদনায় স্কুল ছেড়েছিলেন ছোট বয়সে। জন্মেছিলেন ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর বর্তমান চেন্নাইয়ের এরোড় শহরে।

সেই শতবর্ষ আগে, ব্রাহ্মণ্যবাদী কঠোর নিয়মকানুনের কাঠিন্যে শ্বাসরুদ্ধ দলিত নিম্নবর্ণের ৭০ শতাংশ মানুষের জীবনে ছিল এক অপমান অমানিশার কাহিনী। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরাই ছিলেন সমাজের শাসনকর্তা সর্বসুখভোগী। দলিত মানুষের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফসলে উথলে উঠতো তাদের সম্পদ অথচ তাদের প্রতি ব্যবহার করা হতো কুকুর বেড়ালের চেয়েও ঘৃণার সঙ্গে। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ঘুরতো, কোথাও যাতে রাস্তায় উচ্চবর্ণের পথিকদের উপর তাদের ছায়াও না পড়ে। মন্দিরে ঢোকা দূরে থাক মন্দিরের রাস্তায় ও তারা হাঁটতে পারতো না।

পেরিয়ার ই. ভি রামস্বামী সেই প্রতিবাদী যুবক যিনি এ প্রথাকে সর্বশক্তিতে ভাঙতে নেমেছিলেন সংগ্রামের পথে। স্কুলঘরটা ছিল তাঁর প্রথম প্রতিবাদ। তারপর তিনি একে একে জাতপাতের সুব্যবস্থা এবং ধর্মীয় শাসন অমান্য করতে ১৯০২ সালে বিভিন্ন বর্ণও গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। বিধবা বিয়ে চালু করতে গিয়ে নিজের বিধবা ভাগ্নীকে বিয়ে দিয়েছেন। উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণের মানুষকে এক পংক্তিতে খাওয়ারায়

দৃষ্টান্ত রেখেছেন। এসব তো সামান্য কথা। মানুষের দুর্গতির গোড়ার শত্রু বেদ উপনিষদ রামায়ণ জনসাধারণের সামনে পুড়িয়ে ফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তিনি নিরিশ্বরবাদী ছিলেন। মানুষকে ঠকাবার জন্যই মানুষ সৃষ্টি করেছে ঈশ্বরকে, শাস্ত্রকে। এটাই তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রচারও করেছেন। একদিকে জ্বলন্ত প্রতিবাদ অন্যদিকে বুকভরা ভালবাসা নিয়ে তিনি এগিয়েছেন -- ১৯০৭ খ্রীঃ মহামারী প্লেগে নিম্নবর্ণের মানুষেরা যখন চিকিৎসা বা সেবা পাচ্ছিল না -- তখন তিনিই সেবাকাজে এগিয়ে গেছেন।

এজন্য কি তিনি শাস্তি, বিরোধিতা, নির্যাতন পান নি? নিশ্চয়ই পেয়েছেন। বারেবারে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে অপমানিত হতে হয়েছে। কিন্তু এজন্য তাঁর যাত্রা থেমে থাকে নি। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হন। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে দীর্ঘদিনের বঞ্চিত শোষিত পিছিয়ে পড়া নীচু জাতির জন্য তিনি চাকরিতে চাকরি সংরক্ষণের দাবী রাখেন তিনি কারণ সমগ্র জনসংখ্যার ৩ শতাংশ ব্রাহ্মণরাই সেদিন ৭০ শতাংশ রেখে দখল করেছিলেন। বহু তর্ক বিতর্ক, বিধানসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেও ব্রাহ্মণ লবির জন্য এটা পাশ হতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা হাবার ভয়ে অব্রাহ্মণদের জন্য কিছু সুযোগ দিতে রাজ্য সম্মত হলেন। এটাও আরেক জয় রাম-স্বামীর। ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রকে তিনি যা তা বলে যেখানে সেখানে হেনস্থা করেছিলেন -- এই আন্দোলনের তীব্রতা দেখে মহাত্মা গান্ধী ছুটে এসেছেন দক্ষিণে, আলাপ আলোচনায় সমাধান করতে। কিন্তু রামস্বামী অনড় অটল। ব্রাহ্মণ্যবাদের ধ্বংসই এই হলো মোদ্দা কথা। অনেক হয়েছে আর নয়। এভাবেই অস্পৃশ্যদের পথ চলার দাবী স্বীকৃত হলো -- যা এতদিন মুসলমান, খ্রীষ্টানদের জন্যও উন্মুক্ত ছিলো, শুধু তাদের জন্য নয়। ১৯২৪ এ নেতৃত্ব দেন বিখ্যাত ভাই কাল আন্দোলনের -- যা ছিল হিন্দু মন্দিরের সামনে পথ চলার দাবী। করলেন অস্পৃশ্যতা রোধ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করলেন।

এসব কাজে তাঁর হাতিয়ার ছিল পত্রিকাগুলি। ১৯২৫-এ করলেন 'কুদিযা রামু' -- ১৯২৮ সালে 'রিভোল্ট' এগুলোতে অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষের ব্যথাবেদনা, তাদের দাবীকে তুলে ধরেন তিনি। ১৯২৮ সালে দক্ষিণ রেলওয়ে কর্মচারীদের ধর্মঘট সংঘটিত করে কারা বরণ করলেন তিনি। মানুষকে ছোট পরিবারের বিষয়ে আগ্রহী করতে সেই প্রায় একশো বছর আগে তিনি লিখেছিলেন 'গার্বাচি'। ১৯ ২৩ সালে প্রকাশ করেছিলেন Pugmthariya নামে একটি তামিল সাপ্তাহিক। ১৯২৫ সালেই সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতার জন্য কংগ্রেস ত্যাগ করলেন তিনি। বিস্তৃতভাবে স্বদেশ এবং বিদেশ ভ্রমণকারী এই মহাত্মা নিজেকে গড়েছিলেন বিংশ নয় একবিংশ শতাব্দীর জন্য। তাই আজো তাঁর প্রাসঙ্গিকতা অনিবার্য। ১৯৩৮ সালে জেল জীবনেই তিনি 'জাস্টিস' পার্টির সভাপতি হন এবং এই পার্টিই পরে তাঁর নেতৃত্বে 'দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগম' সংক্ষেপে ডি. এম. কে দল হিসাবে রাজনীতিতে নামে। ১৯৪৭ সালকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য

অভিনন্দিত করলেন না তিনি। একে দুঃখের দিন বললেন।

গান্ধীর মৃত্যুর পর আহত রামস্বামী প্রস্তাব রেখেছিলেন ভারতবর্ষ হোক 'গান্ধীনাড়ু' হিন্দুধর্ম হোক্ গান্ধীধর্ম, ১৯৪৮ সালকে বলা হোক 'গান্ধীবর্ষ'। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অকপট গাঢ় ভক্তির এটাই প্রমাণ।

১৯৪২ সালে ভারতের গভর্ণর জেনারেল রাজা গোপালাচারী চেন্নাই সফরে এলে রামস্বামী তাঁকে কালো পতাকা দেখান। সবখানেই প্রতিবাদ — ১৯৫০ সালে তারা 'Goldren Treatise' বইটির জন্য তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৫১ সালে হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ১৫ (১)ধারা অনুসারে অব্রাহ্মণদের সংরক্ষণের ব্যাপারে বাঁধাদান করেন। পেরিয়ার দমে যান নি। তিনি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুললেন — ফলস্বরপ সংবিধান হল সংশোধিত। ১৫(৪) ধারা করে অব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষণ প্রথা চালু হলো। সুদীর্ঘকালের বঞ্চিত নিম্নবর্ণের দলিতদের আরেক ধাপ জয় ঘোষিত হলো।

তিনি প্রথম দিকে (১৯০৪) নিজের শহর ছেড়ে শান্তি, সত্যের জন্য অনেক দেশ ঘুরেছেন। কিন্তু ধর্ম বা ভগবান তাঁকে শান্তি দেয় নি। শান্তি পেয়েছেন মানবতার সংগ্রামে। তিনি অনুভব করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন ভগবান সৃষ্টি করেছে মূর্খরা যারা ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচারক উভয়ই এবং পূজক হচ্ছে বর্বর অসভ্য।

তাই তিনি ১৯৫৩ সালে প্রকাশ্যে গণপতির মূর্তি ভাঙেন এবং প্রমাণ করেন এতে কিছু অনিষ্ট হয় নি। রামের কুশপুত্তলিকা দাহ করে ১৯৫৫ সালে কবেন কারাববণ। কি দুঃসাহী পদক্ষেপ সেই কঠিন ব্রাহ্মণ্য যুগে! নন্দিত হয়েছেন তিনি ১৯৫৭ সালে রৌপ্য মুদ্রায় পেরিয়ারের ছবি দেয়া হয়েছিল মাদ্রাজ রাজ্য। ১৯৫৭ সালে সারা তামিলনাড়ুতে রামায়ণ পুড়িয়ে ফেলা হয়। হিন্দী বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দাক্ষিণাত্যে — এ প্রতিবাদ আর্য এবং ব্রাহ্মণ্য বিরোধী প্রতিবাদ। ১৯৬৯ সালে পেরিয়ার আবার জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং মন্দিরে ঢোকার জন্য আন্দোলন করেন। ১৯৭০ সালে তাঁব প্রচেষ্টার ফসল ফলেই হয়তো হলো যুক্তিবাদী সমিতি। ভারতে ব্রিটিশ অত্যাচারের চাইতে নিন্দনীয় এবং জঘন্য ছিল স্বাধীন ভারতের এইসব জাতপাত ব্যবস্থা এবং ব্রাহ্মণ্য শাসন। ১৯৭৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রাষ্ট্রসংঘের ইউনেস্কো রামস্বামীকে ঘোষণা দিয়েছেন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সক্রেটিস বলে। তাঁর Self Respect Movement এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগম দল পরিচালনার জন্য যে শীল্ড তাঁকে দেয়া হয় তাতে তাঁকে ভবিষৎ নিয়ন্তা মহাপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আজ পেরিয়ার আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তিনি যে চেতনা এবং সাম্যের আলো জ্বেলে গেছেন আমাদের জন্যে, যে মন্ত্রবাণী রেখে গেছেন আমাদের কানে, তা অসাম্য ধ্বংসের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। পেরিয়ার মনে রেখে; পেরিয়ারকে বুকে নিয়ে শুরু হোক আমাদের দলিত জনগণের অবশ্যম্ভাবী শুভযাত্রা।

প্রতিবাদী নারী

আমি তসলিমা নাসরিনের গদ্য লেখা পড়িনি, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ এর আগে পর্যন্ত নয়। কারণ কর্মস্থলে এবং বাইরে প্রতিদিন একাধিক মিটিং সেমিনার, অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্বলিত আয়ুক্ষয়কারী জীবিকা এবং অন্যদিকে জীবনহরণকারী মারাত্মক রোগের যুদ্ধ ঘোষণা সামলে এবং এরই সঙ্গে মশারী তোলা থেকে ফেলার ফাঁকে পার্ট টাইম গৃহলক্ষ্মীর পার্ট ঠিক রেখে —দৈনিক পত্রিকাগুলোর সংবাদাঘাত এবং লোড শেডিংয়ের চক্রান্ত ভেদ করে ঠিকঠাকভাবে মনোমত পড়ার সুযোগ গত কয়েক বছরে পেয়ে উঠিনি। অরুন্ধতী রায়কে ধন্যবাদ ১৫ই সেপ্টেম্বর তার কাছ থেকে নির্বাচিত কলাম এবং লজ্জা বইটি এনে পড়লাম। তসলিমা নাসরীন মেয়েটি কেমন জানাব জন্য আবো একবছব আগে থেকে মাদ্রাজ রোগশয্যায় উন্মুখ হয়েছিলাম। মেয়ে সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তার মরা গাঙে বান ডাকিয়েছে যে মেয়েটি তাবৎ পুরুষ সমাজকে উত্তক্ত, বিবক্ত করে প্রায় শত্রুতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে মেয়েটি সে তো মনোযোগ আকর্ষণ করবেই।

পড়লাম — দেখলাম বক্তব্য বস্তুর সাবলীলতায়, স্পষ্ট উদ্দেশ্য বিধেয় নিয়ে নির্ভীক উচ্চারণে নাসবীন যা বলতে চেয়েছেন তাই বলেছেন। আর তাতেই ঝড় উঠেছে কারণ তিনি এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার নারী যেখানে এই রকম ব্যাপার অস্বাভাবিক এবং অকল্পনীয়। মৌলবাদ জর্জরিত মুসলিম সমাজের মেয়ে বলেই এই দুঃসাহসিক কথাবার্তা প্রতিবাদ এত আলোড়ন তুলেছে, অন্য কোন সমাজের হলে তা হতো না। সমালোচনা কিছু হলেও এতটা গুরুত্ব দিয়ে তাকে বৃথা সম্মানিত করা হতো না।

তবে মেয়েটিও ফ্যালনা নয়। একটি মেয়ে তার পরিচয বহু — তসলিমা কবি, তসলিমা সাংবাদিক তসলিমা গদ্যকার — তসলিমা পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নারী— তসলিমা চিকিৎসক — তসলিমা চিকিৎসকের কন্যা — প্রতিটি পরিচয় তার ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে এসব বাহ্যিক পরিচয়কে ছাপিয়ে তার আসল পরিচয় তিনি একজন পুরোপুরি মানুষ। মুক্ত উদার যুক্তিবাদী মনের পরিপূর্ণ মানবতাবাদী পূর্ণাঙ্গ মানুষ। আধুনিক। যিনি বর্তমানের আধুনিক নন ভাবীকালের আধুনিক 'what it is' 'what it should be' যাকে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন না 'একবিংশ শতাব্দীর মানুষ ভুল

করে বিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন।' তসলিমার যে কোন একটি পরিচয়কে নির্ভর করে বহু নারী খন্ডিত জীবনে অসার্থক বসবাস করছেন। সে জীবনে তাদের বিকাশ প্রকাশ ব্যহত— ব্যক্তিত্ব খন্ডিত মনুষ্যত্ব অপমানিত। অনেকে তা জানেন কেবল ব্যথা অপমানে ভোগেন। অনেকে এ বিষয়ে সচেতনতার আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে পান না। এদের সবার জন্যই তিনি কলম ধরেছেন খুব শক্ত হাতে নিঃসঙ্কোচে।

আর একারণেই সমস্ত মৌলবাদী অচলায়তন সমাজ আলোড়িত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য সফল। এখানেই তার সার্থকতা।

এসব বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক কিছু বলতে চেয়েছি বলেছি লিখেছি, বিশেষত ১৯৭৫ সাল আন্তর্জাতিক মহিলা বৎসর থেকে। সে সব ছিল আবেদন নিবেদন সামাজিক ঔচিত্য সম্পর্কে আদর্শ কিছু বক্তব্য, রামপ্রসাদী কীর্তন বা রান্দ্রিকি ভদ্র মিষ্টি সুর যা দিয়ে অপর পক্ষের মনপ্রাণ কানকে স্পর্শ করার দুরূহ চেষ্টায় লিপ্ত ছিলাম আমরা। তবে কাজ হয়নি তা বলা ঠিক নয়। সাক্ষরতা থেকে স্বাস্থ্যবিধি, চাকরি বাকরি আইনকানুন থেকে পরিবার পরিকল্পনা সকল ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ফাঁসী বা মাথার দাম কেউ চায়নি সত্য কিন্তু পদে পদে খোঁচাখুঁচি হেনস্থা নাজেহাল করার চেষ্টা হয়েছে। যাক্ সেকথায় পরে আসছি।

গুরুতর প্রতিক্রিয়া ঘটেনি কারণ, হয়তো আমাদের বক্তব্যে বক্তব্য বিষয়কে যথাসাধ্য সুরুচি সম্মতভাবে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের করে পরিবেশিত করা হয়েছে। লিখতে চেয়েছি প্রাণ ভরে কিন্তু কলমকে ছুটি দিয়ে নয় ছোট করে। তাই সে লেখায় জোর আসেনি নয়তো আমরাও মিটিং এ সেমিনারে যখন পেপার তৈরী করেছি পড়েছি, এসবই বলেছি — অশিক্ষা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, পর্দা প্রথা, সতীদাহ প্রথা, সমাজে স্ত্রী পুরুষের জন্য Double staderd down পৃথক মানদন্ড, শাস্ত্রকার, সমাজপতিদের একদেশদর্শী চক্রান্তকারী ঘোষণাগুলির কথা।

আমরা স্বীকার করেছি যে আমাদের ভাষাভঙ্গি ছিল নেহাতই মৃদু তাতে যতই শ্লেষ বা খোঁচা থাকুক তা কখনোই প্রচলিত রীতিনীতির সীমানা ছাড়িয়ে যায়নি। সমাজে মেয়েদের অবনমন, তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য, অসম্মান, শিক্ষাদীক্ষায় কম সুযোগ, ছেলেতে মেয়েতে পার্থক্য বোধ, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে ছেলেদের উপযুক্ত মাত্রায় এগিয়ে এসে হীনস্বাস্থ্য অধিক পরিশ্রমী মেয়েদেরই এগিয়ে আসাতে বাধ্য করা এসব বিষয়ে আমাদের লেখার তখন অনেকেই বিরূপ সমালোচনা করেছেন।

তসলিমা নাসরীনও এসব বিষয় নিয়েই লিখেছেন তবে তাঁর লক্ষ্য এবং দাবী সামগ্রিক নারী মুক্তি এবং সম মর্যাদা। আমাদের আন্দোলনের বক্তব্য এবং চেষ্টা অনুযায়ী খন্ডাংশ ও ভগ্নাংশ নারীর উন্নতি নয়। এ যেন চন্ডীদাসের উক্তির মত, 'শুনহে মানুষ ভাই সবার

উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' গোছের। নারীও যে মানুষই, তারও যে সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা আছে এটাই তসলিমার ঘোষণা এবং তাকে সুখে দুঃখে পাপে পুণ্যে উত্থানে পতনে আস্ত মানুষ বলে প্রতিষ্ঠিত করাই তার জেদ এবং জেহাদ। আর এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে অনড় কঠিন ব্যক্তিত্বে নিজেকে স্থির রাখার জন্যই এমন কুসুম কোমল স্বপ্নমুখী আদুরে লাবণ্য ভরা আপাদমস্তক রোমান্টিক কবি 'অমল বালিকা' টিকে স্পষ্ট সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য বেছে নিতে হল ক্ষুরধার পথ ক্রোধ আর তথাকথিত অশ্লীলতার মাধ্যম। এর দরকার ছিল। গ্রাম্য কথায় বলতে হয় 'ঘোড়া মুখো দেবতার মাসকলাই নৈবেদ্য।' এ না হলে উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। এ কাজ সহজ ব্যাপার নয়।

মুসলিম সমাজে নারীর জন্য একটি বিরাট অনধিকার — বাইরের জগতে মেশার অধিকারের অভাব। যদিও নীতিগতভাবে পুঁথিতে পুস্তকে রয়েছে নিজস্ব অর্থ, নিজস্ব গৃহ, বিবাহের বন্ধন ও মুক্তির স্বাধীনতা -- কোরাণ শরীফে আছে পুত্রকন্যার সমান আর্থিক, সামাজিক ব্যক্তি জীবনের অধিকার কিন্তু তারই পাশাপাশি রয়েছে নারীরা কঠিন অবরোধের নিয়ম বন্ধনে বাঁধা। মেয়েদের নিজের জীবনের ও কর্মের স্বাধীনতা নেই। আসলে বাস্তবে নারীর জীবন বন্দীর জীবন। এজন্য তার কবিতায় আসে 'গোল্লাছুটের' কথা। সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠার কথা। তার শিকড়ে থাকে বিপুল ক্ষুধা কারণ তিনি 'আমিও মানুষ বটে/ সামাজিক যাতাকলে পিষ্ট হওয়া নারী নামধারী শুধু/ দ্বিপদ চিড়িয়া নই আমিও মানুষ। 'তার যন্ত্রণা তিনি নিজের মধ্যেই এক দুধরাজ সর্প কবিকে পেয়েছেন যে পোষ মানা কুকুর নয়, ধূর্ত আপোষী শেয়াল নয়, প্রতিটি আঘাতেই প্রত্যাঘাত মুখের ছোবল তুলে খাদ্য পেলেও ঘুমোয় না কারণ --- 'কবি কি ঘুমায় কখনও?'

এখানে তসলিমা অনন্যা। তাই তিনি জানেন কিভাবে টেনে ছিঁড়ে মুখোশ থেকে মুখ বার করতে হয়। কারণ ভালবাসার ভাষার মতন অপমানের ভাষাও তার চমৎকার। কারণ তিনি বলেন 'কিছুটা উপরে উঠো না হলে মানাবে কেন? — আমি তো না চাইতেই ছুঁতে পারি/ আমার যে কোন ক্রীতদাস/ এত নীচে থাকে তারা, হাত কেন/ পায়ের আঙ্গুলেই চমৎকার ছোঁয়া যায় নশ্বর শরীর, পুরুষ বিদ্বেষী বলে তার বদনাম, লজ্জাহীনতার জন্য অশ্লীলতার জন্য তার বদনাম, অপ্রেমের জন্য বদনাম। কিন্তু তিনি পুরুষ বিদ্বেষী নন। তিনি প্রেমের জন্য প্রেমিকের জন্য সব বিকিয়ে ভিখিরী হয়েই বসে আছেন। সেই প্রেমিক পৃথিবীতে কই? পুরুষের চাতুর্য, লাম্পট্য, একরোখা শাসন শোষণের চক্রান্তকেই তার ঘৃণা প্রতারণাতেই তাঁর আপত্তি। প্রেমিকের জন্য তার ঘোষণা নক্ষত্র ছোঁবার মত করে আকাশে তোমাকে ছোঁবো/ সারারাত পূর্ণিমার জলে ভিজে ভিজে/ তোমাকে স্পর্শের জন্য পাড়ি দেবো আমার জীবন।'

তবে তাঁর অপরাধ কি? কেন আজ তাঁর জীবন বিপন্ন, মাথার দাম কেন ঘোষণা হয়, কেন ওঠে ফাঁসীর দাবী? কারণ তিনি পুরুষ সমাজের ভণ্ডামীকে সামগ্রিকভাবে আঘাত

করেছেন প্রতিবাদী নারী হয়ে — রোগকে ধরে ফেলেছেন চিকিৎসকের চোখ দিয়ে তাই তিনি শ্রীপুরুষের দেহাংশকে বিনা দ্বিধায় অবিচলিত চিত্তে উচ্চারণ করতে পারেন চিকিৎসকেরই মতো, মনস্তাত্ত্বিকের মতো, বৈজ্ঞানিকের মতো। তিনি পুরুষ বিদ্বেষী সিনিক নন, প্রেমিকা। তাই নিজের হাতে সিরিঞ্জ ধরে প্রেমিকের যৌন রোগের চিকিৎসা করে তাকে জীবনে সত্যে প্রেমে প্রতিষ্ঠিত করতে চান কিন্তু পারেন না নিষ্ঠাহীনতাকে নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে। স্বামী কথা দিয়েও গণিকালয়ে পুনর্বার গেলে ব্যথা পান, তার চেয়েও ব্যথা পান স্ত্রী হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে তাঁর স্বাধীনতায় স্বামী আঘাত করতে চাইলে। এইখানে তিনি আপোষে রাজী নন কারণ তিনি পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

আর মানুষ বলেই তিনি দায়বদ্ধ কবি। তাঁর এই দায়বদ্ধতা মানুষের কাছে, বিশেষত প্রাথমিকভাবে নারীদের কাছে। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি তাদের লেখা দিয়ে জাগাতে চান। এ কাজ সত্যি বড় কঠিন কারণ ঘুমন্তদের ঘুম ভাঙানো বরং সহজ কিন্তু জেগে যারা ভয়ে ঘুমিয়ে আছে মৃতপ্রায় তাদের ভয় ভাঙানো কঠিন। আর একাজ করতে গিয়েই তসলিমা আজ বিপন্ন, তসলিমা আজ মহান।

অবশ্য এ বিষয়ে বহুদিন আগে থেকে বহু গুণী ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী নানাভাবে এইসব সামাজিক বৈষম্য বঞ্চনার বিরুদ্ধে রোষ ক্ষোভ জানিয়ে যাচ্ছেন। এঁরা বলেছেন লিখেছেন চেষ্টা করেছেন সমাজকে নাড়াচাড়া দিয়ে শোধরানোর জন্য। তবু সামান্য দাবী দাওয়া আদায় করা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মানুষের মর্যাদা তাঁরাও আদায় করতে পারেন নি। তাই ভোটাধিকার, সম্পত্তিতে অধিকার (যদিও সব সময় সব নারী পায় না), চাকরীতে অধিকারই পাওয়া গেছে কিন্তু ধর্ষণ, পণ, নারী হরণ পতিতালয়ে প্রেরণ কিছুই বন্ধ করা যায়নি। উপায়গুলিতে অনেক চাতুর্য এসে গেছে। তসলিমা নাসরীনের জন্য মুসলিম মৌলবাদী সমাজ আজ ক্ষিপ্ত হয়ে আছে কারণ এমন অবদমিত, শতকরা একশ ভাগ নিয়ন্ত্রিত এক নারী সমাজের নিষ্কম্প সরোবরে তিনি যে একটি চমৎকার ঢিল মেরেছেন, পাটকেল না খেয়ে বদলে উপায় আছে?

এ ব্যাপারে হিন্দু সমাজের সহনশীলতা অনেক বেশী। এসবে প্রতিক্রিয়া তাদের খুব কম। একাদশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যের খোরাসান প্রদেশ থেকে নির্বাসিত আলবেরুণীর কথা এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতে অন্তরীণ অবস্থায় সুদীর্ঘকাল কাটানোর সময় তিনি মধ্য বয়সে সংস্কৃত শিখে বেদ পুরাণ শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো গুণ তাদের পরমত সহিষ্ণুতা এবং সবচেয়ে বড়ো দোষ পরলোক তত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়ায় ঐহিক উন্নতিতে যত্নবান না হওয়া।'

কালপ্রবাহে দ্বিতীয় উক্তির দোষটি বোধ হয় আমরা কাটিয়ে উঠেছি কিন্তু প্রথম গুণটি আমাদের উপর একটু সর্বগুণাত্মক হয়েই চেপে বসে আছে। তাই একশো বছর আগে জন্মানো (১৮৯৩) সাহিত্যিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী যখন বাহাত্তর বছর আগে তার 'নারীর কথা' প্রবন্ধে যেটি ১৩২৮ সালের আষাঢ় মাসের, ভারতবর্ষতে বেরোয়, তাতে রামপ্রসাদ

থেকে তুলসীদাস হয়ে শ্রী রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দ সবাইকে বেশ শক্ত কথায় শ্লেষ করে দুঃখ করে নারী সম্বন্ধে অনুচিত মন্তব্যের জন্য অভিযোগ করেও, কারো এমন কোপে পড়েন নি। কেউ বলেন নি তাঁর মাথা চাই বা তাঁর ফাঁসী হোক। কারণ হিন্দুর চামড়া খুব শক্ত পুরু চামড়া। হাজার বছর ধরে নানা ন্যায়বাদী যুক্তিতর্কের চর্চায় মোটা হয়ে গেছে। চট করে তাতে ক্ষত সৃষ্টি হয় না।

তসলিমার গভীর অর্ন্তদৃষ্টি কবিজনোচিত সত্য প্রেমের অনুভূতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকের সূক্ষ্মতায় নারীর প্রতি সামাজিক পুরুষের বিচার ভঙ্গীর মধ্যে, ব্যবহার বিধির মধ্যে পুরুষের ভোগ লালসাকে আবিষ্কার করেছে। তাৎক্ষণিক প্রেমের মধ্যে গভীর মানবিকতার অভাবকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

জ্যোতির্ময়ী দেবীও তাঁর 'নারীব কথা' প্রবন্ধে রামপ্রসাদের লেখা দুটি লাইন 'রমণী মুখেতে সুধা সুখে সুধা নয় সে বিয়ের বাটি/ ইচ্ছা পান করে বিয়ের জ্বালায় ছটফটি' দিয়ে শুরু করেছেন। ধরিত্রীর মতো সহনশীলা, নিজেদের প্রাপ্য অধিকার বঞ্চিতা, অভাব অভিযোগ লাঞ্ছনা সম্বন্ধে নীরব, স্বামীপুত্রেব ভয়ে সঙ্কোচপরায়ণা সেই মৃত জাতকে কেন এরকম অপমানজনকভাবে খড়গঘাত কবা হয়েছে তিনি খেদ সহকারে অভিযোগ করেছেন। বলেছেন এই শ্লেষ কাকে কবা হয়েছে, নিবীহ স্নেহশীলা কুণ্ঠা লজ্জা সবম সঙ্কুচিতা আমাদের জননী সহধর্মিনী কন্যাদের।

রচয়িতা রামপ্রসাদ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'গানটি যার রচিত তাকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি কিন্তু তবু মুখে আসে ভগবান এমন বন্ধুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো'। ভাবা যায় সেদিনের যুগে এক ভক্ত কবি সম্পর্কে হিন্দু মেযেব এমন কথা! রামকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখেছেন 'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবেব উপদেশে কামিনী কাঞ্চন শব্দটির অনাবশ্যক প্রাদুর্ভাব অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন। নব্যবঙ্গের পূজ্য ভক্তিভাজন বিবেকানন্দের উপদেশে এই মূল্যবান উপদেশটির অভাব নেই। এইসব দেখলে স্বতঃই মনে আসে তাহলে কি আমাদের দেশে জ্ঞানী সাধকদের কাছে তাদের মাতা কন্যা ভগিনীরা পিশাচী স্বৈরিনী। তাদের মধ্যে মাতৃত্ব নারীত্ব বোধ নেই?'

আবার লিখেছেন 'নারীর মহিমা হয়তো শাস্ত্র বুঝতেন তাই তাতে আছে নারীদের পূজা করলে দেবতা সন্তুষ্ট হন আবার মাঝে মধ্যে দেখি নারীত্বের মহিমা এমন ঠুনকো জিনিষ যে বাল্যে পিতার অধীনে যৌবনে স্বামীর অধীনে বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে নারীর থাকতে হবে কদাচ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত নয় — কি ঘৃণার্হ কথা। এ থেকে যে কি প্রকাশ পায় বা আর লিখে তা বলে নিজেকে কলঙ্কিত করতে ইচ্ছে হয় না।'

তুলসীদাসের দোঁহা 'দিনকো মোহিনী, রাত কো বাঘিনী পলক পলক লহু চোষে/দুনিয়া সব পউয়া হোক / ঘর ঘর বাঘিনী পোষে' — লাইনগুলিতে তিনি অপমানি, ব্যথিত

হয়েছেন। লিখেছেন 'যারা মার বুকে মানুষ, বোনের কোলে শৈশব কাটিয়েছে, সন্তানের জননী স্ত্রীকে, ঘরের গৃহিনী স্ত্রীকে দেখেছেন তাদের মুখে এমন কথা আসে? আমার তো ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাদের মহিমা উপলব্ধি হয় না। সবচেয়ে বড়ো ত্যাগ কামিনী কাঞ্চন -- তা না হলে সাধক হওয়া যায় না ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করা যায় না — এ বিষয়ে যা তাহলো জীব স্বভাবের দুর্বলতা তাতে শ্রী জাতি পুরুষ জাতি দুইই সমান সহযাত্রী — আর কাঞ্চন তো জড় বস্তু স্ত্রী জাতি তার সঙ্গে এক হয়ে যায় কি করে?'

পাঁজির বিধি নিষেধের তালিকায় 'স্ত্রী তৈল মৎস মাংস সম্ভোগ নিষেধ' বচনটি নিয়েও তিনি অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন 'নারী যেন স্ত্রী নয়, জননী নয় খাদ্যবস্তু। এক কথায় স্ত্রীকে মাছ মাংস তেলের সামিল করে বিধি নিষেধ করা হবে?'

সেকালের যুগে দুঃসাহসী প্রতিবাদের কথা ভাবাও যায় না। সেদিন মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর মহাশয় কাব্যে কঠোর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন 'এ ছদ্ম নামে পুরুষের রচনা। মেয়েরা এরকম লিখতে পারেন না' সেদিন তার লেখায় শ্লেষাত্মক শব্দ 'পতিদেবতা' ও পুরুষ সমাজকে রাগিয়ে দিয়েছিল। আরো দুচার জন তার এসব লেখার প্রতিবাদ করেন, তিনিও জবাব দেন। কামিনী কাঞ্চন নিয়ে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মতবাদের বিরোধিতাও তাকে মোকাবেলা করতে হয়।

অবশ্য হিন্দুসমাজ জানে যে মানুষের দেহের মারটাই বড়ো মার নয়। হাত তুলে মারলে সেটা নেহাৎ অর্বাচীনতা হয় স্থূল দেখায়। তার চেয়ে মনের মারটা বরং অনেক সূক্ষ্ম এবং কার্যকরী হয়। কাউকে বেত মারলে সে ভুলে যায় কিন্তু কাউকে মাথায় গাধার টুপী পড়ালে সে অপমান তোলে না। তাই ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে নিজের হাতে গাড়ি চালিয়ে খুব উৎসাহ ভরে মিছিল মিটিং সভা সমিতি লেখালেখি করতে গিয়ে স্থানীয় এক কবির দ্বারা আক্রান্ত হলাম। তিনি শ্লেষ ভরে নানা কথা লিখলেন যেমন, হলুদ গাড়ির ভিতর ছুটে চলেছে আমাদের আসল পিসিমা টেলিপ্রিন্টারে খবরের কাগজে একটা নেগেটিভ থেকেই যার অজস্র ভঙ্গিমা খোঁজা হচ্ছে। যিনি মহিলা সমিতি করেন নারী বর্ষে দশ ইঞ্চি বৃষ্টির — মতো জল পায়ের তলায় নিয়ে উঠে আসেন। নিঁভাজ হাতের শরীরে তার ঘাম নেই গন্ধ নেই — রক্ত চলাচল এতো বেশী সূক্ষ্ম শিল্প কাজ? —রাবীন্দ্রিক গানের ভুবনে জলবায়ু যতটুকু নম্র হলে — সুখী থাকা যায় তার সব কিছু ছিল— গ্রামবাংলার ডাকঘর ছুঁয়ে রোজ তার চিঠি ছুটছে --- স্বদেশে বিদেশে কেবল কাজের তাড়া— সংসদ সদস্যের মতো তার চলাফেরা— নামধাম হয়েছে বেশ বিশ্ব সংস্থা থেকে চিঠি আসে, শেষ দু লাইনে লিখলেন —

'স্বাস্থ্য রাখতে নিয়ম নিষ্ঠা

রোজ চাই পথ্য তুল্য বিদেশী পানীয়।'

সোজা কথায় চরিত্র হনন। সেদিন আমাকে মেরে ফেললে এপিসোড শেষ হয়ে যেত কিন্তু চরিত্রের বদনাম দেয়ায় অপমানটা চিরজীবি হয়ে রইলো। এখানেই বোধ হয় সংস্কৃতিবান হিন্দু বুদ্ধিজীবির মারের তফাৎ।

যাক, বহু নারীর আজকে তসলিমাকে দরকার। নিম যে আমাদের উপকারী এটা অবোধ শিশু বোঝে না বুদ্ধিমান বয়স্ক বোঝে। মেয়েরা বয়স্ক হলে সহসাই তসলিমাকে বন্ধু বলে চিনে নেবে। সাধারণ ভাবে পৃথিবীর তাবৎ নারী সমাজই নানা দুর্গতিতে ডুবে আছে। এরমধ্যে মুসলিম মহিলা সমাজের দুর্দশা অবর্ণনীয়। 'তালাক' এর মত সামান্য তিনটি নির্দোষ অক্ষর একত্রে যথেচ্ছ উচ্চারণ করে, মুহূর্তে একটি নিরীহ বুদ্ধিহীনা মুসলিম মেয়ের জীবনে যে বিপর্যয় নিয়ে আসা হয়, তার শুধুমাত্র বাহ্যিক দৃশ্য দেখে অর্ন্তলীন ব্যথা অপমান অসুবিধার কথা সবাই, এমন কি (অনুভূতিহীন) মেয়েরাও বুঝতে পারবেন না।

গরু, ছাগল, ভেড়া পোষার মতো একই গোয়ালে চারটি স্ত্রী পোষার বিধানটিও তাই — মুখ বুজে সাংসারিক পরিশ্রম এবং নিয়মিত দেহদানের পরিবর্তে নিশ্চিত দুবেলা দুমুঠো ভাত ও পরিধেয় বস্ত্রের আশ্বাস এর বেশী কিছু নয়। কোন ব্যাপারে নিজস্ব মতামত নিয়ে মুখ খোলার বিধি নেই।

মুসলিম শরীয়তি বিধানে নারীর জন্য যেসব বিধি বিধান আছে তা সবই আক্ষরিক বৈপরীত্যময়। সবই যেন একধাপ নীচের জীবিত বস্তুকে ভোগবাদী দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয়েছে মানুষ হিসেবে দেখা হয়নি। এখনো সমস্ত পৃথিবীতে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার খুবই কম। এবারও আমি মাদ্রাজে দেখে এসেছি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পরিবারে পরপর কয়েকটি মেয়েকেই স্কুলসীমা পার না করেই সাদী দিয়ে হস্তান্তরিত করে দেয়া হয়েছে। শহরাঞ্চলে শিক্ষিতদের মধ্যে একাধিক বিয়ে ততটা না হলেও গ্রামাঞ্চলে আজো এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

প্রাতঃভ্রমণে বেরোলো একটি সাধারণ দৃশ্য দেখা যায়, ভাটি অভয়নগর অঞ্চল থেকে দলে দলে নানা বয়সী স্ত্রীলোক সকালে বাড়ি বাড়ি ঠিকে কাজ করার জন্য আসছেন। তাদের বেশীর ভাগই অকারণে সামান্য কারণে কখনো 'পুরোন' হওয়ার দরুণ স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা। তিন চারটি বাচ্চা নিয়ে এই সব মেয়েরা যে কি কষ্টকর জীবনযাপন করছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

অবশ্য ভদ্র সমাজের বিবাহিত জীবনেও রয়েছে আরেক ধরণের বঞ্চনা অপমান। একবার উইমেনস কলেজের একটি সেমিনারে উপস্থিত হয়ে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী বলেছিলেন, মুসলিম মেয়েদের অবস্থা আদিবাসী মেয়েদের চাইতেও অনেক খারাপ শোচনীয়। সত্যি তাই, এখনো চাকরি বাকরিতে অন্যান্য প্রতিনিধিত্বে তাদের আমরা কমই দেখতে পাই।

বাংলাদেশে এ অবস্থা আরো শোচনীয়। পত্রিকায় দেখেছিলাম বাংলাদেশে মহিলার সংখ্যা ৫৩৩ মিলিয়ন, মোট জনসংখ্যার ৪৮ ৫ ভাগ। এর মধ্যে ২২.০ মিলিয়ন মহিলা উৎপাদনশীল কাজের সঙ্গে জড়িত। শতকরা ১৬ ভাগ মহিলা শিক্ষিত। ৪০ থেকে ৪৪ বছর বয়সী মহিলাদের ১৭ ভাগ হয় বিধবা নয় তালাক প্রাপ্ত। গ্রামে ১০ থেকে ৬০ জন মহিলা স্বামী পরিত্যক্তা। কম বয়সে বিয়ের জন্য শিশু মৃত্যুর হার বেশী, প্রসবকালীন মৃত্যুও বেশী। এদের প্রায় ১০-১১ বার গর্ভধারণ করতে হয়। তসলিমা এদের জন্যই লিখছেন। লিখছেন নিজের জন্যও বা বলা যায় তাঁর সমগোত্রীয় মেয়েদের জন্য, তাঁদের সচেতনতার জন্য। 'বিয়ে' নামক ইনস্টিটিউশানের মধ্যে যে ফাঁকি আছে শোষণ আছে দুমুখো নীতি আছে সে সম্বন্ধে সচেতনতা জন্মানোর জন্য। আত্ম আবিষ্কারের জন্য, আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য, মনুষ্যত্ববোধের উন্মেষের জন্য।

আর এই এত বড় কাজ করতে গিয়েই তাঁকে বড় ধাক্কা দিতে হয়েছে। 'বিগ্ ব্যাং' না হলে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে না — দ্রোহ জন্মাবে না। মতামত গড়ে উঠবে না। অন্যায়েরও প্রতিকাব হবে না। তাই স্যাকরার টুকটাক নয় কামারেব এক ঘা দিয়েছেন। কাজেই তসলিমাকে ঝড় ঝাপটা তো সইতেই হবে। এর গত্যন্তব নেই।

মানবধর্ম ও আমাদের সাধনা

আদর্শ, সুন্দর, সত্য এবং সাম্যের স্বপ্ন দেখে সংগ্রামী মানুষ আজ এক অন্ধ গলির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে ধর্ম নীতি, মঙ্গল প্রীতি ঔচিত্যবোধ সবই দাঁড়িয়েছে কাঠগড়ায়। অনেকে বলেছেন বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম চলবে না। অথচ আইনস্টাইন বলছেন 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান অচল'। কেননা বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয় সত্যের গভীর আকাঙ্ক্ষা থেকে এবং সেই গভীর আকাঙ্ক্ষার উৎস ধর্ম। তাছাড়া শুধু বিজ্ঞান দিয়ে লোকস্থিতি সম্ভব নয়। ব্যাষ্টি ও সমষ্টি জীবনের কতগুলি মৌলিক ও পরম লক্ষ্য থাকে যেগুলির ধারণা বিজ্ঞান থেকে আসে না অথবা বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠালাভও করতে পারে না। বিজ্ঞানের কাজ 'যেমন হয়ে থাকে'। তা নিয়ে 'কেমন হওয়া ভালো বা উচিত' তার হদিশ বিজ্ঞানের মেলে না। এ কারণেই অ্যাটমের আবিষ্কারকে সৃষ্টি বা ধ্বংস দু'ধরণের কাজেই মানুষ লাগাতে পারে। ধর্ম থেকেই এইসব পরম মূল্যের বোধ ও ধারণা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

আইনস্টাইন লিখেছেন — To make clear these fundamental ends and valuations and to set them fast in the emotional life of the individual seems to me precisely the most important function which religion has to perform in the social life of man *(science and Religion in out of my later years p-22)*

সমস্ত পৃথিবীতে এযুগের চিন্তার রাজনীতি অর্থনীতি প্রাধান্য পেয়েছে। এটা আমাদের ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি ছিল না। আমাদের সভ্যতা এবং দর্শন মূলত অধ্যাত্ম চিন্তাচেতনাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। এ বিষয়ে মোটামুটি আসমুদ্র হিমাচল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভেতরে ভেতরে আপাত নিষ্ঠুর দারিদ্র্য, বঞ্চনা রোগশোকের আড়ালে, এই অধ্যাত্ম চিন্তা চেতনা উচ্চ ভাব ভাবনা নীতিবোধ আদর্শ সহজ সরল জীবন মূলত ভোগ নয়, ত্যাগ। কেননা মানুষ শুধু অন্নময় জীব নয়, শুধু দেহসর্বস্ব নয়। মানুষ মনোময় জীব ও তার দেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তার প্রাণ, তার চিন্তা-চেতনা অন্যের প্রতি প্রীতিবোধ — স্বার্থ শূন্যতায় বিমল আনন্দ — এসব উচ্চ ঐতিহ্যকে আবহমানকাল থেকে জোর দিয়ে ধরে রেখেছে।

কিন্তু আধুনিককালে আত্মার চেয়ে বাইরের বিষয় প্রাধান্য পাওয়ায় গড়ে উঠেছে নতুন অর্থনীতি, শিল্পবিপ্লব এবং সে সূত্রেই মানুষে মানুষে বন্ধন, ধর্মচেতনা এবং সমাজ সম্পর্ককে শিথিল করে দিয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্মের বিকল্প রূপ আজকাল রাষ্ট্র এবং সমাজকে ধরে রাখার জন্য যে সব আইডিওলিজি বা মতবাদ গড়ে উঠেছে এগুলো মুখ্যত্ রাজনীতি এবং অর্থনীতির উপর গড়ে উঠেছে।

আমাদের দেশেও শক্তি বিদেশী জাতির শাসনকালে অর্থনীতি রাজনীতি আমাদের মনকে বড়ো করে অধিকার করেছে। এই চিন্তাধারাব মূল রয়েছে ইউরোপীয় সভ্যতায। ইউরোপীয় সভ্যতা জন্মলগ্ন থেকেই মুখ্যত পলিটিক্যাল। কাবণ সভ্যতার আদি পীঠভূমি গ্রীস সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে নগর রাষ্ট্রে যার নাম polis — এই polis থেকেই পলিটিকস্। কিন্তু পলিটিকস্ ব্যাপারটাই বিরোধমূলক। শাসনক্ষমতাই তার আলোচ্য বিষয়, মানুষকে ধরে রাখার ক্ষমতা তার নেই। এই ধরে রাখার নামই ধর্ম। তাই ভালো জীবনাদর্শের কথা গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তার থাকলেও তা সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত হয়নি এবং সেজন্যই গ্রীস, রোম সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল। যীশুখ্রীষ্টের প্রেমধর্ম তথা মানবধর্ম যাকে খ্রীষ্টানধর্ম বলা হয় — ইউরোপীয় সমাজকে ধরে রেখেছিল হাজাব বছব ধরে কিন্তু সেখানেও ইউবোপীয মানসিকতায় ধর্ম মানবধর্ম অনুসরণ না কবে রাজনীতিব, প্রকৃতি অনুসরণ করলো। মানুষেব ইহকাল পরকাল দু'কালই চলে গেল চার্চের হাতে। যীশুব উপদেশ মতো মানুষ ঈশ্বরকে মনপ্রাণ দিয়ে সর্বান্ত কবণে ভালোবাসতে ভুলে গেল। প্রতিবেশীকেও নিজের মতো ভালোবাসতে পারলো না। চার্চে ঢুকলো রাষ্ট্রীয পাপ, ক্ষমতালিপ্সা তাব সঙ্গে আরো আনুষঙ্গিক অনেক কিছু।

রেঁনেশাসের যুগে গ্রীস রোমক ভাবধারায় পুনরুজীবনের সঙ্গে ইউরোপে এলো আবার নতুন পলিটিকসের ধারা —এ ধারায় ধর্মের অনুশাসন আর রইলো না। পলিটিকস হলো স্বতন্ত্র শাস্ত্র চার্চের শাসনমুক্ত সেক্যুলার। এই সেক্যুলার চিন্তাধারা ইহ সর্বস্ববাদী। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ-এর মূল লক্ষ্য। ফলে তীব্র প্রতিযোগিতা মারামারি বাড়াবাড়ি করে জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার আদর্শে প্রতিবেশীকে ভালবাসার অনুশাসন আর মান্য রইলো না। মানুষের বিকাশে মানবধর্মের প্রকাশে এই বিচ্ছেদ প্রাণঘাতী মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায় হয়ে উঠলো। মানবধর্ম গেল —সমাজ ও ছিন্নভিন্ন হলো। মানুষকে ধরে রাখার জন্য রইলো রাষ্ট্র।

এই রাষ্ট্র - সমাজকে ধরে রাখার জন্য যেসব মতবাদ গড়ে উঠলো তার মধ্যে সর্বজনমান্য মানবধর্ম বিকাশের পোষণকারী কোন শ্রেয়ো নীতি প্রতিষ্ঠা পায় নি। কারণ এই শ্রেয়োনীতির উৎস ধর্ম, যা লোকোত্তর চেতনা থেকে উদ্ভূত।

অন্যদিকে আইডিওলজির উদ্ভব ঐহিক চেতনা থেকে। কাজেই বিরোধী নানা স্বার্থ সংঘাতকে পার হয়ে সর্বস্বের মঙ্গল করা আনুষ্ঠানিক কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও এটা সম্ভব হচ্ছে না যদিও এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই সকলের মঙ্গল

হবে এটাই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু সেটা হলো না। কারণ দেখা যাচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে শোষণ এবং শাসনের যন্ত্র মাত্র হয়ে ওঠে। গণতন্ত্রের আইডিওলজি কতগুলি মহান আদর্শের বুলি ছড়িয়ে এই শাসন এবং শোষণ ব্যবস্থাকেই বৈধতা দান করে শুধু। এমনকি ধর্মকেও ব্যবহার করা হয় শাসকশ্রেণীর স্বার্থে। ধর্মের আফিং খাইয়ে মানুষকে বশীভূত করে রাখার চেষ্টা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় এটা দেখিয়েছেন। 'রক্তকরবী' নাটকে 'গোঁসাই' চরিত্রে এবং 'রাশিয়ার চিঠি'তে তাঁর লেখায় 'যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সেই রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। 'শক্তিশলের চেয়ে ভক্তিশেলের মার আরও মারাত্মক কেননা তার মার আরামের মার। ধর্মকে এভাবে ব্যবসায়িক স্বার্থে বা রাষ্ট্রিক স্বার্থে ব্যবহার করার অর্থ তাকে অশ্রদ্ধার করে তোলা। বস্তুত আধুনিক সেক্যুলার সমাজে আজ শ্রদ্ধার্হ বা পবিত্র কিছু নেই, সবই মাপা হচ্ছে বিষয়ের উপযোগিতা বা মূল্য দিয়ে। এই বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা সরিয়ে শ্রেণীস্বার্থে দ্বন্দ্বের অবসান করে শ্রেণীহীন সমাজে সমান স্বার্থ সাম্যের ভিত্তিতে নতুন সমাজ ভিত্তি গঠন করাব কথা একে একে বহু মনীষি গুণীজন বলেছেন। এর মধ্যে কার্লমার্ক্স প্রধান। এই সমাজকে সার্থক করতে গেলে পারলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে মিথ্যে পরলোকের সুখের আশা বাদ দিলে। মানুষ তার সত্য ধারণাকে ইহলোকেই উপলব্ধি করতে পারবে। এটাই ছিল এই নতুন সমাজের দর্শন। কিন্তু এই ইহ সর্বস্ববাদী শিল্পতান্ত্রিক সভ্যতায় সৃষ্টির আনন্দে মানুষ আত্মবিচ্ছেদ ভুলে কতটা ব্যক্তিসত্তা বা মানবধর্মেব প্রকাশ করতে পারবে সেটাই বিচার্য এবং লক্ষ্যণীয় বিষয় হবে।

পৃথিবীতে নানা ধর্মীয় চিন্তা চেতনার যেসব কথা বলা হয়েছে তার মূল কথা হলো. যিনি সমস্ত ভোগ তৃষ্ণা জয় করে, শান্ত সাম্যময় জীবনে শত্রুর প্রতিও বৈরিতা ত্যাগ করে অতীন্দ্রিয় সুখের পূর্ণতায় ডুবে যাবেন তিনিই সুখী। বস্তুতে সুখ নেই সুখ মনে। বস্তুরতি মানুষকে দুঃখী ও পরবশ করে তোলে। আত্মনিয়ন্ত্রণের দৃঢ়তা। তার থাকে না। বঙ্কিমের রচনায় এ উল্লেখ মিলে। মানুষ এমন এক জীব বস্তুর সঙ্গে তার প্রয়োজন বা আসক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। বস্তুর উৎপাদন ভোগ সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে না থাকলে ঐসব জিনিষ পাওয়ার জন্য মানুষ পরবশ হবেই। আধুনিক শিল্পতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের পরবশতা আরো বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঐহিক মানবতাবাদে মানুষ আপন সত্যকে খুঁজে পায় না। বিভিন্ন আইডিওলজির উদ্ভবভূমি শিল্পতান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্কট আজ খুব তীব্র। উত্তরোত্তর উৎপাদন বাড়িয়ে মানুষের ভোগের নানা যোগান দিতে গিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে. পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ভয়াবহভাবে। এই দূষণের মাত্রা কমাতে যে অর্থব্যয় প্রয়োজন তা করতে পেলেও আবার সমষ্টিবাদী অর্থনীতিতে সঙ্কট বাড়বে ছাড়া কমবে না।

আজ এই ইহসর্বস্ব আধুনিক সভ্যতায় সঙ্কটের নিরসন হবে প্রকৃত ধর্মবোধ বা আধ্যাত্মিক চেতনা ফিরে এলেই। পূজা অর্চনা যাগযজ্ঞের ধর্ম নয়। এ ধর্ম মানবধর্ম।

সর্বশক্তিময়ী প্রযুক্তিবিদ্যায়। বৈজ্ঞানিক চমৎকারী আবিষ্কারে প্রকৃতির উপর হাত চালানো মানুষের উদ্ধত কার্যকলাপ দেখে নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্রান্ত রাসেলও আতঙ্কবোধ করেছিলেন। আলবেয়র সোয়াইওসারও বলেছিলেন reverence for life অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। এই রিভিরেন্স— এই শ্রদ্ধাবোধ, পবিত্রতাবোধ — এ-সব বিজ্ঞান থেকে আসে না আসে ঈশাবাস্য মিদং সর্বম। চেতনা থেকে। সবকিছুই এক ঈশ্বর বা আত্মার দ্বারা পরিব্যাপ্ত । এই বোধ থেকেও।

যাজ্ঞবল্ক বলেছেন — আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ংভবতি — সর্বব্যাপী এই আত্মাকে ভালবাসি বলেই সবকিছু আমাদেব প্রিয় হয়। প্রতিবেশী, পরিবেশ সবকিছুর প্রতি এক আত্মীয়তাবোধ বা ভালোবাসা জাগলেই মানুষ সুস্থ হবে সুখী হবে, মানবসমাজ এবং পরিবেশ সুস্থ হবে।

কাজেই সেই মানবধর্মের চর্চা আজ করতে হবে যা রবীন্দ্রনাথের সহজ কথায় 'পথের প্রান্তে আমায় তীর্থ নয়/ পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়' — End এবং means এখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এমন নৈতিক আধ্যাত্মিকতা এই মানবধর্মে মানুষকে জাগাতে হবে যাতে তেত্রিশ কোটি দেবতার গল্প একশ দশ কোটি মানুষেব মধ্যে সত্যরূপে জেগে উঠবে।

আশাপূর্ণা দেবী ঃ প্রেরণা ও সাহিত্য সাধনা

আশাপূর্ণা দেবীকে প্রথম থেকেই আমার একটা মা মা লাগতো। কারণ আমার মায়ের সঙ্গে তাঁর জীবনের অনেক মিল আমি খুঁজে পেতাম। সেই রক্ষণশীল পরিবার, স্কুল কলেজের শিক্ষা লাভের সুযোগহীনতা, সেই তেরো চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে, আশাপূর্ণা দেবী পিতৃগৃহেই পেয়েছিলেন অবাধ পাঠের সুযোগ। আমার মা পেয়েছেন শ্বশুর বাড়িতে বিয়ের পর ইচ্ছেমত বইপত্র মাসিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ। আশাপূর্ণা দেবী কবিতা শুরু করে চলে গেছেন উপন্যাসের বিস্তৃত অঙ্গনে। আমার মা একান্ত গোপনে তাঁর ডায়েরী, ধোপার খাতা, হিসাবের খাতা ভরিয়ে তুলেছিলেন কাব্য কবিতা রচনায়। ধাবালো ব্যক্তিত্ব, নিজস্ব মতামত, চিরন্তন আধুনিকতা নিয়ে মা চিরদিনই অসামান্য।

যাক সেকথা, সেজন্য মনেব গোপন কোণে সব সময়ই একটা শ্রদ্ধা এবং আত্মিক সম্পর্কের গভীরতা আনন্দ অনুভব করেছি আশাপূর্ণা দেবী প্রসঙ্গে।

আশাপূর্ণা দেবীর ইতিহাস, এক অপরূপ সাধনা ও সাফল্যের ইতিহাস। সেই তেরো চোদ্দ বছর থেকে তিনি সাহিত্য সাধনা করে আসছেন এবং আমরন তাব লেখনী সদা চলিষ্ণু ছিল। লেখালেখি দিয়েই জীবন শুরু করে লেখা দিয়েই শেষ।

গৌরব এমন একটা জিনিষ যে তার ভাগীদার হতে আমরা অত্যন্ত আনন্দ এবং উৎসাহ বোধ করি। সে হিসেবে সমস্ত মহিলা সমাজ যুগে যুগে আশাপূর্ণা দেবীর মত উচ্চ মানবিক গুণ সম্পন্ন শক্তিময়ী সাহিত্যিকের আবির্ভাবের জন্য গৌরব অনুভব করেন।

তাঁর গভীর এবং সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, তার দরদী কলম সমাজ এবং সংসারের নানা জটিল আবর্ত থেকে জীবনসত্যকে তুলে নিয়ে এসেছে। তাঁর লেখার পটভূমিকা, তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে খুবই সহজ সরল ঘরোয়া পরিবারের মধ্যে রয়েছে কিন্তু তবু সেখানে কি অগাধ বৈচিত্র্য, কি গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, কি অসীম সম্পদকে তিনি আবিষ্কার করে কত অনায়াস সৌন্দর্যে সেগুলোকে তুলে ধরেছেন ভাবতে অবাক লাগে।

অজস্র লিখেছেন তিনি। তাঁর প্রধান উপজীব্য বিষয় মানুষ। মানুষ নিয়েই তাঁর কারবার। মানুষকে যে তিনি কত রূপে দেখেছেন তাঁর সেই দেখার ক্ষমতায় বিস্ময় জাগে। এ যেন

দরজা জানালা খুলে দিয়ে ঘরের ঐশ্বর্যকে দেখতে দেয়া। এ যেন মানুষের বুক চিরে মানুষের হৃদয়ের কথাকে তুলে ধরা।

বিখ্যাত লেখক ডঃ জনসনকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলন Sir what is a poet তিনি বলেছিলেন A man speaking to a man. বৈচিত্রময়ী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী ঠিক সে অর্থে ছিলেন একজন উদারমনা পূর্ণাঙ্গ মানুষ, যিনি মূলত এক মানুষ কবি, সাহিত্য সাধনা শুরু করেছিলেন এবং সারা জীবন মানুষের কথাই বলেছেন মানুষের কাছে। প্রকৃতির উপজীব্য বিষয়বস্তু ছিল না। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন — 'আমার লেখার উপজীব্য কেবল মানুষ।

প্রকৃতিপ্রেমিক লেখকের বর্ণাঢ্য রচনা আমায় আকৃষ্ট করে আনন্দ আর বিস্ময়ের স্বাদ এনে দেয় কিন্তু ও আমার সাধ্যের বাইরে। সাধ্যের মধ্যে শুধুই মানুষ। মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মানুষ যে আমার একান্ত চেনা জানা। আমি আমার জানা জগতের বাইরে কখনো হাত বাড়াতে যাইনা।'

এডওয়ার্ড টমসন এক বিখ্যাত ব্যক্তির সাহিত্য চর্চা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন He was incapable of intellectual dishonesty, একথা আশাপূর্ণা দেবীর পক্ষেও খাটে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য চর্চার সঙ্গেও আশাপূর্ণা দেবীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রও মানুষের ওপর মনসংযোগ করেছিলেন। মানুষের হৃদয় নিয়েই তাঁব কাববার ছিল। নিসর্গের রূপবর্ণনায় নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণনায় উৎসাহ দেখাননি। বাংলার পল্লী সমাজের বাঙালী সমাজের সাধারণ নরনারীর স্বভাব বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন, বাংলার সমাজে প্রচলিত একাধিক অনুচিত সংস্কার এবং গতানুগতিক মূল্যবোধকে সজোরে আঘাত করে গেছেন। বাঙালীর অন্তরে নারীর অন্তরে বিদ্রোহের বিচারের আগুন জ্বালিয়েছেন। কথা সাহিত্যের মনোহারিত্বে হয়তো তিনি অতুলনীয় তবু আশাপূর্ণা দেবীও এ বিষয়ে তাঁর সহযোগী, সহসাথী ছিলেন।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মত আশাপূর্ণার সদা চলমান কলম মধ্যবিত্ত জীবনভিত্তিক ঘরোয়া পারিবারিক জীবনের নানা স্বাদের অনুভবের অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়ে গেছেন। বিশেষ করে মেয়েদের আশা আকাঙ্ক্ষা, তাদের বাধাবিঘ্ন, দুর্দশা, আত্মপ্রতিষ্ঠার বেদনা সংগ্রামের ইতিহাস।

লিখেছেন অজস্র উপন্যাস ১৭৬ টি, গল্প সংকলন ৩০ টি, ছোটদের বই ৪৭ টি, এছাড়াও ছোট বড় অনেক রচনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, তার ৬৩ টি গ্রন্থ অনুদিত হয়েছে। পুরস্কারও পেয়েছেন তেমনি অজস্র। ১৯৫৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা পুরস্কার, ১৯৫৯ সালে যুগান্তরের মতিলাল পুরস্কার, আবার ১৯৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী পুরস্কার, ১৯৬৬ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার 'প্রথম

প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য, ১৯৭৬ সালে পদ্মশ্রী খেতাব, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে ডি. লিট, ১৯৭৭ এ সম্মানিত সাহিত্য পুরস্কার জ্ঞানপীঠ, বেথুন কলেজ থেকে পেয়েছেন সম্মানিত লেকচারারের আমন্ত্রণ।

পারিবারিক রক্ষণশীলতা অভিজাত্যবোধের জন্য তিনি স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ পাননি। সেটা তাঁর জীবনে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। সৌভাগ্যবশতঃ সীমাবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ায় শিক্ষিতা হবার সুযোগের তথাকথিত সীমাবদ্ধ সুযোগের অভাবই তাঁকে দিয়েছে স্বেচ্ছালব্ধ সীমাহীন জ্ঞান অর্জনের উদাব এবং অখন্ড অবকাশ। লেখালেখির বিষয়ে তাঁব স্বামীর উদার সহযোগিতা, সম্মান, সাহচর্য বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি আশাপূর্ণা দেবীকে সাধ্যমত ভ্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে সুযোগ করে দিয়েছেন। এই দৃষ্টান্ত সমাজের অন্য পুরুষদের পক্ষে আদর্শ আচরণীয়।

প্রচুর পড়াশোনা করেছেন তিনি। ছোটবেলায তাঁর দুষ্টুমীর জন্য তাঁর মা তাঁকে জানালার উঁচু তাকে বসিয়ে রাখতেন। চেঁচামেচি কবলে হাতে কিছু বই দিযে দিতেন। সব গোলমাল ঠান্ডা। মলাট ছেঁড়া হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, পাতা ছেঁড়া বিজয় বসন্ত — যে কোন বই পেলেই তিনি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করতেন।

এভাবে হাতে খড়ির অর্ধেক বয়সেই তাঁর নানা কবিতা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। যে কেউ বাড়িতে এলেই এই আশ্চর্য বালিকাকে উপস্থিত করা হতো আবৃত্তির জন্য তিনি শুরু করতেন — 'রবির কিরণে চাঁদের কিরণে আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি/ সবে উচ্চ রবে বল বল তবে ভূতলে বাঙালী অধম জাতি।' অথবা — 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' বা রাবণ শ্বশুর মেয়ের মেঘনাদ স্বামী' কখনো 'আজি এ প্রভাতে রবির কর।'

যে বযসে যা পড়া উচিত ছিল তা কোনদিন পড়েননি তিনি। বিনা বাধায় সব কিছু পড়ে ফেলেছেন। পাশের বাড়ির ভাড়াটে সাহিত্য পিপাসু নিরক্ষর ভদ্রমহিলাকে অনেক বড়দের বই পড়ে শোনাতেন তিনি। বইয়ের যোগান ছিল নিরবচ্ছিন্ন, কারণ আশাপূর্ণার মায়ের ছিল অফুরন্ত সাহিত্যক্ষুধা। দু'তিনটে লাইব্রেরী থেকে বই আসতো। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অনবদ্য অবদান যাবতীয় গ্রন্থাবলী ছিল বাড়িতে মজুত। নাটক নভেল পড়ার কোন নিষেধবাণী ছিল না। এ বিষযে তিনি লিখেছেন — 'সে নিষেধ না থাকার কারণ অবশ্য যে বয়সে বস্তুর প্রভাবে উচ্ছন্ন যাবার আশঙ্কা সে বয়েসে পৌঁছাবার অনেক আগে থেকেই যে ওই বিষ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে বসে আছি।'

প্রতিবেশিনী ভদ্রমহিলাকে যখন বই পড়ে শোনাতেন, তিনি ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতেন হয়তো যে — ও ছেলেমানুষ ও আর কী বুঝবে। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন — 'কী করে বা বুঝবেন মেয়েটা সেই কালেই এত পরিপক্ক হয়ে বসে আছে যে রোহিনীর শোচনীয় পরিণামে তাঁর সৃষ্টিকর্তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। চারুলতার মর্মবেদনা বিদ্ধ হয়। তার 'যমুনা'

নামক পত্রিকাটির অকাল মৃত্যুতে 'চরিত্রহীনের শেষটা পড়তে না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়।'

তাঁর বক্তব্যের পটভূমিকায় তাঁর মানস গঠনের পূর্ণতা, তাঁর বৈচিত্র্যের ভিত্তির পরিমাপ করা যায়। মাঝে মাঝে সাহিত্য প্রতিযোগিতা চলতো দিদি রতনমালা ছোটবোন সম্পূর্ণার সঙ্গে।

তাঁর প্রথম কবিতা 'বাইরের ডাক' ১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় শিশুসাথীতে। সম্পাদক রাজকুমার চক্রবর্তী তাঁকে উৎসাহ দিয়ে আরো লেখা চেয়ে পাঠান, তিনি গল্প লিখতে বলেছিলেন। এরপর গল্পই পাঠান, নাম ছিল 'পাশাপাশি'। প্রথম জীবনে তিনি ছোটদের জন্যই লিখে গেছেন ১৩২৯ থেকে ১৩৪৩ বাংলা সাল। তাঁর 'ছোটঠাকুরদার কাশী যাত্রা' খুব লোকপ্রিয় হয়।

১৩৪৩ সালে মন্মথ সান্যাল বড়দের জন্য তাকে লিখতে অনুরোধ জানান। সেই তাঁর প্রথম বড়দের জন্য লেখা আনন্দবাজার শারদীয়াতে। এরপর থেকেই আনন্দ বাজারের রবিবাসরীয় সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ছিল।

প্রথম উপন্যাস রচনার জন্যও অনুরোধ আসে 'কমলা পাবলিশিং' এর পবিচিত বন্ধু শ্রী চিত্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। 'আমার দ্বারা হবে না' বলে প্রথমটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু চিত্ত বাবু বলেছিলেন— 'শুরু করেই দেখুন না।'

তিনি শুরুও করেছিলেন শেষও করলেন। সেই প্রথম উপন্যাসের নাম 'প্রেম ও প্রয়োজন'। কিন্তু লেখা শেষ হলো না। সেতো মাত্র শুরু। এ বিষয়ে তিনি স্বভাবসুলভভাবে তিনি এইসব উৎসাহ দাতাদের ঋণ অতি মাত্রায় স্বীকার করেছেন। বলেছেন -— 'ওই অনুরোধপত্র বস্তুটিই আমায় লেখিকা করে তুলেছে এবং এযাবৎ লেখিকা করে রেখেছে। আমার এই সুদীর্ঘকালের সাহিত্য জীবনের ইতিহাস ওই একই। অনুরোধ পত্র আর তাগাদাপত্র।'

চাপে এবং তাপে কয়লা হীরে হয় এই বৈজ্ঞানিক সত্য মেনে নিয়েও স্বীকার করতে হয় যে কয়লার মধ্যেই থাকে হীরে হয়ে ওঠার ক্ষমতা এবং প্রবণতা। যাকও তাঁর প্রথম জীবনের উৎসাহ দাতা রাজকুমার চক্রবর্তী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — ''তিনি যদি আমায় সেই প্রথমকালে উৎসাহে ঘৃত সিঞ্চন না করে বরফ জলে ঢালতেন সুনিশ্চিত আমার আর লেখিকা হওয়া হতনা। সে ঋণ অপরিশোধ্য।'

তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রবেশের অনুপ্রেরণা কি এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন — 'সাহিত্যই সাহিত্যের প্রেরণা। প্রেরণার উৎস চিরায়ত সাহিত্যের অফুরন্ত সঞ্চয়।' ভাস্বর হয়ে ওঠা — তার ধারণা ছিল যে এটি অজ্ঞাতসারেই ঘটে। গান গাওয়া, ছবি আঁকা, খেলাধূলা এ সবের ওপর তবু পারিবারিক প্রভাব পড়তে দেখা যায়। তাছাড়া এগুলোর জন্য শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষণ কেন্দ্র ও আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনটি নয়। এক হিসেবে সাহিত্য নিঃসঙ্গ পথিক।

তাঁর জীবনের প্রথম লেখাটিকে তিনি একটি আকস্মিক ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন— 'যেন লেখা নয় লিখে ফেলা। আর ওই লিখে ফেলার পিছনে একটা অদৃশ্য শক্তি। যে শক্তি হঠাৎ কখন ঢুকে পড়ে প্রভু হয়ে বসে অবিরত ধাক্কা মারে। যার ফলে ওই লিখে ফেলা থেকে লিখে চলা। মরা মরা থেকে রাম। খেলা খেলা থেকে লেখা।'

এই তাঁর সৃষ্টির পিছনের ইতিহাস। এই অবিশ্বাস্য সৃষ্টিকর্ম চলেছে তাঁর সাংসারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি। বাংলাদেশে বাঙালী জীবনের পারিবারিক মাধুর্য শৃঙ্খলার আনন্দের কথাকে তিনি যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি দেখিয়েছেন তার অন্তর ত্রুটি, অনুদারতার সীমাবদ্ধতা, কুসংস্কারকে, বিশেষভাবে মেয়েদের প্রতি পরিবার ও সমাজের সীমাহীন অবিচার তাচ্ছিল্য এবং নিষ্ঠুরতাকে।

তাঁর এইসব লেখাব মধ্যে যে সহজ পারিবারিক রস আছে তা সকল পাঠকেরই প্রিয় এবং বোধগম্য। অবশ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী সমালোচকদের সমাদর তিনি কতটা পাচ্ছেন বা পাবেন তাতে বিতর্ক আছে। লোকপ্রিয়তার শিল্পকে স্বাভাবিকভাবেই নিম্নস্তরের বা হাল্কা শিল্পজ্ঞান করার একটা সহজ প্রবণতা আমাদের মধ্যে কম বেশী রয়েছে। কথা সাহিত্যেব মনোহারিত্ব থাকলেও তার দোষ তাতে জটিল বিষযের 'গৌরব নেই, লেখকেব বিরাট বিস্তৃত রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী পটভূমিকা নেই বা বাস্তবতায় এগুলো অগ্রগণ্য নয় ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু যেভাবেই এগুলো ব্যাখ্যাত হোক না কেন এটা অনস্বীকার্য যে এইসব লেখকরা সমাজ পরিবর্তনের নীরব রূপকার। রাজনৈতিক বিপ্লবের চমকপ্রদ গৌরবময ভূমিকা এতে না দেখা গেলেও খুব ধীরলয়ে সামাজিক পরিবর্তনের বিপ্লবের এবা অংশীদার। সমাজে যেসব রীতিনীতি প্রথা সংস্কাব আজ কঠিন দুর্লঙ্ঘ্য থাকে কাল তা অতি সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এর পেছনে থাকে সাহিত্যিকরূপী সমাজসেবকদের প্রেরণা নীরব বিপ্লব। কলম সেখানে তরবারিব চেযেও শক্তিশালী।

যে পর্দাপ্রথা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ জাতিভেদ তীব্র মাত্রায় সমাজে ছিল তা আজ নেই বা সেরকম নেই। এগুলো কিভাবে হলো তার বৈজ্ঞানিক সামাজিক বিশ্লেষণে কলমচী বিপ্লবীর অবদান ধরা পড়ে।

আশাপূর্ণা তাঁর লেখায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, আত্মমর্যাদা লড়াই, আত্ম প্রকাশের বাসনাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। তাঁর ৭০ বছরের বেশী সাহিত্য সাধনার জীবনে নারীকে তার আত্ম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মোপলব্ধির পথে নিজের সামাজিক অবস্থানকে বুঝে নিয়ে নিজের প্রাপ্যকে বুঝে নিতে সাহস যুগিয়েছেন। এটা কম নয়।

আজকের নারী প্রগতির যুগে তাঁর এই ভূমিকাকে সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু সামাজিক বাধানিষেধের পথটুকু কাটিয়ে আসতে অনেক বড় ঝড় - ঝঞ্ঝা বইয়ে দিতে হয় যার অনেকটাই খুব অগোচরে ধীর পদক্ষেপ ঘটে যায় বলে সরাসরি একে গুরুত্বপূর্ণ মনে

হয় না। কিন্তু আসলে এগুলো এক দুঃসাহসিক বিপ্লব। তবে তাঁর এই সামাজিক দায়বদ্ধতা কোন উদ্দেশ্যমূলক উদ্দেশ্য সাধন নয়। পরিপূর্ণ মানবত্ববোধের প্রেরণায় অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে দুর্গত যন্ত্রণাকাতর মানুষের বিদ্রোহ এবং সমবেদনার এক উজ্জ্বল প্রকাশ।

ছোটখাটো লেখা লিখতে লিখতেই তাঁর মনে এক প্রেরণা আসে এমন একটা কিছু লেখায় যাতে তার হৃদয়ে সদা আন্দোলিত অস্থির আপোষহীন প্রশ্নের এবং সামাজিক বৈষম্যের প্রতি সীমাহীন ক্ষোভকে তিনি প্রকাশ করতে পারেন। মেয়েদের আকারহীনতা, তাদের তুচ্ছ এবং মূল্যহীন সামাজিক অবস্থিতি, দুর্গতি তাঁকে যন্ত্রণামুখর করে তুলে।

এ চিন্তা তাঁর মনে নতুন নয়। বিয়ের আগে ১৩৩০ বঙ্গাব্দ পুরুষের প্রতি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে তিনি একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। প্রথম লাইনে বক্তব্য ছিল দেশকে 'স্বর্গ' এবং নারীকে 'দেবী' বলে কেন এই আত্মবঞ্চনা। সেই প্রথমজীবনের লেখা ভুলে যাওয়া কবিতার দু'চার লাইন তিনি পরে উদ্ধৃত করেছিলেন। সেগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। লাইনগুলো হচ্ছে — 'তৃপ্তি পেতেছো তুমিই কি শুধু শয্যাভাগিনী লভি?/ মর্মে কর্মে সঙ্গী যে নয়। শুধু কামনার ছবি। আসলে যে কোন দাসীর অবসাদ 'দেবী' বলে বাড়িও না/ সোনা সোনা বলে ফাটালে আকাশ। পিতল কি হবে সোনা?/ তোমারও তো আজ ক্লান্তি এসেছে একাকী চলিতে পথ/ পশুর মতন চলিছ নীরবে টানিয়া জীবন রথ/ হাতে হাত রেখে চলো দুইজনে/ ঘুচে যাক অবসাদ/ কর্মে আসুক নতুন প্রেরণা না আনন্দ স্বাদ।'

আজো বহু হতভাগ্য পুরুষের কাছেই আশাপূর্ণার এই কবিতা সমান প্রাসঙ্গিক যারা জানেন না জীবনে তারা কি হারাচ্ছেন।

এই মানসিকতা বাহিত এক প্রকাশের আশঙ্কাই তাঁকে প্রেরণা দেয় এক 'ত্রয়ী' যার ইংরাজী নাম 'ট্রিলজী' রচনার। মনে মনে বাসনা থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন — 'কারণটা আমার সেই অলসতা — ভিতরের তাগিদের সঙ্গে বাইরের তাগিদেই যোগাযোগ না ঘটলে কাজে হাত দেয়া হয় না।'

সে যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত ঘটল 'কথা সাহিত্য' পত্রিকা থেকে একটা ধারাবাহিক উপন্যাসের জন্য অনুরোধ আসার পর। মিত্র ও ঘোষের স্ত্রী ভানু রায়ের কাছ থেকে অনুরোধ আসে একটি বড় উপন্যাসের জন্য। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রকাশের পটভূমি। এই ট্রিলজির প্রথম পর্যায় 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' একশো বছর আগের গ্রামীণ সমাজের এক বিত্তবান ঘরের পটভূমিকায় লেখা। বাংলা ১৩৭১ সালে মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত হয়। পরের বছর বইটি রবীন্দ্র পুরস্কার পায়। ১৯৭৭ সালে এটির জন্যই লেখিকা পান দুর্লভ সম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।

এই বইয়ের নায়িকা যে প্রথম নারী সমাজে এক আত্মপ্রতিষ্ঠার আত্মসচেতনতা ও প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে প্রথম প্রতিশ্রুতি নিয়ে এলো সেই সত্যবতী বাংলার নারী সমাজকে

যথেষ্ট ভাবিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে তা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না।

ট্রিলজীর দ্বিতীয় উপন্যাস সুবর্ণলতা সত্যবতীর মেয়ে। তার বিকাশের পটভূমি কলকাতা শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবার, যাদেব আভিজাত্য নেই আছে অহঙ্কার। আর এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে যা হয় তাই হয়েছে। সেই ভিতহীন মিথ্যে অহঙ্কারে অসহায় অপমানকর 'সুখের শয়ন পাতা' মেয়েদের জীবনের প্রতিনিধি সুবর্ণলতার জীবনে।

'বকুল কথা' ট্রিলজীর শেষ ভাগ। এখানে সুবর্ণলতার মেয়ে বকুল নায়িকা নয় লেখিকা। ভূমিকা দর্শকেব। ঘরোযা লেখিকা জীবনের মধ্যে আজকের সমাজকে দেখার এবং ধরার চেষ্টা তাঁর। 'বকুল কথা' কি তাঁরই শ্রেষ্ঠ ফসল এই ট্রিলজী। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ বচনা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। অগণিত পাঠক পাঠিকার অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়েছে এই রচনাত্রয়।

তবে সদাচলমান কলমের অধিকারিণী আশাপূর্ণা সেখানেই থেমে থাকেন নি। শতবর্ষ আগের গ্রামীণ সমাজ নেই বলে লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে বেবিয়ে পড়া, শূন্যে - জলে - স্থলে বিজয় পতাকা ওড়ানো মেয়েদের জীবনে সব সমস্যার শেষ তা তিনি ভাবেন নি। তিনি দেখেছেন 'খাঁচা থেকে বেবিযে পডা পাখিরা নতুন আরেক সর্বগ্রাসী শিকারীর জালে আটকা পড়ে ছটফটাচ্ছে না কি ? যে শিকাবীর নাম আধুনিকতা যার বঙ চঙে রাঙতা মোড়া জালে আটকা পড়ে শুধু মেয়েরাই নয় ছটফটাচ্ছে সমাজ সাহিত্য শিল্প আব সভ্যতা।'

সেই ছটফটানি, সেই পথভ্রান্তাতাও তিনি চিহ্নিত করে সমাজ মানসে সচেতনতা সৃষ্টি কবতে চেয়েছেন তার পরবর্তী আধুনিক লেখাগুলোতে। ভালবাসার অভাব, নীতি অভাব পারিবাবিক সৌন্দর্য শৃঙ্খলা মাধুর্যের অভাব আজ এক বিশ্ব সমস্যা।

এনিযে আজ বহু গবেষণা, আলোচনা, নিবীক্ষা, সমীক্ষা চলছে। খুব বৈজ্ঞানিক ধারায়। গত ১৯৯৪ সালকে সেজন্য 'আন্তর্জাতিক পরিবাববর্ষ' ঘোষনা করা হয়েছে। পরিবার দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে। এর পেছনে শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, ব্যক্তিত্বেব লড়াই, সামাজিক অস্থিরতা, আত্মিক তথা নীতিজ্ঞানেব অভাব সবই কারণসূত্রে রয়েছে। এই সামাজিক আত্মিক বিনষ্টি থেকে রক্ষা পেতে মানুষ আজ আবাব যৌথ একান্নবর্তী পরিবারেব কথা ভাবছে। একক অভিভাবকত্বের সমস্যা ভবিষ্যত প্রজন্মেব শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিশেষত মানসিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পটভূমিকায় আশাপূর্ণা দেবীর লেখাগুলো সামান্য এক গৃহবধূর সামান্য পারিবারিক ঘটনাবলী বা সমস্যার চিত্রণ বলে তুচ্ছ বিবেচিত হয়না। পরিবার দেশের ছোট একক। উন্নতির মূল চাবিকাঠি। এই বিচারে তাঁর রচনায় বিষয়বস্তু আজ বিপন্ন সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

বিরল ক্ষমতার অধিকারিণী লেখিকার চিন্তা চেতনায় ধরা পড়েছে এইসব মৌলিক জাগ্রত বিশ্বজনীন সামাজিক সমস্যাগুলি।

তার লেখার ভঙ্গিতেও এক অনুপম ঐশ্বর্য মিশে আছেন । প্রকাশ ভঙ্গিতেও আছে তার ব্যক্তি পরিবারের স্বকীয়তা।

সব কিছু নিয়ে তিনি পরবর্তী প্রজন্মেব জন্য, বিশেষভাবে নারী সমাজের কাছে এক আদর্শ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকবেন. যাঁর লেখা তাদের প্রগতির দিশারী হয়ে শক্তি সাহস যোগাবে।

শিক্ষা ব্যবস্থাঃ মেঘে ঢাকা একটি উজ্জ্বল তারা

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে খুব স্বাভাবিক কারণেই আমরা আমাদের এই সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিকাঠামোতে উন্নতি, ত্রুটি বিচ্যুতি এবং আমাদের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসেব- নিকেশ করছি। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি খতিয়ে দেখছি কোথায় কি করা উচিত ছিল — কি করা হয়নি এবং ফলস্বরূপ খুব সঙ্গত কারণেই ভবিষ্যতে কি করা উচিত, সেটাও ভাবছি।

কারণ আমাদের এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের প্রতি নানা ধরণের মৌলিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি রেখেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি এবং প্রগতিই ছিল মুখ্য লক্ষ্য। তবে এই লক্ষ্যবস্তু প্রাপ্তির জন্য যেখানে যেভাবে আবশ্যিক জোর দেয়া উচিত ছিল - স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে আজ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে সেটা সেভাবে ঠিক ঠিক মতো দেয়া হয়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আমাদের সংবিধানে সকলের জন্য সমান সুযোগ, সমান অধিকার স্বীকৃত হলেও সার্বজনীন শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার সুযোগটাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে না রেখে নীতি নির্দেশিকার মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে যে শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের মেরুদন্ড বলা হয় যা প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার হওয়া উচিত ছিল, সে শিক্ষা দাবী বা অধিকার হিসাবে গত ৫০ বছরে ভারতবাসীর কাছে সহজলভ্য হয়নি। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনাধীনে দেশের সর্বসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা শাসকদের কাছে অনাকাঙ্খিত হওয়া বা সেটা সাধারণের জন্য সহজপ্রাপ্য না করার ব্যাখ্যা বোঝা গেলেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে অত্যন্ত অন্যায় এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে রুগ্ন হতশ্রী করে রাখার পিছনে দেশের শাসনকর্তা, পরিচালক শিক্ষাবিদদের চিন্তাচেতনা মননশীলতা, দেশবাসীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা সহানুভূতির অভাবের সঙ্গত ব্যাখ্যা করে ওঠা যায় না। তবু সাধারণ দেশবাসী এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি হয়তো তাদের আশা ছিল সবুরে মেওয়া ফলবে। কিন্তু সেটা ফলেনি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত নজর না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য প্রথমেই পন্ডিত এবং দার্শনিক শিক্ষক রাধাকৃষ্ণানকে নিয়ে গঠিত হলো রাধাকৃষ্ণান কমিশন (১৯৪৮)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সবার জন্য নয়। সে শিক্ষা পেতে গেলে ছাত্রদের একটা নির্দিষ্ট মানের মেধাসম্পন্ন হতে হয়। কিন্তু সে মান সে পর্যায়ে পৌঁছানো সাধারণ দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে কি সহজ এবং সুলভ ব্যাপার? উচ্চশিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা অবশ্যই জরুরী তবু তারই পাশাপাশি সেদিন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে জোর দিলে দেশের চিত্র অন্যরকম হতো। তাছাড়া রাধাকৃষ্ণান কমিশনের ভালো ভালো সুপারিশগুলি নীতিগতভাবে মেনে নিয়েও সরকার সবগুলি কার্যকরী করেন নি অথবা করতে পারেন নি। তখন দেখা গেলো উচ্চশিক্ষায় যারা আসবে সেই মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের মানের উন্নতি প্রয়োজন। তাই আবার ১৯৫২ সালে হলো মুদালিয়র কমিশন। ১৯৫৩ সালে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাব ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার সুপারিশ সহ পরিবর্তিত পাঠ্যসূচী পেশ করলেন। এরপর ১৯৬৪ সালে এলো কোঠারী কমিশন। এই প্রথম স্বাধীন দেশে একটি শিক্ষা কমিশন প্রাক্ প্রাথমিক সম্বন্ধে কোন সুপারিশ না রাখলেও বিস্তৃতভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ রাখলেন। একে আবশ্যিক, অবৈতনিক এবং সার্বিক করার কথাও বললেন। এভাবে বলা চলে চাকাটি সোজা না ঘুরিয়ে উল্টো ঘোরানো হলো। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অবহেলিত বঞ্চিত প্রাক্ প্রাথমিক - প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্রছাত্রীরা কোনদিনই মাধ্যমিকে উচ্চ মাধ্যমিকে উচ্চশিক্ষায় সাধারণভাবে ভালো করতে পারলো না, এখনো পারছে না। কারণ এদের ভিত একেবারেই কাঁচা। এই ভুলের সংশোধন করতে আজ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ দিশাহারা। নোট-নকল পরীক্ষায় গ্রেস্- ফলাফলে লজ্জাজনক ব্যর্থতার পরিমাণের বোঝা কেবল বেড়েই চলেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার একটা সুস্থ সুন্দব ফলপ্রসূ চেহারা দিতে এভাবে বহু কমিশন বহু কমিটি আজও গঠিত হচ্ছে। সেই বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে নয়া শিক্ষানীতিতে নবোদয় পর্যন্ত বহু রাস্তা খোঁজা হয়েছে। পঞ্চাশ বছরে এখনো চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দুই — বছরের কোর্সের জায়গায় তিন বছর, তিন বছরের জায়গায় দুই বছর-এর শেষ নেই। তবু স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীতে সবচাইতে নিরক্ষরদের সংখ্যা আজ আমাদের দেশে। ৫০ কোটি নিরক্ষরের মধ্যে ৭৫ শতাংশই মহিলা।

শিক্ষাকে একটি দেশের মেরুদন্ড হিসাবে গণ্য করা হয়। আসলে শিক্ষা মেরুদন্ড নয়, দেশ এবং জাতির প্রাণবস্তু স্বরূপ। উপযুক্ত শিক্ষাবিস্তারে চেতনা দেশকে এবং জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রচেষ্টা এবং তার সার্থকতার উপর একটি দেশ এবং একটি রাজ্য থেকে আরেকটি দেশ এবং আরেকটি রাজ্যের প্রগতির হারে পার্থক্য ঘটে।

ভারতে আজ কেরালা রাজ্যের শিক্ষার (৮৯.৮১) হার সব রাজ্যের চেয়ে বেশী। সে রাজ্যে জন্মের হার (১৮) কম, শিশু মৃত্যুর হারও (১৬) কম। এজন্য আজ কেরালার আর্থিক প্রগতিও লক্ষ্যণীয়, তাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত। এর পিছনে রয়েছে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা- পূর্ব ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যের (আজ যা কেরালা) মূল্যবান অবদান, তদানীন্তন রাজন্যবর্গের উৎসাহপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা।

ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত প্রায় অজ্ঞাত অবজ্ঞাত ছোট্ট পার্বতী ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও ঘটেছে এ ঘটনা। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি প্রজাসাধারণ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে না পারলেও ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বহুকাল একনিষ্ঠ চর্চা করে গেছেন। অবিভক্ত বাংলাদেশে বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে অসাধারণ ভূমিকা ছিল তাঁদের। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যই প্রথম স্বীকৃতির সম্মান এবং অভিনন্দন জানান। তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্ব গগনে উদিত এক কিশোর রবি মাত্র। তাঁর 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য পড়ে বীরচন্দ্র মুগ্ধ হন এবং প্রশাসনের উচ্চ কর্মচারী রাধারমন ঘোষকে অভিনন্দন পত্র এবং খিলাত সহ পাঠিয়ে দেন। এরপরই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এবং পরবর্তী রাজ পরিবারের এক স্থায়ী অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। সে এক পারস্পরিক দেয়া নেয়ার ইতিহাস। ত্রিপুরার রাজাদের সখ্যতায় রবীন্দ্রনাথ বারবার তার চারপাশের অভিজাত ব্যক্তিবর্গদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তিনিও এখানকার নৃত্য, এখানকার পুষ্পচর্চার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং এগুলির চর্চাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান। এইভাবে দেয়া নেয়ার ফলেই ত্রিপুরায় গড়ে ওঠে আরেকটি পরোক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা। ত্রিপুরার বহু ছেলে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে থেকে লেখাপড়া করেন। এই তালিকায় বহু শিল্পী কবি সফল রাজপুরুষ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বরেণ্য শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শৈলেশ রঞ্জন দেববর্মা, হৃষিকেশ দেববর্মণ, সতীশচন্দ্র দেববর্মণ নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে অভিজাত বা মধ্যবিত্ত পরিবারেও সেদিন নৃত্যচর্চা তেমনভাবে প্রচলিত ছিল না। ত্রিপুরায় রাজপরিবার থেকে গৃহীত নৃত্যচর্চাকে রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তোলেন। এ শিক্ষার প্রসারে ত্রিপুরার অবদান রয়ে গেছে সরাসরি। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য এখান থেকে বুদ্ধিমন্ত সিংকে নৃত্যশিক্ষক হিসাবে শান্তিনিকেতনে পাঠান। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ত্রিপুরার অর্থ সাহায্য নিয়মিত ছিল। এছাড়াও বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, অন্ধ কবি হেমচন্দ্র এবং ভাষাবিদ্ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অর্থ সাহায্য ত্রিপুরার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। অগণিত ধর্মগ্রন্থ, বাংলা এবং সংস্কৃত গ্রন্থের ছাপা এবং বিনামূল্যে প্রচারের ব্যাপারেও তাঁদের প্রচুর অর্থ সাহায্যের প্রমাণ রয়েছে যা শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের প্রীতির অকৃত্রিম নিদর্শন।

আজ স্বাধীন ভারতের নানা স্থানে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক বেহাল পটভূমিতে আমরা যদি পার্বতী ত্রিপুরায় শিক্ষার হাল চিত্রটায় চোখ বোলাই তবে দেখি যে ১০৪৯১ বর্গ কিমি. আয়তনের একটি ছোট্ট রাজ্য যা পশ্চিম বাংলার একটি বড় জেলার চাইতেও অনেক ছোট এবং যার আন্তর্জাতিক সীমারেখা বাংলাদেশের সঙ্গে ৮৩৯ কিলোমিটার, মিজোরামের সঙ্গে ১০৯ এবং আসামের সঙ্গে ৫৩ কিমি। যার লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষেরও বেশী। একটু ভারী বর্ষা হলে যার পাহাড়ী রাস্তায় খানে খানে ধস নামে বা কাঠের পুল ভেঙ্গে বাকি ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে --- যার নিজস্ব কোন কলকারখানা বড় শিল্প বা

উল্লেখযোগ্য কোন অর্থকরী উৎপাদন নেই সে রাজ্যে আজ সাক্ষরতার হার ৬০.৪৪। পুরুষদের হার ৭০.৫৮ এবং মেয়েদের হার ৪৯.৬৫।

এটা নিঃসন্দেহে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে গৌরবের বিষয়। তবে শিক্ষার এই বাতাবরণ ত্রিপুরায় একদিনে গড়ে ওঠেনি। এরও উল্লেখযোগ্য পশ্চাদভূমি রয়েছে , রয়েছে বিগত দিনের অলিখিত ইতিহাস। এই ইতিহাসকে সঠিকভাবে খোঁজা হয়নি। সেই চাপা পড়া ইতিহাসকে আজ তুলে আনতে হবে।

ত্রিপুরা প্রায় চৌদ্দশ, (প্রাপ্ত ইতিহাস অনুসারে, কিংবা কিংবদন্তী অনুসারে আরো সুপ্রাচীন) বছরের প্রাচীন এক সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য — যে রাজ্যের রাজন্যবর্গের রয়েছে বহুচর্চিত সূক্ষ্ম, অভিজাত্যপূর্ণ শিল্প সঙ্গীত এবং শিক্ষার সমৃদ্ধ ইতিহাস। অবশ্য এরই পাশাপাশি রয়েছে নিন্দার শিরোপা। দেশের হাজার হাজার আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন পদক্ষেপ তাঁরা নিতে পারেন নি। এ বিষয়ে তাঁদের জন্য একটি জোরালো বক্তব্য, একটি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হতে পারে তদানীন্তন ত্রিপুরার দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থা এবং জুম-নির্ভর যাযাবরী আদিবাসীদের বিভিন্ন অঞ্চলে সরে সরে বসবাসের অভ্যাস এবং প্রতিস্থানে অবস্থানের স্বল্প স্থায়িত্ব। এছাড়াও সেদিনকার 'স্বাধীন ত্রিপুরা'র রাজস্ব ব্যবস্থাও তত শক্তিশালী ছিলনা যা দিয়ে পাহাড় পর্বতেব অভ্যন্তরে বিদ্যালয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত এটাই বাস্তব সত্য হয়ে প্রতিভাত হয় যে জনশিক্ষা বিরোধী না হলেও সেদিনকার শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁদের মানবিক চিন্তা চেতনা সার্বজনীন রূপ পায়নি। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কিছু সমাজ সচেতন পাহাড়ী ছাত্র কিশোর এবং যুবকদের উৎসাহ উদ্দীপনায় দুর্গম পাহাড় অঞ্চলের ৪৮৮টির মত প্রাথমিক স্কুল বা পাঠশালা খোলা হয়েছিল। এই স্কুলগুলির অনুমোদন মহারাজ বীরবিক্রম উদ্যোক্তাদের প্রার্থনা অনুসারে মঞ্জুর করেন। এই স্কুলগুলির কথা যা পরে 'জনশিক্ষা আন্দোলন' — নামে প্রসিদ্ধি পায় -- ত্রিপুরায় শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে নথীবদ্ধ হয়নি। সে পরিচ্ছেদের কথায় পরে আসছি।

যাই হোক, স্বাধীন ভারতে যোগদানের পূর্ববর্তী ত্রিপুরায় মোটামুটি দুটি শিক্ষা ব্যবস্থাই চালু ছিল। একটি হচ্ছে রাজমহলে বা অভিজাতবর্গের বাড়িতে গৃহ শিক্ষা। পন্ডিত সংস্কৃতজ্ঞ বা ইংরাজী নবীন শিক্ষিত শিক্ষকদের কাছে বাংলা, সংস্কৃত, অঙ্ক এবং মুসলমান মৌলবীর কাছে আরবী, ফার্সী, কুস্তিগীরের কাছে দেহচর্চা, ওস্তাদ সঙ্গীতজ্ঞের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করা। রাজকুমারীরা নৃত্য শিক্ষকদের কাছে ছোট বয়সে নাচ শিখতেন, পরে অন্দরমহলের কিশোরী যুবতীদের নাচ শেখাতেন। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে তাঁর কন্যারা মেম গভর্ণেসের কাছে ইংরাজী এবং রেশম, পশম, সূচীশিল্পের শিক্ষা নিতেন। অবশ্য এ শিক্ষা স্বল্পকালের, কারণ খুব ছোট বয়সেই সবার বিয়ে হয়ে যেত।

আরেকটি শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল পাঠশালে মক্তবে। অন্যান্য সাধারণ পড়ুয়ারা সেখানে শিক্ষা নিতেন। এরকম একটি ছিল বঙ্গবিদ্যালয়, যা পরে রূপান্তরিত হয় উমাকান্ত

একাডেমীতে। ১৮৭২ সালের হিল ত্রিপুরার পলিটিক্যাল এজেন্ট এ ডব্লিউ বি পাওয়ার-এর অ্যনুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৭২ সালে ৭৪ হাজার প্রজার (উপজাতি ৫৭ শতাংশ বাঙালী মণিপুরী ৪৩ শতাংশ) বাসভূমি ত্রিপুরায় ১০৩ জন ছাত্র সেই বঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়তেন। তখন ত্রিপুরার মহারাজা ছিলেন বীরচন্দ্র মাণিক্য। পাহাড় পর্বতে তখন শিক্ষা বিস্তারেব কোন কর্মসূচী ছিল না। পলিটিক্যাল এজেন্ট তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন ঃ No step have been taken to introduce any system of education among the hill people and appear to have no desire for such innovation। সে সময়ে বঙ্গবিদ্যালয়ে রাজ্য সরকারের অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৭০ টাকা। স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা ছিল চার জন। দুই জন ইংরেজীর, একজন বাংলার আরেকজন সংস্কৃতের। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ডিস্ট্রিক্ট স্কুলের পরিচালন পদ্ধতিতে স্কুলটি পরিচালিত হতো। ১৮৯৬ সালে রাধাকিশোর মাণিক্য রাজা হন। তাঁর শাসনকালে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলটি আগুনে পুড়ে যায়। এরপর বর্তমান উমাকান্ত একাডেমী মাঠে স্কুলটির প্রতিষ্ঠা হয়, নাম হয় আগরতলা হাইস্কুল। পরে রাধাকিশোব মাণিক্য তদানীন্তন মন্ত্রী উমাকান্ত দাসেব নামে স্কুলটির নাম উমাকান্ত একাডেমী রাখেন।

সে সময়ে কৈলাসহরের ছেলেদের জন্য একটি স্কুল (১৮৭২ খ্রীঃ) স্থাপিত হয়েছিল। দুটি স্কুল মিলে সে সময়ে মোট ১০৩ জন ছাত্র ছিল ১৮৭৯ খ্রীঃ স্কুলের সংখ্যা বেড়ে হয় ২৫ এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা হয ৭০০। এই ৭০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৭ জন ছিল বালিকা (৩ জন ত্রিপুরী এবং ৫৪ জন মণিপুরী)। ছেলেদেব মধ্যে অর্ধেকই ছিল বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমান। তবে তখনো বাঙালী মেয়েদের সামাজিকভাবে স্কুলে আসতে উৎসাহিত করা হতো না। তবে ১৮৮০ ৮১ সালে সাবা ত্রিপুরার চারটি বালিকা বিদ্যালয়ের উপস্থিতিব কথা জানা যায়। এই স্কুলগুলিতে ৬৪ জন ছাত্রী ছিল। এরা সবাই মণিপুরী। এগুলিকে পাঠশালা বলাই সঙ্গত। মহারাণী তুলসীবতী হযতো এইসব মেয়েদের বিদ্যাচর্চায় আগ্রহ থেকেই সরকারীভাবে একটি স্কুল খোলার প্রেবণা পান। তিনি নিজেও মণিপুরী সমাজের মেয়ে এবং প্রখর বুদ্ধিশালিনী ছিলেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা না থাকলেও তিনি মুর্খ তো ছিলেনই না, বরং যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন বলা যায়। তার রচিত হোলীর গান একথাই প্রমাণ করে।

১৮৮২ ৮৩ সালে যেখানে মেয়েদের পাঠশালার সংখ্যা বেড়ে ৬টি হয় সেখানে নানা জাতিগত রেষারেষির ফলে (১৮৮০ থেকে ১৮৮১ এবং ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৫) সাধারণভাবে সামগ্রিক শিক্ষা প্রণালী এবং বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষায বাধাবিঘ্ন আসে। পাঠশালার সংখ্যা ৬ থেকে ৪-এ নেমে যায়।

এ সময়েই আগরতলা শহরের মধ্যবিত্ত এবং রাজ পরিবারের অভিজাত মেয়েদের শিক্ষার জন্য যুবরাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের পত্নী যুবরানী তুলসীবতী অন্দরমহল

পরিচালনায় এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অন্দর মহলেই একটি মেয়েদের পাঠশালা শুরু করেন। ১৮৯৬ সালে সিংহাসনে বসে রাধাকিশোর এই পাঠশালাকে নিম্ন বাংলা স্কুলে উন্নীত করেন। ১৯০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি উচ্চ বাংলাস্কুলে, ১৯১৫ -১৬ সালে এম. ঈ. স্কুলে এবং ১৯৪০-৪১ সালে হাইস্কুলের শাখা -১৬ সালে এম. ঈ. স্কুলে এবং ১৯৪০-৪১ সালে হাইস্কুলের শাখা এবং ১৯৪২ সালে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে পাঁচজন বালিকার মধ্যে ৪ জন এই প্রথম স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন।

আজ পর্যন্ত নারীশিক্ষায় উৎসাহ উদ্দীপনা নানা কারণে ততটা লক্ষিত হয়নি যাতে আরো মেয়েদের স্কুল স্থাপন করার কাবণ হতো। পর্দা প্রথা খুব প্রবলভাবেই মানা হতো এবং অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। ফলে ১৯০২-০৩ সালের পবিসংখ্যানে দেখা যায় নিম্ন থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে মোট ২৪১৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯২ জন বালিকা ছিল। ১৯০৪ সালে এই সংখ্যা ৩০৫৫ এর মধ্যে ১১৭ জন হয়। পবেব বছর ৪০৬৪ এর মধ্যে ২৩১ জন এবং ১৯০৮ সালে ৪৮০১ এর মধ্যে ২৩০ জন ও ১৯০৯ সালে ৫০৩৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৯৫ জন, ১৯১০ সালে ৪৯০৮ এর মধ্যে ২৫৫ জন বালিকার হিসাব পাওয়া যায়।

সাফল্যের নিবিখে এই সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও অগ্রগতিব উৎসাহ আকাঙ্ক্ষাব হিসাবে এটি নিঃসন্দেহে সাফল্যেব ইতিহাস।

এভাবে ১৯০২-০৩ সালের শিক্ষার অতীত রেকর্ড থেকে পাশেব পবিসংখ্যান চিত্র পাওয়া যায়। (চিত্র পরের পাতায়)

এই চিত্র থেকে দেখা যায় তখনকার ত্রিপুরায় মোট স্কুলের সংখ্যা ছিল ৭৩ (ছেলেদেব ৬৯, মেয়েদের ৪)। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪১৯, তাব মধ্যে ছেলে ২৩২৭ এবং মেয়ে ৯১। জাতি বিচারে হিন্দু বাঙালী (৮৪০) এবং মুসলিম বাঙালীব (৭৯৬) পবেই সবচেয়ে বেশী শিক্ষার্থী মণিপুরী (৩৯৬) এবপব ত্রিপুবী (২১২ + ঠাকুব ১০৭ = ৩১৯)।

ত্রিপুবা গেজেট থেকে জানা যায় যে বীরচন্দ্রের আমলে বেসরকারী স্কুলগুলিতেও মহাবাজ কিছু কিছু বৃত্তি দিতেন। এ তালিকায় ছিল (১) ধর্মনগরে ফটিওলি মধ্য ইংবাজী বিদ্যালয় (২) কৈলাসহরে কৈলাসহর যুবরাজ স্কুল (৩) আগরতলাতে নতুন হাবেলী বঙ্গ বিদ্যালয় (পরবর্তী কালে উমাকান্ত একাডেমী) (৪) তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, (৫) সোনামুড়ায়- সোনামুড়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় (৬) বিলোনীয়ায় বিলোনীয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়।

ত্রিপুরা বাজ্যের বাজধানীতে স্কুলগুলি মন্ত্রীদের নামে এবং বিভাগীয় স্কুলগুলি মহারাজদেব নামে নামকরণ করা হয়। যেমন সদরে উমাকান্ত একাডেমী, বিজয়কুমার মধ্য ইংরাজী স্কুল, বোধজং উচ্চতব মাধ্যমিক স্কুল এবং বিভাগগুলিতে — ধর্মনগরে বীরবিক্রম

(১৯০২- ১৯০৩ খ্রীঃ এব এডমিনিস্ট্রেশন বিপোর্ট থেকে ত্রিপুরাব অতীত শিক্ষা চিত্র)

ডিভিশনেব নাম	স্কুলেব সংখ্যা			শিক্ষার্থীব সংখ্যা			শিক্ষার্থীব জাতি								দৈনন্দিন হাজিরা	
	ছেলে	মেয়ে	মোট সংখ্যা	ছেলে	মেয়ে	মোট সংখ্যা	ঠাকুব	মণিপুবী	ত্রিপুবী	বিয়ং	কুকি	বাঙালী হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	ছেলে	মেয়ে
১। সদব	২৩	১	২৪	৯৭৮	৫৬	১০৩০	১০৭	১২৮	১২৮	০	০	৪১৪	২৪০	১৪	৩০.৪৭	৪২.৬
২। কৈলাসহব	১৫	৩	১৮	৩৯৬	২৮	৪২৪	০	১৫৮	৪	০	২৪	১১৯	১১৯	০	২০ ৫৮	৮.৫৪
৩। সোনামুড়া	৯	০	—	২৯৮	—	২৮৯	০	০	১৯	০	০	৩৮	১৪০	০	২৫ ৬১	০
৪। বিলোনীয়া	৮	০	৮	২৮৭	০	২৮৭	০	০	৯	০	০	১৩৪	১৩৬	৮	২০ ২৫	০
৫। খোয়াই	২	০	২	৫৪	১	৫৪	০	১৯	২২	০	০	৯	০	৪	২০.৩০	৪ ০০
৬। ধর্মনগব	৭	০		২৪৯	৭	২৪৯	০	৯১	০	০	০	১২০	৩২	৬	২৮ ৭০	৬.৮১
৭। উদয়পুব	৫	০	৫	৭৭	০	৭৭	০	০	৩১	০	৯	৬	২৯	০	১১ ৯০	০
মোট	৬৯	৪	৭৩	২৮১৯	১০৭	২৮১৯	১০৭	৩৯৬	২১২	০	৩৩	৮৪০	৭৯৬	৩৫		

মোট স্কুলেব সংখ্যা ৭৩

ছেলেদেব ৬৯, মেয়েদেব ৪

মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৪১৯ (ছেলে ২৩২৭, মেয়ে ৯২)

ইনস্টিটিউশন, কৈলাশহরে রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশন, উদয়পুরে কিরীট বিক্রম ইনস্টিটিউশন ইত্যাদি।

আগরতলায় পাহাড়ী ত্রিপুরী ছাত্রদের জন্য 'ত্রিপুরা বোর্ডিং' এবং ঠাকুর লোক (সম্ভ্রান্ত ত্রিপুরী) ছাত্রদের জন্য তৈরী হয় 'ঠাকুর বোর্ডিং' শেষোক্তটি বর্তমান জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ দিকে এবং প্রথমোক্তটি উমাকান্ত স্কুল বিল্ডিংয়ের দক্ষিণে ছিল।

এইসব বোর্ডিং এর পরিচালনার জন্য গভর্ণিং বডি ছিল। এরই একটির গভর্ণিং বডির সভাপতি ছিলেন গোপীকৃষ্ণ উজির, রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন বোর্ডিং এর গভর্ণর। মেম্বাররা ছিলেন অমিয় মাধব মল্লিক, মণিময় মজুমদার ইত্যাদি।

এ সব তো গেল শিক্ষা বিস্তারের বাহ্যিক দিকগুলি। চিন্তাধারা এবং তাত্ত্বিক দিক থেকেও তদানীন্তন কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার এবং উন্নত। উমাকান্ত একাডেমীর আগে রাজকীয় বিদ্যালয় সংস্কৃত বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কলেজ ইত্যাদি সবই অবৈতনিক ছিল। রাধাকিশোর সেই সময়ে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার অ্যাফিলিয়েশনের জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেয়ার প্রস্তাব আসায় তিনি তা বাতিল করে দেন এবং পরে সে কলেজ উঠে যেতে বাধ্য হয়। রাধাকিশোর বলতেন 'শিক্ষা বা বিদ্যা বিক্রয় করা আমাদের কাজ নয়। বহুকাল (বলতে গেলে তিন পুরুষ) এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে এসেছিল। সেদিন রাজ্যের সীমিত আয়ে এই পদ্ধতিকে চালু রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন স্বল্পে সন্তুষ্ট শিক্ষাব্রতী শিক্ষকগণ।

সে সময়ে শিক্ষার মান, পঠন-পাঠন পদ্ধতি উৎকৃষ্ট ও শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক এবং পুঁথিগত বিদ্যার গভীরতা ছিল। সাহিত্যচর্চা, পত্রিকা প্রকাশনা, নাটকাদির অভিনয়ে সদরের বা বিভাগীয় শহরের শিক্ষার্থীদের নিপুণতা লক্ষিত হতো। উমাকান্ত একাডেমীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকায় প্রয়াত সত্যরঞ্জন বসুর লেখায় দেখা যায়, তাঁদের সময়ে 'শিক্ষা', 'সাধনা' এবং 'মাথাঠান্ডা' নামে সাহিত্য পত্রিকা ও ব্যঙ্গ লেখার পত্রিকা বের হতো। তাঁর লেখায় রয়েছে — ''তখনকার ঠাকুর বোর্ডিং- এর ছেলেরা শিল্প সৌন্দর্যবোধ ও খেলাধূলায় বেশ আগ্রহী ছিল। তাদের ভেতর আমাদের কাগজে ছবি ও প্রচ্ছদপট আঁকা ছাড়া স্বল্পবয়স্ক স্নেহের রমেন্দ্র পত্রিকাকে আমাদের পত্রিকাকে অলংকৃত করতো।'' এই রমেন্দ্র প্রসিদ্ধ চিত্রকর রমেন্দ্র চক্রবর্তী, যাঁর শিল্পশিক্ষা পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে হয়।

তিনি আরো লিখেছেন, ''কাব্য সাহিত্য ও প্রবন্ধাদি লেখার দিক থেকে প্রিয়নাথ, ভূপেন বাবু, যোগেশ চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। ভারত ঠাকুরকে আমাদের সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক করা হয়েছিল। 'সাধনা' পত্রিকা গোষ্ঠী অনুরূপভাবে পরিচালিত হতো। কিন্তু 'শিক্ষা' ও 'সাধনাকে' ব্যঙ্গ করে ধূমকেতুর মত উদয় হতো 'মাথাঠান্ডা'। পত্রিকার বিষয়বস্তুতে ভরা থাকতো চরিত্র গঠনো পযোগী আলোচনাদি। বিশেষ করে

অনুশীলন সমিতির ভাবধারা সেই সময়ে আমাদের ভেতর অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে প্রবন্ধাদিতে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী, অশ্বিনী কুমার দত্তের ভক্তিযোগ প্রভৃতি, গীতা, ঐতিহাসিক উপাদানে লিখিত গ্রন্থাদির আলোচনাই যথেষ্ট ছিল।"

এই স্মরণিকাতে প্রথম বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (১৯৫৭) সিলেবাসে শিক্ষাপ্রাপ্ত কালিপদ চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণাতে পাই -- বড়দেব প্রতি আদব সমীহভাব খেলাধূলার ব্যাপক চর্চা সে সঙ্গে পড়াশোনা এবং তারই ফাঁকে পঁচিশে বৈশাখ, পুরস্কার বিতরণী উৎসব, অভিভাবক দিবস ইত্যাদি পালন করা, স্কুলের কাজে সাহায্যের জন্য মন্ত্রীসভা গঠন, স্কুলের কাজে ব্যাপক অংশগ্রহণ, ইংরাজীর কোন টেক্স্‌ট বই ছিল না বলে র‍্যাপিড রীডার পড়া এবং গ্রামার, কম্পোজিশান ইত্যাদি অদেখা বিষয়ে চর্চার ইতিহাস। এরই পাশাপাশি আজকের বিরাট পাঠ্যসূচী সম্বলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বাছা বাছা প্রশ্নোত্তরের ধরাবাঁধা মুখস্থ চর্চার পরীক্ষা, অগভীর ভিত্তিহীন শিক্ষাব নিরানন্দ একঘেয়ে পরিবেশ, প্রতিযোগিতা ছাড়া সাংস্কৃতিক উৎসব ইত্যাদিতে যোগদানের অনীহা দেখে মনে জাগে সারা ভাবতের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও ক্রমশ শিক্ষার সংখ্যাগত প্রসাব অনেক হলেও গুণগত প্রসারে কি সত্যি কোন প্রগতি হয়েছে?

অবশ্য চারদিকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসারেব ছড়াছড়িতে এই প্রশ্নও অবান্তরই শোনাবে। তাছাড়া এটা আজ কোন স্থানিক সমস্যা নয়, এটি আজ সর্বভারতীয় সমস্যা। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমপ্রসারের বিষয়েই আলোচনা ফিরে যেতে পারে।

মহারাজ বীরবিক্রমের আমলে (১৯২৩-৪৭) রতনমণি বিদ্রোহ বা তিতুন প্রথার শিকার কুমারী-মধুতি-রূপশ্রী হত্যার কলঙ্ক জাতীয় ঘটনা ঘটে গেলেও অন্যান্য বহু গঠনমূলক কাজ এবং চিন্তাধারার জন্য তাঁর সময়কালকে প্রশংসা কবা যায়। দু-দু'বার ইউরোপ ঘুরে আসার পর তাঁর চিন্তা-চেতনার জগতে যে আধুনিকতা এবং প্রগতির ছোঁয়া লেগেছিল তাতে রাজধানী আগরতলাকে সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক গড়ে তোলা বা ত্রিপুরার উচ্চ শিক্ষার জগতে বিদ্যাপত্তনের' মত একটি সর্বাঙ্গীণ উন্নত ব্যবস্থার নীল নক্সা তৈরী করে দিয়ে গেছেন।

আগেই বলেছি আমরা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন লেখকদের লেখায় দেখতে পাই যে, স্বাধীনতা-পূর্ব ত্রিপুরায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। এই ছকবাঁধা ইতিহাসে একটি অধ্যায়ের সংযোজনে ভুল এবং বিরাট ত্রুটি ঘটে গেছে। সেটি হচ্ছে পাহাড়ী যুবকদের স্বদেশ প্রেম এবং স্বজাতি প্রীতি থেকে উদ্ভুত পাহাড় ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের স্বপ্ন দেখা এবং তা নিয়ে এক অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা ১৯৪৫ সালে "জনশিক্ষা সমিতি"-র গঠন। এই প্রচেষ্টার আদি সংগঠক ছিলেন অঘোর দেববর্মা ও নীলমণি দেববর্মা।

এঁরা সবাই উমাকান্ত একাডেমীর তরুণ ছাত্র ছিলেন এবং ত্রিপুরা বোর্ডিংয়ে থাকতেন। পরে এতে আহ্বান করে নিয়ে আসা হয় আজকের দিনের খ্যাতিমান প্রয়াত নেতা দশরথ

দেব, সুধন্বা দেববর্মা এবং হেমন্ত দেববর্মা মহাশয়দের। জনশিক্ষা সমিতি এক অরাজনৈতিক সামাজিক কল্যাণ সংস্থা ছিল এবং সেভাবেই তাদের বিভিন্ন স্থানে স্কুল খোলার বিনীত আবেদনকে রাজ সকাশে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং এটাই অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যাপার যে বীরবিক্রম মাণিক্য সে আবেদন মঞ্জুর করেন এবং এভাবে ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে ৪৮৮ টি পাঠশালা বা স্কুল খোলা হয়। তখন বীরবিক্রমের মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ডি. এ. ডব্লিউ ব্রাউন। তিনি অত্যন্ত উদারহৃদয় এবং ছাত্রদরদী ছিলেন। এই স্কুলগুলির প্রতিষ্ঠায় তাঁর জোর সমর্থন ছিল।

এতদিন পর্যন্ত রাজকীয় বদান্যে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার চর্চা এবং প্রসার সদরে এবং বিভাগীয় জেলা শহরগুলিতেই আবদ্ধ ছিল। এই স্কুলগুলির প্রতিষ্ঠায় প্রাথমিক শিক্ষার আলো পার্বত্য ত্রিপুরায় নানা দুর্গম পাহাড় ও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু খুব আশ্চর্য এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় যে খুব সাম্প্রতিককালে এই মহৎ প্রচেষ্টার ইতিহাসটি সাধারণ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং এই সাফল্যের ইতিহাস আগে কোনভাবেই কোন শিক্ষা প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়নি।

উচ্চ শিক্ষা পরিকল্পনার ইতিহাসে বীরবিক্রমের মাষ্টার প্ল্যান 'বিদ্যাপত্তনের' ব্যাপারটিও কোনদিন কারো লেখায় সুপ্রচারিত হয়নি। এবছরই বীরবিক্রম কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ যথাযোগ্য শ্রদ্ধা সমাদরে এ বিষয়ে স্মারক পুস্তিকায় আলোচনা করেছেন।

রাধাকিশোরের প্রতিষ্ঠিত কলেজ শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনাধীন কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেল না বলে স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই একজন উদার হৃদয় শিক্ষাব্রতীর মহৎ প্রচেষ্টার অকাল মৃত্যু ঘটে যায়।

এরপর বীরবিক্রম একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপ্ন নিয়ে তৈরী করেন 'বিদ্যাপত্তন' পরিকল্পনা। এতে সাধারণভাবে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ (বর্তমান এম. বি. বি. কলেজ) খোলার পাশাপাশি কৃষি, চারুশিল্প, কারুশিল্প এবং শিক্ষার অন্যান্য শাখাকে কেন্দ্র করে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লিখিত পরিকল্পনা তিনি রচনা করেছিলেন। এটি শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হতে পারলো না, কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিস্তৃতি এবং অশান্ত পরিস্থিতির ঢেউ ত্রিপুরার বুকে এসেও পৌঁছেছিল। ত্রিশের দশকের শেষদিকে আরম্ভ করা অসম্পূর্ণ এম. বি. বি. কলেজের নির্মাণকার্য স্তব্ধ হয়ে গেল। বিদ্যাপত্তনের পত্তন স্বপ্নকে অপূরিত রেখে স্বাধীনতার আগেই ১৯৪৭ সালে বীরবিক্রমের মৃত্যু ঘটলো।

তারপর মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষার বিরাট তাগিদ অনুভব করে কলেজের কাজ আবার শুরু করেন। বীরবিক্রম তাঁর জীবদ্দশাতেই ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

দেশভাগজনিত কারণে ত্রিপুরায় বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু আগমনের ফলে উচ্চশিক্ষার চাহিদা আরো বাড়লো। কিছুকাল উদ্বাস্তুরা এম. বি. বি. কলেজেও ছিলো। এভাবে ১৯৪৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে উমাকান্ত একাডেমীর স্কুলঘরেই প্রাথমিকভাবে কলেজের ক্লাশ শুরু হয়ে যায়। পরে একদিকে নির্মাণকার্য একদিকে ছাত্র ছাত্রীদের পঠন-পাঠন একযোগেই চলেছিল।

৪৬৪ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনসহ এম. বি. বি. কলেজে প্রাক স্নাতক পাঠ্যসূচীতে পড়াশোনা আরম্ভ হয়। ক্রমশ ১৮টি বিষয সহ কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিভাগ এবং ১৭টি বিষয়ে সাম্মানিক পাঠ্যসূচী শুরু হয়।

প্রথম থেকেই ত্রিপুরার শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় অবৈতনিক বললেই চলে। আদিবাসী এবং মেয়েদের জন্য অবৈতনিক হলেও অন্যান্যদের নামমাত্র কিছু ফিস দিতে হতো। এম. বি. বি. কলেজে মেধাবী এবং পরীক্ষায় সফল ছাত্রছাত্রীর জন্য সোনাব মেডেলের ব্যবস্থা ছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ক্রমশ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নানা ধরনের স্টাইপেন্ড চালু হয়। এই আর্থিক সাহায্যেব ব্যবস্থা এতই ব্যাপক যে প্রায় সব ছাত্রছাত্রীই কোন না কোন দলের অন্তর্ভূক্ত হযেই যান। হয় মেধাব বিচারে বা দাবিদ্রের বিচাবে অথবা তপশীলি জাতি বা উপজাতি বিচারে অথবা আরো অন্যান্য কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা স্টাইপেন্ড পাবার অধিকারী হয়ে থাকে ।

এভাবে স্থির এবং দৃঢ় নিশ্চিত পদক্ষেপে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ আনাচেকানাচে প্রত্যন্ত পল্লী বা পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে ।

গত পঞ্চাশ বছরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতির হিসাব করলে আমরা দেখতে পাই যে—

১) ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ — ২টি ডিগ্রী কলেজ হয়েছে।

২) ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ — একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
(ডিপ্লোমা কোর্স) হয়েছে।

১৯৬১ থেকে ১৯৭০ — ক) ৪টি ডিগ্রী কলেজ।
খ) একটি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ।
গ) একটি সরকারী সঙ্গীত।

১৯৭১ থেকে ১৯৮০ এ — ক) ৩ টি ডিগ্রী কলেজ।
খ) একটি চারু ও কারুকলা কলেজ।
গ) একটি শারীর শিক্ষণ কলেজ।

১৯৮১ থেকে ১৯৯০ এ — ক) ৪টি ডিগ্রী কলেজ।

খ) একটি আইন কলেজ।

গ) একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ এ — একটি ডিগ্রী কলেজ।

এভাবে আজ ত্রিপুরায় ১৪টি ডিগ্রী কলেজ হয়েছে। এতে বার হাজারেরও বেশী ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা পাচ্ছে। ২১টি বিষয়ে এরা শিক্ষা নিচ্ছে। এর মধ্যে ১৮টি বিষয়েই সাম্মানিক শিক্ষাসূচী রয়েছে।

আগরতলায় একটি সংস্কৃত কলেজ রয়েছে। পলিটেকনিক ইনস্টিউটে কমপিউটার সায়েন্স ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিকস্ এবং টেলিকম্যুনিকেশনের উপর নূতন ডিপ্লোমা কোর্স চালু হবে। এতে প্রাথমিকভাবে ২০ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হয়। সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলিতে আজ ১২,৮৯৭ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করছে। এর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ৪৮১৭। উপজাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭৮৯। ছেলেদের সংখ্যা ৫৪১ ও মেয়েদের ২৪৮। তপশীলি জাতির ছাত্রছাত্রী রয়েছে ১৬৮৭ জন। এই দলে ছাত্রদের সংখ্যা ১১৪১ এবং ছাত্রীদের সংখ্যা ৫৪৬। ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৪৭৯ জন — ছেলে ৪০৬ এবং মেয়েরা ৭৩ জন। এই কলেজে উপজাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১০০ জন। তপশীলি জাতির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১৪ এর মধ্যে ৯৮ জন ছেলে এবং মেয়েরা ১৬ জন।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে রয়েছে মোট ১৭১ জন ছাত্রছাত্রী ছেলেরা ১৩৮, মেয়েরা ৩৩ জন। উপজাতি ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ৩৮-ছেলে ৩২, মেয়েরা ৬। তপশীলি জাতির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৯-ছাত্র ২৭, ছাত্রীরা ২জন। সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫২-ছাত্র ৯৯, ছাত্রী ১৫৩ জন। উপজাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ২৬-ছাত্র ১৫, ছাত্রী ৭৮। উপজাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৬ জন — ছাত্র ৪০, ছাত্রী ১৬। সরকারী আর্ট এন্ড ক্র্যাফট কলেজে (চারু ও কারুকলা) মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৩০ জন, ছাত্র-৭৭, ছাত্রী-৫৩। উপজাতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫, ছেলে-৪, মেয়ে-১। তপশীলি জাতির ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১১, ছেলে-৭, মেয়ে-৪।

সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের ১৯৯৬-৯৭ বর্ষের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৪৭, পুরুষ-১৮১, মহিলা -৬৬। উপজাতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬, পুরুষ-১৮, মহিলা -৮। তপশীলি জাতির সংখ্যা ৮৫, পুরুষ- ৭১, মহিলা-১৪। শারীর- শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮, পুরুষ-১৯, মহিলা -৯। উপজাতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭, সবাই পুরুষ। তপশীলি

জাতির শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৩, পুরুষ-২, মহিলা-১।

গত দুই দশকে ত্রিপুরায় শিক্ষা

কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সী এবং ম্যানেজমেন্টের উপর নানা কোর্স চালু হয়েছে। মাস কম্যুনিকেশনের উপরেও পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে ২৪০টি আসন প্রতি বছর বহির্ত্রিপুরার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা ও প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় কলেজে ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণ করা হয়।

নরসিংগড়ে ভারতীয় বিদ্যাভবনের একটি শাখা বিদ্যালয় খোলা হয়েছে এবং এদের তত্বাবধানে স্থানীয় উমাকান্ত একাডেমীতে জার্নালিজম এবং কম্প্যুটার শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। অতীত ইতিহাস আলেচানায় দেখা যায় যে স্বাধীন ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর ১৯৫৩ সালে শিক্ষার অধিকার স্থাপিত হয় এবং ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকেই ত্রিপুরায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তৃতি ঘটে। বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিও ক্রমশ সরকারীভাবে অধিকৃত হয়ে এই সংখ্যাভুক্ত হয়। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এরাজ্যে শিক্ষার উৎসাহ উদ্দীপনা এবং তুলনামূলকভাবে সুব্যবস্থা বরাবরই ছিল। W W.Hunter এর Imperial Gazeteer of India Val-XIII তে আমরা দেখি, ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯০১ সালে যেখানে ২.৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী পড়তে লিখতে পারতো সেখানে ১৯০৩ সালে ৩১২৫ জন ছেলে, ৩০০৮ জন মেয়ে ১০৩ টি স্কুলে পড়াশোনা করতো। তখন একটি কলেজ, সেকেন্ডারী স্কুল এবং ৯৯টি প্রাইমারী স্কুল ছিল। সেটাকেও আমরা ১৮৭৬ ৭৭ সালে বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশান রিপোর্টে লিখিত Prospects of Education in Hill Tripperah are not bright উক্তির পটভূমিকায় যথেষ্ট উন্নতি বলে ভাবতে পারি।

১৯৪১সালে সাক্ষরতার হার হয় ৬.১ শতাংশ। এরপরই ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতির স্কুলগুলি হয়। ১৯৪৬ সালে ১২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং এতে পড়ার উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের ৮.০ শতাংশ যোগদান করে। সে সময়ে সেকেন্ডারী স্কুল ছিল ৯টি। এতে ছাত্র ছিল ২৩৯৭, মেয়েদের জন্য তখন কোন হাইস্কুল ছিল না, প্রথম ডিগ্রী কলেজ হয় সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ এ।

এই পটভূমিকায় একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩২-৩৩ সালে বীরবিক্রম মাণিক্য আগরতলায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেন কাগজে কলমে। গেজেট নোটিফিকেশানে এই আবশ্যিক শিক্ষা কার্যকরী করতে কোন বাস্তব এবং কঠোর নিয়ম পালন করা হয়নি, এর রূপায়ণে কোন উপযুক্ত যত্ন বা কার্যকরী প্রয়াস অনুসৃত হয়নি। এর প্রভাবটুকু আগরতলায় মিউনিসিপ্যাল এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবু এই উদ্দেশ্য এবং প্রচারের একটা বিরাট সুফল ছিল। শহর এলাকায় সে সময়ে ৮৬২ জন প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষার্থী ছিল। এজন্যই এই চিন্তাচেতনার পরিসরে পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তন

এবং রাজ্যের পরিবর্তিত অবস্থায়, পরিবর্তিত শিক্ষানীতি — নিয়মকানুন সুপ্রযুক্ত হতে পেরেছে। পার্ট 'সি' স্টেট হিসাবে ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭, টেরিটরিয়েল কাউন্সিল হিসাবে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৩ এবং ইউনিয়ান টেরিটরি হিসাবে ১৯৬৩ থেকে ১৯৭২ এবং ১৯৭২ থেকে পূর্ণরাজ্য হিসেব ত্রিপুরার শিক্ষাব্যবস্থা নানাভাবে অবলম্বিত হয়েছে। যেমন ১৯৫৩ থেকে ৫৭-র মধ্যে অ্যাডভাইজারদের জমানায় প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা শেষ এবং দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা শুরু হয়। এ সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম দফায় ৩০.৫০ লাখ এবং দ্বিতীয় দফায় ১১২.১৬ লাখ টাকা খরচ হয়। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বেসিক ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। টেরিটরিয়াল কাউন্সিল বা টি. টি. সি-র আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বৈত পরিচালনা ব্যবস্থা ছিল। স্কুল শিক্ষা টি. টি. সির হাতে এবং উচ্চশিক্ষা ও অন্যান্য প্রযুক্তি বা শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার পরিচালন ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের হাতে ছিল। এ সময়েই আরো দু'টি বেসিক ট্রেনিং কলেজ হয় (১৯৫৯ এবং ১৯৬১), স্থাপিত হয় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। এ সময়েই স্টেট ব্যুরো অব এডুকেশন্যাল এন্ড ভোকেশনাল গাইডেন্স স্থাপিত হয়। পরিদর্শনের কাজ তখন বিভিন্ন মহকুমা শাসকের অফিস থেকে হতো। এ সময়েই টি টি সির বিভিন্ন নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলির মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়গুলিও অন্তর্ভূক্ত হয়। এটা খুব লক্ষ্যণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে তখনকার ইউনিয়ন টেরিটরিভুক্ত ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে যাবার প্রথম ধাপ সৃষ্টি হয়।

১৯৬৩ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা আরেক পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যায়। এ পর্যায়ে গভর্ণমেন্ট মিউজিক কলেজ, বি. এড কলেজ (বর্তমানের কলেজ অব এডুকেশান) , প্রাইমারী স্কুলের পঠন-পাঠনের জন্য এবং অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কিত বই ছাপার জন্য পাবলিকেশান ইউনিট স্থাপন করা হয়। ১৯৬৫ সালে গভর্ণমেন্ট উইমেন্স কলেজ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ খোলা হয়। এ সময়ে নানাস্থানে আরো স্কুল খোলা হয়। সমাজশিক্ষা বিভাগের এবং বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর প্রয়াসও এই পর্যায়েই হয়েছে।

১৯৭২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়। শিক্ষা বিস্তারের আগের প্রচেষ্টাগুলি এ পর্যায়েও সেরকম গুরুত্ব সহকারেই অনুসৃত হয়। এই পর্যায়ে ত্রিপুরার স্টেট ইনস্টিটিউট অব এডুকেশান স্থাপিত হয়। এটি শিক্ষা অধিকারের প্রফেশনাল উইং হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯৭৪ সালে একেকজন ডেপুটি ডিরেক্টারের অধীনে ৩টি জেলায় জোনাল অফিস খোলা হয়। ১৯৭৫ সালে গভর্ণমেন্ট কলেজ অব আর্ট এন্ড ক্র্যাফট স্থাপিত হয়। ত্রিপুরার সেকেন্ডারী শিক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিমবাংলার সেকেন্ডারী বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে ত্রিপুরার নিজস্ব সেকেন্ডারী বোর্ড স্থাপিত হয় এবং সেবছরই পরীক্ষাও গৃহীত হয়। ১৯৭৮-৭৯ সালে শারীর শিক্ষা কলেজ খোলা হয়। আইন কলেজ খোলা হয় ১৯৮৮ সালে।

এ সময়েই ত্রিপুরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয়। প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কেন্দ্র হিসাবে এটি শুরু হয়, পরে ১৯৮৭ সালে নিজস্ব নিয়মকানুন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা সহ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বেসরকারী ৩টি কলেজ অধিগ্রহণ করা হয় এবং ৮টি নতুন কলেজ শুরু হয়।

এ সময় অন্যান্য বৃত্তিমূলক কলেজেব বাইবেও ত্রিপুরার মোট ১৪ টি কলেজ খোলা হয়। বর্তমানে রাজ্যে ১৫টি মহকুমা রয়েছে। এদের মধ্যে গন্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর এবং লংতরাই ভ্যালী ছাড়া সবখানেই ডিগ্রী কলেজ স্থাপিত হয়েছে, উচ্চতর শিক্ষার জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা বহির্ত্রিপুবায় যেতে পারছে। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ত্রিপুরার স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার যে বিস্তৃতি ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে গৌববজনক। নীচের বিবৃতি থেকে এই চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

	১৯৫৫ ৫৬	১৯৬৫ ৬৬	১৯৭৩-৭৪	১৯৮৯-৯০
প্রাথমিক স্তর				
প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী				
(৬ থেকে ১১ বছব)				
(১) স্কুলের সংখ্যা	৯৯৪	১৩৬৭	১৪৭৮	২০৪৩
(২) শিক্ষার্থী সংখ্যা	৬১,১০০	১,৩৪২০০	২,০৫৭০০	৩,৮৬৪৩১
(৩) ভর্তির হার	৬০.৭	৭৭ ০	৮৩ ০	১৩৪.৬
প্রাথমিক স্তর				
(ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী)				
১১ থেকে ১৪ বছর				
১. স্কুলের সংখ্যা	৮১	১৪৭	২৬৪	৪৩৭
২. শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৯,৫০০	২৮,৭০০	৪৬,৩০০	১,১৬৭৯৫
৩. ভর্তির হার	১৫.৭	৩১.৭	৪২.৮	৭৪.৭
উচ্চ এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তর				
(নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী)				
১৪ থেকে ১৮ বছর				
১. স্কুলের সংখ্যা	২৫	৭২	১০৭	৪২৮
২. শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২,৭০০	১২,৫০০	২৩,১০০	৬৩,২৮৮
৩. ভর্তির হার	৪.৯	১৫.০	২২.৭	২৮.৫

পার্বত্য ত্রিপুরার ১৯টি আদিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশীরভাগের মাতৃভাষা ককবরক। অথচ এ ভাষার কোন সরকারী স্বীকৃতি বা এর মাধ্যমে পঠনপাঠনের সুযোগ রাজগী ত্রিপুরায় ছিল না। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা প্রথম তিনটি ককবরক পুস্তক রচনা করেন। এটির একটি 'ককবরকমা' (ব্যাকরণ) একটি 'ত্রৈপুর কথামালা' (পাঠ্যপুস্তক) এবং একটি ককবরক অভিধান (ইংরাজী/বাংলা/ত্রিপুরী ভাষার) এই বইগুলি কোনদিনই রাজ আনুকূল্যে বা শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহীত হয়ে সম্মান পায় নি।

ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পাবার পর ১৯৭৩ সালে ককবরক শিক্ষাদান নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু সেটা শুধু কথার কথা ছিল, কারণ এ বিষয়ে কোন অর্থ বরাদ্দ বা বইপুস্তক রচনা বা প্রকাশের আন্তরিক প্রয়াস নেয়া হয় নি।

১৯৭৮ সালে ককবরক ভাষাকে সরকার স্বীকৃতি দিলে উপজাতি সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাও বিকাশের এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। এই ভাষায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ককবরক পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্যোগ শুরু হয়ে যায়। ককবরক ভাষার শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ককবরক ভাষাভিজ্ঞ আদিবাসী এবং বাঙালীদের নিযুক্ত করা হয়। অবশ্য রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে এই প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে ঝিমিয়ে গেলে পঞ্চম শ্রেণীর উর্ধ্বে ককবরক পাঠ্যপুস্তক আর বচিত হয় নি। এ ব্যাপারে ককববক শিক্ষার মাধ্যম বাংলা অথবা রোমান লিপি হবে এ প্রশ্নেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত শুরু হলে সমস্ত ককবরক শিক্ষাব্যবস্থাই এক বিরাট ধাক্কা খায়।

বর্তমানে ক্ষমতাসীন সরকার বাংলা লিপির সমর্থক হিসাবে আবার পঞ্চম শ্রেণীর উর্ধ্বে ককবরক ভাষায় সিলেবাস তৈরীর প্রচেষ্টা নিয়েছেন।

সুপরিকল্পিতভাবে কে. বি. টি. (ককবরক টিচার) নিয়োগ সহ এন. সি. ই. আব. টি অনুমোদিত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক অনুবাদের মাধ্যমে ককবরক ভাষায় শিক্ষাদানের প্রকৃত কাজ শুরু হয়। আজ ত্রিপুরায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক। সবগুলিতে ককবরকে শিক্ষাদান সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিছু বাছাই করা স্কুলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে তবে এ. ডি. সি এলাকাতেই সিংহভাগ রয়েছে।

একেবারে সাম্প্রতিককালের তথ্যে দেখা যায় যে শিক্ষার পেছনে উন্নতির প্রচেষ্টা কিছু কম নয়। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭এ ৬৩ টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে, ৪২ টি পুরোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সিনিয়ার বেসিকে এবং ৭১ টি সিনিয়ার বেসিককে হাইস্কুলে এবং ৩৮ টি হাইস্কুলকে হাইয়ার সেকেন্ডারীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। স্কুলগুলিতে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার আসবাব দেয়া হয়েছে। স্কুলঘরের জন্য ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। তপশিলি জাতি এবং উপজাতির জন্য ১৩০টি বোর্ডিং হাউস তৈরি হয়েছে।

বই কেনার জন্য অনুদান এবং স্টাইপেন্ডের হারের বৃদ্ধি ঘটেছে। এ বিষয়ে এ পর্যন্ত এই শিক্ষাপর্বে (১৯৯৩-৯৭) মোট ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা স্টাইপেন্ড এবং বই কেনার জন্য দেয়া হয়েছে। মুসলিম ছাত্রদের জন্য মাদ্রাসা নির্মাণে এবং উন্নতিতেও বরাদ্দ হয়েছে যথেষ্ট। ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীতে ককবরক ভাষা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষার কলেজগুলিতে ৬টি সম্মানিত শাখা খোলা হযেছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একে একে ১২টি বিভাগ খোলা হয়েছে। গভর্ণমেন্ট কলেজ অব এডুকেশানে শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যাপারে ৩২০ টি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন এইসব অর্থ ববাদ্দ এবং শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হলো ছাত্রছাত্রীদেব মাঝপথে স্কুল ছেড়ে দেয়া। এই ড্রপ আউট বা স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীরা এক বিরাট সামাজিক সমস্যা। হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু রাজ্যের মত ত্রিপুরায়ও এই স্কুল ছুট ছাত্রছাত্রীদের হার অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিশেষভাবে উপজাতি ও তপশিলী ছাত্রছাত্রীদেব মধ্যে এর হার (৯০ শতাংশ) খুব বেশী।